ভালোবাসা থেকে যায়

সমরেশ মজুমদার

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

BHALOBASA THEKE JAI
by Samares Majumdar
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR.
C-3. College Street Market.
Calcutta- 700 007. India

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৬০

পরিবেশক ঃ
উজ্জ্বল বুক ষ্টোর্স
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা– ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা- ৭

মুদ্রণে ঃ
জি. পি. ডি. বক্স
৩বি, ছাতুবাবু লেন,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ভালোবাসা থেকে যায়

পাখির ছায়ায়

সকালের কাগজে তড়িঘড়ি চোখ বুলিয়ে লিখতে বসা আমার অনেক দিনের অভ্যাস। কাগজ আসতে দেরি হলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজও সেই রকমের দিন। সাড়ে সাতটা নাগাদ ওটা হাতে পেয়ে হেডলাইনে চোখ বুলিয়ে হঠাৎ মনে হল এই খবরগুলো আগেও পড়েছি। কবে পড়েছি মনে নেই। যদি ধরা যায় দশ বছর বয়স থেকে কাগজ পড়ছি তাহলে গত চল্লিশ বছরের এক অথবা একাধিক দিনে হয় বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন লেগেছে অথবা মালদহ বন্যায় ভেসেছে। যদি সবকটা কাগজ যুক্তি করে দশ বছরের পুরোন খবরের কাগজটা রিপ্রিন্ট করে দেয় তাহলে ক'জন পাঠক ধরতে পারবেন। শুধু খেলার খবরের খেলোয়াড়ের নামগুলো বা সিনেমার সমালোচনাই নতুন হচ্ছে, কিন্তু তাদের বিষয় একই থেকে যাচ্ছে।

কাগজটা সরিয়ে রাখতে গিয়ে পড়ে গেল এবং ভেতরের একটা পাতা বেরিয়ে এল। সেটা তুলতে গিয়ে ছোট্ট একটা খবরে চোখ পড়ল। দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলায় একজন ইঞ্জিনিয়ার পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জিপ চালিয়ে তিনি মৃত্যুকে ডেকে নেন। খবর এইটুকু কিন্তু আমার অস্বস্তি শুরু হল। একজন ইঞ্জিনিয়ার মদ খেতে পারেন এবং তাঁর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু জেলাটা যেহেতু জলপাইগুড়ি তাই কোথাও যেন কি বাজছিল! সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা খুব গোছানো মানুষ হন। জলপাইগুড়ির এক ইঞ্জিনিয়ার কোনও অর্থেই সেরকম ছিলেন না। কেবলই মনে হচ্ছিল, দেবু নয় তো !

পঞ্চাশে পা দিয়েই চারপাশে মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি। আমি সেইসব হতাশাগ্রস্ত মানুষের দলে নই যাঁরা বয়স হলেই বুড়িয়ে যান এবং খেঁকুড়ে হন। বেঁচে থাকা মানেই জীবনে থাকা এবং সেই জীবন উপভোগ করে যেতে চাই চুটিয়ে। এই যে মৃত্যু এসে আশেপাশের মানুষের বুকে ছোবল মারছে, তা দেখছি দর্শকের মত। তবে এইরকম দর্শন কতদিন করতে পারব জানি না। সন্তোষদার

কথা বড্ড মনে পড়ে। তিনি সেই গল্পটা শোনাতেন। কুড়িজন পথ হারানো জাহাজডোবা নাবিক আশ্রয় নিয়েছিল এক নির্জন দ্বীপে। রোজ রাত্রে রাক্ষস এসে একজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে আহার করত। বাকি উনিশজনের একজন ছিল প্রথমে দর্শকের মত। আস্তে আস্তে যখন সংখ্যা দুই-এ পৌঁছালো তখন তার আফশোস হচ্ছিল যে কেন উনিশজন থাকতে সবাইকে নিয়ে রাক্ষসের মোকাবিলা করেননি।

মৃত্যুর মোকাবিলা করা যায় না। আমার বয়স্কদের অনেকেই চলে গিয়েছেন। সমবয়সী বন্ধুদের অন্তত পাঁচজনের কথা বলতে পারি যাঁরা এখন নেই। আমার চেয়ে অনেক কম বয়সের কেউ কেউ তো জীবন নিয়ে জুয়ো খেলে স্মৃতি হয়ে গিয়েছে। অতএব হাতে আর তেমন সময় নেই। আমার বেশ মজা লাগে যখন দেখি ষাট-বাষট্টির বাঙালি ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে নিজেকে গ্রাম্ভারি প্রমাণ করতে অন্যকে গালাগাল দেন, সাধারণ মানুষ যাকে পছন্দ করেন তাদের তা সহ্য হয় না। এইসব মানুষ হয়তো ভাবে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। কুৎসায় যাঁরা সুখী হন তাদের সম্ভবত আয়ু দীর্ঘ হয়।

খবরটা এমনভাবে মনে গেঁথে গেল যে লিখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। লোকটার নাম জানা দরকার। যদি দেবু হয়, দেবু যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তো সব ল্যাঠা চুকে গেল। কারও কাছে আমার কোনও জবাবদিহি করার থাকবে না। শেষ পর্যন্ত সুখময়বাবুকে ফোন করলাম। উনি প্রবীণ সাংবাদিক। আমার সঙ্গে সম্পর্কও ভাল।

'আরে কি খবর! লেখার চাপ কম নাকি?'

'না। ভাল আছো?'

'এই আর কি। প্রেসার খুব গোলমাল করছে। কোনও দরকার?'

'হ্যাঁ। আজকের কাগজে বেরিয়েছে জলপাইগুড়ির এক ইঞ্জিনিয়ার—'

'ওহো, সেই মাল খেয়ে অ্যাকসিডেন্টের কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তো পুরোন খবর। জলপাইগুড়ির করেসপন্ডেন্ট পাঠিয়েছিল কদিন আগে, আজ ছাপা হয়েছে। আপনি তো আবার ওখানকার লোক, প্রব্লেমটা কি?'

'লোকটার নাম জানতে চাই।'

'সেটা তো আমি জানি না। দাঁড়ান, এই নম্বরে এস টি ডি করুন, পেয়ে যাবেন।'

নম্বরটা নিলাম। এই কদিন আগেও জলপাইগুড়ির লাইন ট্রাঙ্ককলের মাধ্যমে পেতে খুব ঝামেলা হত। এখন দশ সেকেণ্ডও লাগে না। নম্বর ঘোরালাম। ওপাশে রিং হচ্ছে।

'হ্যালো, কাকে চান?'

'আমি কলকাতা থেকে বলছি, সুখময়বাবু ফোন করতে বললেন।'

'ওহো, বলুন।'

'আজকের কাগজে জলপাইগুড়ির একজন ইঞ্জিনিয়ারের অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর খবর বেরিয়েছে। ভদ্রলোকের নামটা জানতে পারি?'

'আজ্ঞে আপনি কে বলছেন?'

নিজের নাম বললাম।

'ওহো ! আপনি! ওঁর নাম দেবু মিত্র। বানারহাটে বাড়ি।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

টেলিফোন রেখে দিলাম। তাহলে দেবু মারা গেল। যতদূর মনে পড়ছে মাসিমা, মাকে দেবুর মা বলতেন, ও আমার চেয়ে এক দিনের বড় ছিল। আমাদের মুখে ভাতও হয়েছিল একদিনে। ব্যাপারটা কল্পনা করতে মজা লাগছে। এই খবর শোনার পরও মজা আসে। পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া শরীরটাকে একসময় অন্নের নেশায় ধরানো হয়েছিল। সারা জীবন ধরে কত অন্ন ভোগ করে গেলাম।

লেখা হল না। আজকাল মৃত্যু সংবাদ শুনলে অস্বস্তি হয়, মন খারাপ হয় না। এই সেদিন আমার এক বয়স্কা আত্মীয়া মারা গেলেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে আমার কলেজে পড়া মেয়ে তার স্কুলে পড়া বোনকে ডেকে নিয়ে গেল এই বলে, 'তাড়াতাড়ি আয়, জীবনে এই প্রথম একটা দারুণ অভিজ্ঞতা পাবি।' ভদ্রমহিলার প্রাণ যখন চলে গেল তখন ওদের চোখে দেখেছিলাম শুধু বিস্ময়। ওদের বয়সে আমি ওই অবস্থায় স্থির থাকতে পারতাম না। ওই নিরাসক্ত হয়ে থাকার ধরন এদের মধ্যে এসে গেছে এই বয়সে যা আমার মধ্যে এল কত টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে সময়ের পর সময় পার করে।

অথচ অন্যান্য মৃত্যু সংবাদ যেভাবে আসে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবার তেমন হল না। দেবুর মুখ, নানান ঘটনা ছায়ার মত দুলতে থাকল গোটা দিন। অথচ টেলিফোন না করা পর্যন্ত ও বেঁচেছিল আমার কাছে। এক জীবনে দেখা কয়েকশ বা হাজার পরিচিত মুখের সঙ্গে মিলেমিশে মনের কোনও কোণে

ধুলোচাপা হয়ে পড়েছিল। ও বেঁচে থাকতে এখন আর আমার কাছে মূল্যবান ছিল না। কোনও টান ওর সম্পর্কে অনুভব করতাম না বলেই যোগাযোগ ছিল না। যেহেতু দেবুও আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি তাই ধরে নিচ্ছি ওরও আমার সম্পর্কে কোনও টান থাকার কথা নয়।

কিন্তু এখন আমার শিউলির কথা মনে পড়ছে। শিউলির সঙ্গে দেবুর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল পঁচাত্তর সালে। তাও তো প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল। যাদবপুর সেন্ট্রাল রোডে শিউলির বাপের বাড়ি, সেখানেই ফিরে গিয়েছিল সে। মাঝে মাঝে মনে হত যোগাযোগ করি কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে ভেবে করিনি। আমার ঠিকানা পাওয়া কারও পক্ষে অসম্ভব নয় তবু শিউলি চুপচাপ থেকেছে। দেবুর মত ওর কথাও মনে পড়ত না ইদানীং।

দেবু এবং শিউলির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু ডিভোর্স হয়েছে কিনা আমি জানি না। শিউলি এখন কি করছে, আবার দেবুর সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে কিনা তাও অজানা। সেটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে দেবুর মৃত্যুর খবর শিউলি কি পেয়েছে? মাঝে মাঝে মানুষের মাথায় ভূত চাপে, আমারও চাপল। পুরোন ডায়েরি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু শিউলির ঠিকানাটা পেলাম না। সেন্ট্রাল রোডের কথা মনে আছে। বাইশ বছর আগে দেবু আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে।

দুপুরের পর মনে হল শিউলির সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত। বাইশ বছরে ওই বাড়ির কি পরিবর্তন হয়েছে জানা নেই তবু গেলে কি এমন অসুবিধে হবে। যাদবপুরের রাস্তাঘাট এখন বেশ চওড়া হয়েছে, দোকানপত্তরে সঙ্গতির ছাপ। সেন্ট্রাল রোডে ঘুরে প্রথমবার বাড়িটা চিনতে অসুবিধে হল। নাম্বার জানা নেই, শিউলির বাবা বা তেমন কারও নাম জানি না। এইসময় মিষ্টির দোকানটা দেখলাম। এইরকম একটা দোকান থেকে দেবু মিষ্টি কিনেছিল শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার সময়। মিষ্টিটার নাম গোলাপসন্দেশ। গোলাপফুলের গড়নে তৈরি। কেনার সময় আমরা হাসাহাসি করেছিলাম। দোকানটিতে গিয়ে শোকেসে ওইরকম কোনও সন্দেশ দেখতে না পেয়ে ভাবলাম ভুল করেছি। একজন সেলসম্যান প্রশ্ন করতে বললাম সন্দেশটার কথা। সে মাথা নাড়ল, 'না দাদা, এ দোকানে ওইরকম সন্দেশ বিক্রি হয় না।'

একজন প্রবীণ মানুষ পাশে দাঁড়িয়ে মিষ্টি কিনছিলেন। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'হত। অনেক আগে। তখন মালিক ছিল মধুসূদন ঘোষ। তোমরা তখন কোথায়?'

আমি প্রবীণকে বললাম, 'আপনি তাহলে এপাড়ায় দীর্ঘকাল আছেন?'

'হ্যাঁ। জন্মইস্তক। তা হঠাৎ গোলাপসন্দেশের সন্ধানে এখানে?'

তাঁকে আমার সমস্যার কথা বললাম। তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন, 'এভাবে বাড়ি বের করা খুব মুশকিল। এই মিষ্টির দোকানের আশেপাশে বললেন, না? এত সব নতুন বাড়িঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে যে চেনা মুশকিল। ও হ্যাঁ, ওই গলির মধ্যে সত্যসাধনবাবু থাকতেন। ওঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ডুয়ার্সে। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মেয়েটি বিধবা হয়ে ফিরে আসে। ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

ভদ্রলোক যে বাড়িটার কথা বললেন তার দরজা বন্ধ। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। শিউলি তো বিধবা হয়ে ফিরে আসেনি, বেল টেপা অর্থহীন, তবু এখান থেকে যদি কোনও খোঁজ বের হয়। দরজা খুলল এক যুবক, 'কাকে চাই?'

'শিউলি আছেন?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম।

'পিসি তো এখানে থাকেন না। আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'আমি কলকাতায় থাকি।'

'পিসির সঙ্গে কি দরকার?'

'দরকার ছিল ভাই।'

'পিসি এখন মালদায়। ওখানকার গার্লস স্কুলে পড়ান। কলকাতায় আসেন খুব কম। যদি তেমন দরকার থাকে তাহলে ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন।'

এরপর আর দাঁড়ানোর কোনও মানে হয় না। ফিরে আসার সময় আফশোস হল। শিউলির সঠিক ঠিকানা জেনে আসা হল না। মালদহে নিশ্চয়ই একাধিক গার্লস স্কুল রয়েছে।

রাত্রে ঘুম এল না। ইদানীং আমি খুব শুদ্ধ জীবন যাপন করি। সিগারেট খাই না, মদ স্পর্শ করি না, কারও সঙ্গে কোনও ঝুটঝামেলায় থাকি না। এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে জীবন ঠিকঠাক বয়ে যায়। রাত্রে ঘুমের অসুবিধে হয় না। আমারও হত না। কিন্তু আজ ঘুম এল না। বারংবার দেবু সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। একটা সময় মনে হচ্ছিল আমি কড়া হুইস্কির তীব্র গন্ধ পাচ্ছি। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম।

আমি থাকতাম চাবাগানে। বাবা সেখানে কাজ করতেন। দেবু থাকত চা বাগানের বাইরে গঞ্জে। সেখানেই আমাদের পাঠশালা। দূরত্বটা আধ কিলোমিটারের বেশি নয়। আমরা চারজন খুব বন্ধু ছিলাম। দেবু ছিল খুব ফর্সা

লাজুক, একটু দুলে দুলে হাঁটত। আমাদের দুটো পরিবার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। দেবুর দিদিরা সব ডানাকাটা সুন্দরী ছিলেন। আমরা ওদের দুচোখ ভরে গিলতাম। কিন্তু যেহেতু আমাদের দৃষ্টিতে তখনও সারল্য ছিল তাই আমরা ওদের লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গার সঙ্গে তুলনা করতাম।

আমি আর দেবু পড়াশুনা করতে চলে এলাম শহরে। গরম বা শীতের ছুটিতে যেতাম চায়ের বাগানে। অন্য দুইজন কাছাকাছি স্কুল থেকে কোনওমতে পাশ করে ব্যবসায় নেমে পড়েছিল। দেবু গেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। পড়াশুনায় যথেষ্ট ভাল ছিল সে। ততদিনে দেবুর দিদিদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিয়ের পর কেন জানি না ওদের আর তেমন সুন্দরী বলে মনে হত না। হয়তো আমাদের দেখার চোখও বদলে গিয়েছিল। বয়স্কা মেয়েদের দিকে মন না দিয়ে সমবয়সীদের সান্নিধ্য পাবার ঝোঁক এসে গিয়েছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার কারণে। তখনও আমাদের বাড়িতে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা চালু। পান থেকে চুন খসার জো নেই। মনে পড়ছে সেই পুজোটার কথা। আমি আর দেবু কলেজের ছুটিতে বাগানে যাওয়ায় বন্ধুরা খুব খুশি। অতবড় চা বাগানে একটাই পুজো হয়। দশমাইল বাদে জঙ্গল পেরিয়ে আর একটা পুজো। বিকেলবেলায় আমরা সেজেগুজে মণ্ডপের সামনে থাকতাম। তখন আশপাশের চা বাগানগুলো থেকে লরি অথবা জিপে বোঝাই হয়ে মানুষ আমাদের ঠাকুর দেখতে আসত। নাংডালা, চিনগুড়ি, সরুগাঁ, বান্ধাপানি এমন কত চা বাগানের গাড়ির জন্যে আমরা হাপিত্যেশ করে বসে থাকতাম। গতবার যে বাগানের গাড়িতে কোনও সুন্দরীকে দেখেছিলাম সেই গাড়ি কখন আসবে এই জল্পনা করতাম। গাড়িটি এলে টুলে পা দিয়ে মেয়েটি তার আত্মীয়দের সঙ্গে নিচে নামবে, দল বেঁধে ঠাকুরের সামনে গিয়ে নমস্কার করবে, এপাশ ওপাশ তাকাবে এবং আবার গাড়িতে ফিরে যাবে। ওই আসা যাওয়া দেখতে দেখতে আমরা শুধু তর্ক করব মেয়েটির নাকের ডগায় মুক্তোর মত ঘাম ছিল কিনা! ওইটুকুই আমাদের আনন্দ।

আমরা চারজন বসেছিলাম। কি মনে হতে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রসাদ দেবার দায়িত্ব নিলাম। নানান রকমের প্রসাদ, লোক বুঝে দিতে হয়। এইসময় কারবালা চা বাগানের লরি এসে দাঁড়াল। মহিলা এবং পুরুষরা যখন নামছিলেন তখনই আমার নজর একজনের ওপর স্থির হল। খুব ফর্সা নয় সে, কিন্তু বেতের মত শরীর, টানা টানা চোখ আর উদাস করা চুল নিয়ে সে যখন সঙ্গিনীদের সঙ্গে এগিয়ে এল ঠাকুরের কাছে তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। তারপরই

খেয়াল হতে প্রসাদ দিতে আরম্ভ করলাম। সেই মেয়ে যখন সামনে এল তখন তার হাতে দুটো বড় সন্দেশ দিতে দ্বিধা করলাম না। সে হাত না সরিয়ে বলল, আমাকে বরং একটুকরো ফল দিন।'

ফল তো সবাইকেই দেওয়া হচ্ছে, সন্দেশ বিশিষ্টদের।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? সন্দেশ খাওয়া হয় না?'

হাসল সে। তখনই তার গজদাঁত দেখতে পেলাম, 'না, মোটা হয়ে যাব।'

পাশের মোটা মহিলাকে আমি ফল দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'ঢঙ করিস না তো। প্রসাদ খেলে কেউ মোটা হয় না। না খাবি তো আমাকে দিয়ে দে।' বলতে বলতে তিনি নিজেই নিয়ে নিলেন। যেন রক্ষে পেল এমন ভঙ্গিতে মেয়েটি সরে গেল সামনে থেকে। আমার খুব ইচ্ছে করছিল তাকে ডেকে কয়েকটা ফল দিই। কিন্তু তার আগেই ওরা লরির দিকে ফিরে গেল। এ বাগান থেকে অন্য বাগানে যাবে ঠাকুর দেখতে।

লরিটা বেরিয়ে গেলে মনে হল পুজোমণ্ডপ শূন্য হয়ে গেল। আর একজনকে প্রসাদ দেবার দায়িত্ব দিয়ে বন্ধুদের কাছে এসে দাঁড়াতেই দেবু জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা বললি রে এতক্ষণ?'

বুঝতে পারিনি এমন ভান করেছিলাম, 'কোন কথা? কার সঙ্গে?'

'ন্যাকামি করিস না। মিস কারবালা তোকে কি বলল?'

'বলল সন্দেশ খায় না। কেন?'

'কেন আবার! হাঁটা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে। নার্গিসের চেয়েও ভাল।' দেবু শ্রীচারশো বিশের গান গুনগুন করতে লাগল।

বিশু বলল, 'গায়ের রঙ একটু মাজা।'

সঙ্গে সঙ্গে দেবু খেঁকিয়ে উঠল, 'রঙ দিয়ে কি হবে? আমাকে তো সবাই ফর্সা বলে তাতে কি হল? মিস কারবালা আমার দিকে তাকাল?'

তপন বলল, 'তুমি উদ্যম না নিলে কি করে হবে?'

দেবু কথাটার জবাব দিল না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ওর খুব মন খারাপ হয়েছে। সেই সন্ধেবেলায় আমাকে এড়িয়ে গেল সে। তখন মনে হচ্ছিল আমার বদলে দেবু যদি প্রসাদ দিত তাহলে ভাল হত। সামনের বছর কারবালার লরি এলে ওকেই সুযোগটা দিতে হবে।

পরের দিন ছিল অষ্টমী। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর গল্পের বই পড়ছি, বিশু এসে ডাকল। পুজো হলেও ভরদুপুরে বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। কিন্তু

বিশু বলল, 'তোকে দেবু ডাকছে। এখনই যেতে বলল।'

গতকালের ঘটনার জন্যেই বাড়িতে না বলে বেরিয়ে এলাম। দেবু আর তপন ওদের বাড়ির সামনে কালভার্টের ওপর বসেছিল। যাওয়ামাত্র বলল. 'আমরা কারবালায় যাচ্ছি, তুই যাবি?'

'হঠাৎ'?

'তোর জন্যে। আমি ভেবে দেখলাম কাল তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। মেয়েটির যদি তোকে ভাল লেগে থাকে আর তোর যদি মেয়েটাকে ভাল লাগে তাতে আমার কি? ওদের বাগানেও তো পুজো হয়, চল দেখে আসি।' দেবু বলল।

আমার খুব ভাল লাগল। দেবু কাল ওরকম করার পর আর আমি মেয়েটাকে নিয়ে কিছু ভাবিনি কিন্তু এখন মনে হল গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু যাব কি করে? কারবালা বাগান হাইওয়ে থেকে অনেকটা ভেতরে। বাস থেকে নেমে এতটা হাঁটতে হবে। অবশ্য সাইকেলে যাওয়া যায়। দেবু নস্যাৎ করে দিল প্রস্তাবটা. 'সাইকেলে তো ফেকলুরা যায়। আমরা গাড়ি নিয়ে যাব। বাবার পুরোন গাড়িটা তেল ভরা আছে। গ্যারেজে স্টার্ট করলে বাবা টের পেয়ে যাবে। তোরা ঠেললে আমি বের করে নিয়ে আসব।'

আমরা এর আগে ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে দেবুকে ওই গাড়িটা চালাতে দেখেছি। একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে এই ভেবে আমরা কেউ তার লাইসেন্সের খোঁজখবর নিলাম না। ভরদুপুরে দেবুদের বাড়িটা শব্দহীন। সম্ভবত সবাই যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। দেবু স্টিয়ারিং-এ বসল আর আমরা তিনজন ঠেলতে লাগলাম। গড়াতে গড়াতে গাড়ি অনেকটা দূর চলে আসার পর দেবু ইঞ্জিন চালু করল। ভিতরে ঢুকে বুঝলাম গাড়িটার অবস্থা জরাজীর্ণ। সিট বলে কিছু নেই। স্প্রিং উঠে এসেছে। সেগুলো কোনমতে বস্তাচাপা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের আজ মহাপুলক। পক্ষিরাজের গতিতে দেবুর বাবার অস্টিন গাড়িটা উড়ে যাচ্ছিল চা বাগান ছাড়িয়ে পিচের রাস্তা ধরে। দেবু ঝুঁকে পড়ে গাড়ি চালাচ্ছে আর আমি কেবলই বলে চলেছি, আস্তে আস্তে।

'এত নার্ভাস হলে কোনও মেয়ে তোকে পছন্দ করবে না।' দেবু বলল

'মেয়েদের ব্যাপার তুই জানলি কি করে?'

'হিন্দি সিনেমা দেখে। তাছাড়া আমাদের হোস্টেলের একটা ছেলের বউ আছে। তার কাছ থেকে সব খবর পাই।'

আমার মনে হল, হয়তো তাই। আমি নার্ভাস হবো না। পিচের রাস্তা থেকে গাড়ি ঢুকল নুড়ি বিছানো কারবালা বাগানের রাস্তায়। দেবু বেশ ভাল চালাচ্ছে। দূর থেকেই ঢাকের আওয়াজ কানে এল। ডানদিকে ফ্যাক্টরি রেখে আমরা এগিয়ে যেতেই একটা মাঠ দেখতে পেলাম। মাঠের মাঝখানে মণ্ডপ, ওপাশে অনেকগুলো কোয়ার্টার্স। তখন অসময় বলেই মণ্ডপে কয়েকটা কুচো ছাড়া কেউ নেই। গাড়ি থামল। আমরা ঠাকুরের সামনে পৌঁছে নমস্কার করলাম।

বিশু বলল, 'দূর। এটা একটা পুজো নাকি? আমাদের ধারে কাছে আসে না।'

দেবু তখন ঠাকুর ছেড়ে কোয়ার্টার্সের দিকে তাকাচ্ছিল। গাড়ির শব্দ শুনে প্রায় সব ক'টা বারান্দায় মানুষজন বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে তাকে দেখতে পেলাম না। তখন বলল, 'কয়েকবার হর্ন বাজালে কেমন হয়?'

দেবু মাথা নাড়ল, 'বোকা বোকা ব্যাপার। সবাই ভাববে আমাদের কোনও মতলব আছে।'

এইসময় একটা ছেলেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। বোঝা গেল সে দেবুর বেশ পরিচিত। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর?'

দেবু বলল, 'তোমাদের ঠাকুর দেখতে এলাম।'

ছেলেটা বলল, 'এবছর ভাল করে সাজাতে পারিনি, সামনের বার সাজাবো। কাল তোমাদের ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল হয়েছে।'

দেবু আফশোস করল, 'তাই নাকি! ইস্ দেখা হল না।'

'আমরা সন্ধের সময় গিয়েছিলাম।'

'জানি। তোমাদের বাগানের একটা মেয়ে সন্দেশ প্রসাদ নেয়নি। খুব অন্যায় করেছে।' দেবু বলল।

'তাই নাকি? কে বলতো?'

'আমি কি করে জানব।' দেবু কাঁধ নাচালো।

আমি বললাম, 'মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্দেশ খায় না।'

এবার ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পেরেছি। ও কলকাতায় থাকে। মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। কলকাতার মেয়ে তো, একটু ডাঁট বেশি।'

দেবু একটু থিতিয়ে গেল, 'কলকাতার মেয়ে?'

'হ্যাঁ। তবে আমাদের সঙ্গে ডাঁট দেখায় না। ওই তো, ওই কোয়ার্টার্সে থাকে।' আঙ্গুল না তুলে ছেলেটি যে বাড়িটি দেখাল তার বারান্দায় তখনই এসে

দাঁড়িয়েছিল সে। খোলা চুল, পরনে স্কার্ট, ভঙ্গি অলস। মণ্ডপ থেকে অন্তত
পঞ্চাশগজ দূরত্ব হলেও আমার মনে হচ্ছিল ও আমাকে চিনতে পারছে।

দেবু বলল, 'কলকাতায় শুনেছি ধুমধাম করে পুজো হয়, সেইসব ছেড়ে
এখানে এল। এই গ্রামে?'

'না। চারপাঁচ বছর আগেও এসেছিল।'

হঠাৎ দেবু বলল, 'চল, এবার ফিরতে হবে।'

আমরা হুডখোলা গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার নজর সেই বারান্দায়
ইঞ্জিন স্টার্ট করতে করতে চাপা গলায় দেবু বলল, 'ওইভাবে গিলিস না, লোকে
বুঝতে পারবে।'

চটপট নজর সরিয়ে নিলাম কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছিল না। অনেকবারের
চেষ্টার ফল হল গোঁ গোঁ আওয়াজ। গাড়ি আওয়াজ করছে অথচ নড়ছে না
দেখে কুচোগুলো হাততালি দিতে লাগল। যেভাবে আমরা গাড়ি থামিয়ে নেমেছি
তাতে যতটুকু সম্ভ্রম আদায় করা গিয়েছিল তার সবই জলাঞ্জলি যেতে বসেছে
এখন। দেবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমি আড়চোখে দেখতে পেলাম মেয়েটি
বারান্দা থেকে নেমে মাঠের গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলে। এইসময় দেবু
চাপা গলায় বলল, 'গাড়ি ঠেলতে হবে। কোনও উপায় নেই।'

বিশু কাতর গলায় বলল, 'প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে গুরু, আর একবার
চেষ্টা কর।'

'কিসের প্রেস্টিজ? এখানে আর কখনও আসবি নাকি। গাড়ি ঠেল।'

অতএব আমরা নামতে বাধ্য হলাম। তিনজন গাড়ি ঠেলছি দেখে ছেলেটোও
হাত লাগাল। পেছন পেছন হাততালি আর চিৎকার নিয়ে ছুটছে কুচোর দল।
লজ্জায় কোনও দিকে তাকাচ্ছিলাম না। হঠাৎ ইঞ্জিন প্রাণ পেল। সঙ্গে সঙ্গে
আমরা লাফিয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে।

এত জোরে অ্যাকসিলেটারে চাপ দিল গাড়ি তীরের মত ছিটকে চলল।
স্টিয়ারিং ধরে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে দেবু। এতদিন ওকে লাজুক বলে জানতাম
এই মুহূর্তে একদম উল্টো বলে মনে হচ্ছে। গতি বেড়ে যাওয়ায় স্টিয়ারিং
নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিল না সে। ফ্যাক্টরিটা একবার এগিয়ে আসছিল আবার
সরে যাচ্ছিল। এইবার বাঁক নিয়ে বাঁ দিকে যেতে হবে। আমরা চিৎকার করে
ওকে বললাম, 'ব্রেক কর, স্পিড কমা।' দেবু চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্রেক খুঁজে পাচ্ছি
না।' এবং তারপরেই রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ঝাঁপাল চাবাগানের লাগোয়া নর্দমায়

।
ওপর। গাড়ি কাত হয়ে যেতে আমি ছিটকে বেরিয়ে গেলাম। নর্দমার কাদার মধ্যে শরীরটা ঢুকে গেল। প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়ি থেমে গেল অর্ধেক নর্দমা অর্ধেক চায়ের গাছে আটকে। পেছনে হৈ হৈ আওয়াজ উঠল।

কিছুক্ষণ খেয়াল নেই। আমাকে নর্দমা থেকে টেনে তোলা হয়েছে। সমস্ত শরীর কাদায় মাখামাখি। বিশু বা তপনের তেমন কিছু হয়নি। শুধু সামনের কাঁচ ভেঙে দেবুর শরীর নর্দমায় ঢুকে যাওয়ায় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাগানের ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। আমাদের শুশ্রূষা চলছিল। বয়স্করা খুব ধমকাচ্ছিলেন ওইভাবে গাড়ি চালানোর জন্যে। এক পলকে দেখলাম দেবুর পাশে সেই মেয়ে ঝুঁকে রয়েছে, ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করছে। কাদা মুছে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে সে। চেতনা ফিরতেই দেবু উঠে পড়ল, 'বাড়ি যাব।'

মেয়েটিকে বলতে শুনলাম, 'সেকি! এই অবস্থায় কি করে যাবেন?'

'আমি এর চেয়ে খারাপ অবস্থা সহ্য করতে পারি। আমার কিছুই হয়নি।'

একজন বয়স্ক বললেন, 'আমি তোমার বাবাকে চিনি। তাঁকে খবর পাঠাচ্ছি, তোমরা এখানে বিশ্রাম নাও। শরীরের ভেতরেও কিছু হতে পারে!'

'আমার কিছু হয়নি।' দেবু চিৎকার করতে লাগল, 'গাড়িটা, গাড়িটাকে তুলে দিন, প্লিজ।' তার তাগাদায় সবাই হাত লাগাল। সামনের কাঁচ ভাঙ্গা, সমস্ত গাড়িময় কাদা আর গাছের পাতা। অনেক কষ্টে ওটাকে টেনে তুলতে দেবু জোর করে উঠে বসল। আর কি আশ্চর্য, একবারেই ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। দেবু হাঁকল, 'যে যাবি উঠে বস গাড়ীতে।'

বসার জায়গা ছিল না। বস্তা উধাও। কাদাভর্তি স্প্রিং-এর ওপর কোনওমতে শরীরটাকে রাখলাম। বেরিয়ে যাওয়ার আগে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেবু বলল, 'ধন্যবাদ।'

গাড়ি নুড়িপথ ধরে ছুটছে। চারজনের চেহারা এই গাড়ির মতনই বীভৎস। তপন চিৎকার করল, 'পেট্রোলের গন্ধ আসছে। খুব।'

দেবু গাড়ি থামাল। দুপাশে চাবাগানের নির্জনতায় আমরা চারজন। কোথাও জনমানব নেই। দেখা গেল পেট্রোল পড়তে পড়তে আসছে। দেবু চটপট গাড়ির তলায় ঢুকে পড়ে চিৎকার করল, 'কাপড় দে, একটা কাপড় দে। ফুটো আটকাতে হবে।'

বিশু ধমকালো, 'ধ্যুৎ! কাপড় দিয়ে পেট্রোল আটকানো যায় নাকি? তোর

গাড়িতে সাবান নেই?' সে খুঁজতে লাগল এবং গাড়িতেই এক টুকরো সাবান পাওয়া গেল। সেটাকে ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে দেখা গেল তেল পড়া বন্ধ হয়েছে।

গাড়ি হাইওয়েতে উঠে এল বেশ। কিন্তু আমাদের বাগানের কাছাকাছি হতেই আবার তেল পড়তে লাগল। দেবু তখন মরিয়া। তেল শেষ হবার আগেই গাড়ি গ্যারেজে ঢোকাবে সে। কিন্তু গঞ্জের চৌমাথায় পৌঁছে গাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাদামাখা চারটে ভৌতিক চেহারা এবং তার সঙ্গে মানানসই গাড়ি দেখে বিকেলের গঞ্জের লোকজন ছুটে এল হৈ হৈ করে। আমরা তখন সারা শরীরে যন্ত্রণা আবিষ্কার করলাম। মুখে মুখে রটে গেল আমরা অ্যাকসিডেন্ট করেছি। মনে আছে সেই পুজোয় আমরা কেউ বাড়ি থেকে বেরুতে পারিনি দেবু বিছানায় ছিল দিন সাতেক। তার হাত ভেঙেছিল এবং সেই ভাঙা হাত নিয়ে সে কি করে গাড়ি চালিয়েছিল, তা ভেবে পাইনি। ওর বাবা ওকে কি শাস্তি দিয়েছিলেন তাও জানা নেই। কিন্তু যখন শুনলাম কারবালা বাগানের ডাক্তারবাবু তাঁর শালীর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেবুকে দেখে গিয়েছেন তখন বুক টাটিয়ে গিয়েছিল। অ্যাকসিডেন্টের আঘাতও তেমন তীব্র বলে মনে হয়নি

আজ রাত্রে এই ঘটনাটা মনে এল। খুবই সামান্য ঘটনা। গতকাল চেষ্টা করলেও হয়তো সবটা মনে করতে পারতাম না। আজ পারলাম। এবং তখনই স্থির করলাম আগামী কাল জালপাইগুড়িতে যাব। সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।

ভোরবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরলাম। গোটা দিন নষ্ট হয় বলে সাধারণত এই ট্রেনটাকে এড়িয়ে চলি আমি। কিন্তু আজ মনে হল দেরি করতে ভাল লাগছে না। চাইলেই উত্তরবাংলায় যাওয়ার টিকিট পাওয়া যায় না। আমার মুখ দেখে কেউ পরিচয় টের পান না, নাম দেখে দু-একজন অবাক হয়ে তাকান আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে সেইরকম একজন চেকারের দর্শন পেয়ে গিয়েছিলাম।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে মনে হল আমি একটু বাড়াবাড়ি করছি। দেবু মারা গিয়েছে কয়েকদিন আগে কিন্তু কার্যত আমার কাছে ও মৃত অনেক অনেক দিন আগেই। আমাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। তাই হঠাৎ আমার মধ্যে এত আবেগ কেন উথলে উঠল, বুঝতে পারছি না। তাছাড়া জলপাইগুড়িতে গিয়ে আমি কি করব? দেবুকে তো দেখতে পাব না। অবশ্য দেবু ছাড়াও তে

ওই শহরে আমার অনেক প্রিয়জন আছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করে আসা যাবে।

দেবু পাশ করেছিল জলপাইগুড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে। আমি তখন কলকাতায় পড়ি। ছুটিছাটায় দেখা হয। গল্প করি। ও তখন বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। মাঝে মাঝে বলে, কলকাতায় গিয়েছিলাম। সময় ছিল না বলে তোর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। অভিমান করি কিন্তু ওই পর্যন্তই। তখনও জানি না ও কলকাতায় কেন আসতো?

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মালদায় পৌঁছালো দু'ঘণ্টা দেরিতে। দুপুর শেষ হতে চলেছে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল এখানেই শিউলি থাকে। আর মনে পড়ামাত্র আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। স্টেশনের বাইরে এসে রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম গার্লস হাইস্কুল কতদূরে?

প্রশ্নের উত্তর পেলাম পরের দিন দুপুরে। মালদহের সব গার্লস স্কুলগুলোতে গতকাল খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়নি। হোটেলে উঠেছিলাম। কেউই বলতে পারছেন না শিউলি কোন স্কুলে আছে। একজন উপদেশ দিলেন, 'স্কুলবোর্ডের অফিসে চলে যান, ওখানে টিচারদের লিস্ট আছে।'

শেষপর্যন্ত মালদার বাইরে একটি স্কুলের দারোয়ান বলল, 'দিদিমণি ক্লাসে। এখনই ছুটি হবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

গতরাত্রে হোটেলে উঠেছি। হোটেলের মালিক আমার নামধাম পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'কি সৌভাগ্য, আপনি আমার হোটেলে? বলুন কি করতে পারি?'

অস্বস্তি হয়েছিল। যে কারণে মালদহে গেলাম তা ওঁকে বলতে চাইনি। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করার সময় সেই কাণ্ড ঘটল। একজন মহিলা আমাকে এমনভাবে দেখতে লাগলেন যেন সিনেমার অভিনেতা দেখছেন। তারপরই তিনি ছুটে গেলেন ভেতরে। একটু বাদেই এক ক্ষীণকায়া প্রৌঢ়া বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি এখানে?'

বললাম, এখানকার একজন শিক্ষিকার সঙ্গে দরকার আছে।'

'আসুন আসুন। এখানে বসে থাকবেন কেন। আপনি আমার স্কুলে এসেছেন শুনলে সবাই খুশি হবে।' প্রায় জোর করে তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি প্রধানশিক্ষিকা কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘর ছাত্রী এবং শিক্ষিকায় ভরে

গেল। এরমধ্যে কয়েকজন আমার লেখা নিয়ে প্রশ্ন শুরু করে দিলেন। খুব রোগা এক শিক্ষিকা বললেন, 'যাই বলুন, আপনার লেখায় আর আগের মত ধার নেই। আর একটা উত্তরাধিকার লিখতে পারছেন না কেন?' আমি হাসলাম। এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। আর দিলে ওঁর ভাল লাগবে না। প্রধানশিক্ষিকা ধমকালেন, 'এসব কি কথা? অ্যাঁ। উনি আমাদের অতিথি, ওঁর সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলছ কেন? যাও, যাও তোমরা এঘর থেকে।'

ঘর খালি হলে প্রধানশিক্ষিকা বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

এই সময় যে ঘরে এল তাকে রাস্তায় দেখলে আমি অনায়াসেই চিনতে পারতাম। এতগুলো বছরেও সে সময়কে একটুও কর্তৃত্ব করতে দেয়নি। সেই একই ছিপছিপে শরীর শুধু তাতে ব্যক্তিত্বের প্রলেপ পড়েছে। সে কোনও কথা বলার আগেই বললাম, 'কি, শরীরটরীর ভাল?'

'কি কাণ্ড! আপনি এখানে!'

'এলাম।'

'তাতো দেখতে পাচ্ছি। বিখ্যাত লোকেরা এলে স্বাভাবিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। পুরো ক্লাস করতে পারলাম না। আমার ছাত্রীরা আপনাকে দেখবে বলে অপেক্ষা করছে।'

প্রধানশিক্ষিকা ঘড়ি দেখলেন, 'আর পাঁচ মিনিটও বাকি ছিল না ছুটি হতে।'

'তাহলে চলুন। যেতে যেতে কথা বলি।'

স্কুলের চৌহদ্দি পার হবার সময় মজা লাগছিল। আমার বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলোর নাম এলোপাথাড়ি উড়ে আসছিল। অস্বীকার করব না, প্রীত হচ্ছিলাম।

বাইরে বেরিয়ে শিউলি বলল, 'কোথায় পৌঁছেছেন!'

'তেমন কোথাও নয়।'

'কিন্তু শরীর তো মিথ্যে কথা বলছে না।'

'তার মানে?'

'সুখী সফল মানুষের ছাপ আপনার শরীরে।'

'মোটা হয়েছি বলুন।'

'হ্যাঁ। আপনার আগের ছিপছিপে শরীরটার কথা মনেও করা যাচ্ছে না আপনাকে দেখে।'

'আপনি কিন্তু ঠিক আছেন।'

'যার আবাহন নেই বিসর্জনও নেই, সে ঠিক থাকে। কিন্তু আপনাকে তো আমার ডেরায় নিয়ে যাওয়া চলবে না। তিনজন মহিলা দু'কামরায় থাকি। ওদের অস্বস্তি হবে। আপনি যদি বিখ্যাত না হতেন তাহলে স্কুলেই কথা শেষ করতে পারতাম।'

'আমি কি আপনাকে বিব্রত করছি?'

'কিছুটা। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে না, এতেই আমি অভ্যস্ত।'

'আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আমার হোটেলে যেতে পারি।'

'চমৎকার। কালই মালদহের মানুষ খলখলিয়ে উঠবে। তার চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা ভাল। আপনার তাতে অসুবিধে নেই তো?'

'এভাবে কথা বলা যায় শিউলি?'

শেষপর্যন্ত আমরা রিক্সা নিলাম। শিউলি থাকে মালদহের মোকদমপুরে। সেখান থেকেই স্কুলে যাতায়াত করে। অতএব সে আমাকে স্টেশনে নিয়ে এল। বিকেল নেমে এসেছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে শূন্য বেঞ্চি পেয়ে বসলাম আমরা।

শিউলি বলল, 'এবার বলুন!'

'বলছি। তার আগে সত্যি করে বলতো, আমাকে দেখে তোমার প্রতিক্রিয়া কি?'

মাথা নাড়ল শিউলি, 'বলব না!'

'তাহলে তো চুকেই গেল।'

'চুকে তো ওনেক আগেই গিয়েছে। তাই না?

'শিউলি, তুমি এমনভাবে কথা বলছ—! আমি তো তোমার শত্রু নই!'

'আপনার তাই মনে হয়? ভাল।'

'এইরকম কথা শুনতে হবে জানলে মালদায় নামতাম না।'

'নামতাম না মানে?'

'আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলাম।'

'আমার খোঁজ পেলেন কি করে?'

'তোমাদের যাদবপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'হঠাৎ?'

চোখ বড় করে তাকাল সে। অনেক অনেক বছর আগে যেমন তাকাতো। অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল যে ভাবে দেবুর খবর ওকে দেব ভেবেছিলাম

তা দেওয়া যাবে না। এমন নিস্পৃহ এবং কাঠ-কাঠ কথার মেয়ের কাছে খবরটা যে মূল্যবান নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু কি ভাবে বলা যায়;

বললাম, 'হঠাৎই চলে গেলাম।'

'আপনি কি করে লেখেন জানি না।'

'কেন?'

'কিছু কিছু সম্পর্ক নিয়ে ছেলেমানুষি করা যায় না।'

'আমি সে রকম কিছু করেছি!'

'আমি আপনাকে শত্রু মনে করি জানেন না?'

'তা হলে দেখছি দেবুর সঙ্গে কিছু ব্যাপারে তোমার মিল হত।'

'তার মানে?'

'সে-ও আমাকে শত্রু ভাবত।'

'কে কি ভাবত আমার জানার দরকার নেই। শুনুন, আমি স্কুলে আজ পনেরো বছর পড়াচ্ছি। চাকরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পড়াবো। মেয়েদের একা জীবন শুরু করা খুব সহজ করে রাখেননি আপনারা। কিন্তু কোনও মেয়ে যদি একা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তা হলে তাকে সেইভাবে থাকতে দিতে বাধ্য হয় সবাই। চাকরি শেষ হলে কি করব, কোথায় যাব তাও ঠিক করেছি আমি।'

'বাঃ। তা হলে তো সমস্যা নেই। এখন প্রতিবছর একই বক্তব্য ছাত্রীদের কাছে রেখে যাও।'

'কি বলতে চাইছেন? স্বামী স্ত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা কতদিন নতুন নতুন কথা বলাবলি করে? কয়েক বছর পরে অসহ্য হলেও সহ্য করে থাকতে বাধ্য হয়, হয় না? আমার অন্তত সেই সমস্যা নেই। এতদিন বাদে আমার কথা মনে পড়ল কেন?'

'ভুলতে চেয়েছিলাম। ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম সেটাই ভুল ভেবেছি।'

হঠাৎ সে হিংস্র গলায় বলল, 'শুনুন। আপনার নাম হয়েছে, অর্থ আছে, প্রতিপত্তি, জীবনের অনেক সুখই আপনার করায়ত্ত। আপনি তাই নিয়ে থাকুন, আমি খুব সাধারণ, আমাকে এই ভাবেই থাকতে দিন। প্লিজ।'

'কিছু মনে করো না। অনেকক্ষণ থেকে তুমি এমনভাবে কথা বলে চলেছ যেন আমি তোমার অনেক ক্ষতি করেছি। তুমি আমাকে শত্রু বলেছ। অথচ আমি ভেবে পাচ্ছি না কোন শত্রুতা আমি করেছি। যতদূর পেরেছি তোমার

কাছ থেকে দূরে থেকেছি। আমার জন্যে তোমার জীবনে কোনও বিঘ্ন না আসুক সেই চেষ্টা করেছি। অথচ আজ তোমার কাছে এসে শুনতে হচ্ছে—।'

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না।

'আপনি কি করে লেখেন!'

'এককথা বারংবার বলো না।'

'বেশ। আপনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছিলেন। মালদায় নামলেন কেন?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'এত বছর বাদে সেটা করতে আসা কি বিলাসিতা নয়?'

'না। আমার মনে হয়েছে খবরটা তোমাকে জানানো দরকার।'

'কি খবর?'

'তোমার সঙ্গে দেবুর শেষ দেখা কবে হয়েছিল?'

'এই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে যাবো কেন?'

'প্লিজ। তর্ক করো না।'

'মনে করতে পারছি না। অনেক অনেক বছর আগে।'

'তোমাদের ডিভোর্স হয়েছিল?'

'সে কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স নিয়েছে কি না অমি জানি না।'

'তুমি নাওনি?'

'প্রয়োজন ছিল না। যেদিন ওদের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম সেই দিনই আমার মন ওকে সম্পূর্ণ ছেড়ে এসেছিল। কাগজে কলমে করার দরকার মনে করিনি।'

'দেবু নেই।' এতক্ষণ পরে শব্দদুটো বলতে পারলাম।

'নেই মানে?'

'একটা অ্যাকসিডেন্টে দেবু মারা গিয়েছে।'

'আপনি জানলেন কি করে? যোগাযোগ ছিল?'

'না। কাগজে দেখলাম। ওর নাম ছাপা হয়নি। সন্দেহ হতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। তারপরেই মনে হল আমার জলপাইগুড়ি যাওয়া দরকার।'

'কেন মনে হল?'

'জানি না।'

'তখন আমাকে খবর দিতে যাদবপুরে গেলেন, তাই তো?'

আমি উত্তর দিলাম না।

'বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ জানার পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছে হল!

'শিউলি!'

'চলুন।' সে উঠে দাঁড়াল, 'আমার এখানে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।'

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ও বেশ জোর হাঁটছে। লক্ষ করলাম বিবাহিত মহিলার কোনও চিহ্ন শরীরে রাখেনি শিউলি। তার মানে বৈধব্য ওকে স্পর্শ করছে না। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কবে জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন?'

'আজ রাত্রের দার্জিলিং মেল ধরব।'

শিউলি রিক্সা ডাকল। বলল, 'এলাম।'

কোনও বাড়তি কথা না বলে সে চলে গেল। পরিস্থিতি এমন ভারী হয়ে গিয়েছিল যে আমি আর কথা বলতে পারলাম না। নিজেকে খুব বিধ্বস্ত লাগছিল। কি দরকার ছিল এখানে আসার! বেশ তো ছিলাম, হঠাৎ কেন যে আবেগ উথলে উঠল। সরলভাবে শিউলির কাছে গিয়ে অপমানিত হলাম। দেবুর মৃত্যুর খবর পাওয়ামাত্র কি রকম গুটিয়ে গেল ও। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে মুখে যাই বলুক দেবু সম্পর্কে সে যথেষ্ট দুর্বল ছিল। হয় তো, হয় তো কেন, নিশ্চয়ই দেবুকে নিজের মতো করে ভালবাসত।

দার্জিলিং মেল মালদহে আসে রাত দুটোর পর। হোটেলে ফিরে এসে একবার ভেবেছিলাম অমন অসময়ে ট্রেন ধরতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। সারারাত ঘুম হবে না। বরং কাল দুপুরের ট্রেন ধরব। কিন্তু মালদহে আরও আঠারো ঘণ্টা থাকতে ইচ্ছে করছিল না। রাত বারোটা নাগাদ রিক্সা নিয়ে স্টেশনে চলে এলাম। আশ্চর্য কাণ্ড, মালদহের কোটায় টিকিট পাওয়া গেল।

আমি রাত জাগতে পারি না। অথচ ওয়েটিং রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে সাহস পেলাম না। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তা হলে সব পণ্ড হবে। কিন্তু কতক্ষণ পায়চারি করা যায়! খবর নিয়ে জানলাম লেট থাকার দরুণ দার্জিলিং মেল সাড়ে তিনটের আগে স্টেশনে ঢুকবে না। আমি দেখেছি আগ বাড়িয়ে ভাল কাজ করতে গেলেই একটার পর একটা বিপত্তি ঘটে।

ওয়েটিং রুমে জায়গা নেই। প্ল্যাটফর্মের একপাশে খালি বেঞ্চি পেয়ে বসে পড়লাম। মাথার ওপর তারায় ছাওয়া আকাশ। ওই আকাশ থেকে হিম পড়ার সম্ভাবনা কম। দেবু এখন কোথায় জানি না। মৃত্যু মানুষকে সমস্যা থেকে

পালিয়ে যেতে সুযোগ দেয়।) দেবু যে জীবন যাপন করত, তাতে মনেই হতে পারে সে মৃত্যুর দেখা পেতে উৎসুক ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর ও চাকরি করেনি। আমরা যেসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে, ভবিষ্যৎ কি জানি না তখন দেবু ভাল চাকরির সুযোগ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করবে বলে ঠিক করল। ওর এক ধনী ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু টাকা যোগালো। জলপাইগুড়ির এক মন্ত্রী তখন পূর্তদপ্তরের দায়িত্বে। অতএব দেবুদের ব্রিজ বা রাস্তা বানাবার কাজ পেতে অসুবিধা হচ্ছিল না। এক বছর পরে গিয়ে দেখি ওর চেহারা বেশ ঝকঝকে হয়েছে। ইতিমধ্যে এক লাখ টাকা লাভ করেছে সে, জিপ কিনেছে। জিপের ড্রাইভারের নাম মন্থর।

তখন একটা বড় কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল ওদের। দেবু আমাকে তার জিপে তুলে সাইটে নিয়ে গেল। মন্থর গাড়ি চালাচ্ছিল। হেসে বলেছিলাম, 'অদ্ভুত নাম তো!'

'হ্যাঁ। গাড়ি চালায় গরুর গাড়ির স্পিডে। তাতে অবশ্য মা খুশি হয়।'

'মাসিমা কেমন আছেন?'

'ভাল নয়। বিয়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছে।'

'বিয়ে? তোর? এখনই বিয়ে করবি?'

'কেন নয়? রোজগার করছি।'

'মেয়ে দেখেছেন মাসিমা?'

'মা কেন দেখবেন! আমি দেখে রেখেছি।'

'সে কিরে! কে?'

'তুই জানিস। শিউলি।'

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যাদবপুরের সেই মেয়ের নাম যে শিউলি তা জেনেছি। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগের কথা। তখন আমরা প্রায় নাবালক ছিলাম। আমি দেবুর কপালের দিকে তাকালাম। সে হাসল, 'দাগটা দেখছিস? আছে। ওই অ্যাক্সিডেন্টের চিহ্নটা যতদিন থাকবে ততদিন শিউলিও থাকবে।'

'তোর সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে?'

'ইয়েস আছে। আমি কলকাতায় গেলেই ওর সঙ্গে দেখা করি। উই লাভ ইচ আদার।' হাসতে হাসতে বলল দেবু। খবরটা আমাকে একটুও কষ্ট দিল না। বিন্দুমাত্র ঈর্ষান্বিত হলাম না। বরং একটু একটু করে ভাল লাগতে লাগল।

হেসে বললাম, 'অ্যাক্সিডেন্টটা তোর উপকারে লেগেছে।'

'হ্যাঁ। ও যেদিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখতে এসেছিল সেদিন একা পেয়েই ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও দিয়েছিল। ব্যাস, তারপর থেকে চিঠি লেখালেখি।'

'মাসিমা রাজি

'আপত্তি করছে খুব। সব মা-বাবা চায় ছেলের বউ নিজের পছন্দমত নিয়ে আসতে। জাত নিয়েও ফ্যাকড়া তুলছেন। তবে মেনে নিতে হবে এটা ওঁরা জানেন।

আমি শিউলিকে মনে করার চেষ্টা করছিলাম। পুজোর সময় যা দেখেছি, তাও কয়েক বছর হয়ে গেল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও সুন্দরী হয়েছে। সেটা এমন একটা বয়স যে বয়সে মনে হত মেয়েরা যত বড় হয় তত সুন্দরী হয়। কলকাতার মেয়ে শিউলি জলপাইগুড়িতে এসে থাকবে এটা ভাবতে খুব ভাল লাগছিল। আমি কলকাতায় থাকি তবু আমার সঙ্গে শিউলির কোনও যোগাযোগ নেই, অথচ জলপাইগুড়িতে থেকেও দেবুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এটা দেবুরই কৃতিত্ব।

ওর সাইটে গিয়েছিলাম। ওর পার্টনার বন্ধু ব্যস্ত ছিল। দেবুকেও ব্যস্ত হয়ে যেতে দেখলাম। যে কর্তৃত্ব নিয়ে সে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলছিল তা আমাকে অবাক করল। মনে হল দেবু এখন সত্যিকারের পূর্ণ ব্যবসায়ী। আমি এই বয়সে ওই ব্যক্তিত্ব অর্জন করিনি। এক ফাঁকে দেবু কাছে এসে বলল, 'আমার পার্টনারকে দেখে কি মনে হয়?'

'ভাল।'

'এমনিতে সব ভাল। শুধু সন্ধের পর মদ খায়।'

'সে কিরে! এই বয়সে?'

'আর বলিস না। ঝগড়া করেছি কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দেখবি আয়।'

দেবু আমাকে একটা কুয়োর কাছে নিয়ে গেল। মনে হচ্ছে এই কুয়ো ব্যবহার করা হয় না। কুয়োতে জল নজরে এল না। দেবু বলল, 'ভাল করে দ্যাখ, বোতল দেখতে পাবি। রামের বোতল। শেষ করে এখানে জমা করছে। মরবে একদিন।'

আজ মালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এই নির্জন রাত্রে বেঞ্চিতে বসে কথা মনে বাজল, 'মরবে একদিন।' প্রত্যেকটা মানুষকেই তো একদিন না একদিন মরতে হয়। দেবুর সেই পার্টনার আজ বেঁচে আছে কি না জানি না। বছর

য়েকের মধ্যে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু দেবু কি জানত তাকেও মরতে
বে তাড়াতাড়ি। আবার তাড়াতাড়ি বলি কি করে! পঞ্চাশে লোকে এককালে
ংসার ত্যাগ করে বনে যেত। বনে যাওয়া তো মরে যাওয়ার সামিল। আজ
ানুষের সব দিক থেকেই আয়ু বেড়েছে। আগে চল্লিশে যাকে বুড়ো বলে মনে
ত এখন তাকে ষাটেও তা মনে হয় না। পঞ্চাশে পৌঁছে বিয়ে করে ছেলের
াবা হয়েছেন আমার এক বন্ধু। আগেকার মানুষেরা মৃত্যুভয়ে চল্লিশ পর হলেই
টিয়ে থাকতেন. এখন ও সব চিন্তা মাথায় বড় একটা আসে না। তা সত্ত্বেও
থিবীর সব মানুষ তো 'মরবে একদিন।'

উঠে দাঁড়ালাম। অদূরেই আলোকিত প্ল্যাটফর্ম। এক কাপ চা খেলে কেমন
য়? নাঃ, থাক। মাঝরাতে চা খেলে শরীর বিগড়াতে পারে। আজ থেকে কুড়ি
ুর আগে হলে এমন কথা মনেই আসত না। হাঁটতে হাঁটতে ওয়েটিং রুমে
লে এলাম। বসার জায়গা যারা পেয়েছিল তারা তো ভাগ্যবান। সেই অবস্থাতেই
মোচ্ছেন, যাঁরা পাননি তাঁদের অনেকেই মেঝেতে চাদর বিছিয়ে গভীর ঘুমে
গ্ন। হঠাৎ একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস
রতে পারছিলাম না। শিউলি এগিয়ে এল, 'বসবেন?'

যেন কিছুই হয়নি, আমরা অনেকক্ষণ এসেছি, সে বসেছিল আমি জায়গা
নি, তাই যেন আমাকে বসতে বলল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে?'

'দার্জিলিং মেল ধরব।'

'সেকি!'

'অবাক হচ্ছেন কেন? খবরটা যখন দিতে এসেছিলেন তখন কি ভাবেননি
ও আপনার সঙ্গে যেতে পারি? বাড়ি ফিরে গিয়ে মত পাল্টালাম।
হেডমিসট্রেসকে জানিয়ে দিয়েছি আমার কয়েকদিন ছুটি দরকার। রিজার্ভেশন
এসে দেখলাম আপনার পাশের সিটটাই আমি পেয়ে যাচ্ছি। বসুন
াইলে চেয়ার দখল হয়ে যাবে।'

আমি তখন ঝড়ের মধ্যে পড়েছি। যত তিক্ততাই আসুক, এককালে তো
ুসম্পর্ক ছিল তাই দেবুর খবর শিউলিকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলাম।
সে যে যেতে চাইবে, চাইতে পারে, তা কল্পনা করিনি। জলপাইগুড়িতে
আমার আত্মীয়রা আছেন। আমি সেখানে উঠব। শিউলি কোথায় থাকবে?
ডিভোর্স না হলেও দেবুর বাড়িতে কি ও গ্রহণীয় হবে? নিশ্চয়ই না। তা হলে
ওর যাওয়া মানে সমস্যা বাড়ানো। অথচ এ সব কথা আমি বলি কি করে?

'তুমি কেন যাচ্ছ?'

'আপনি কেন যাচ্ছেন?'

'আমরা বাল্যবন্ধু ছিলাম। খবরটা শুনে খারাপ লেগেছে, সেই টানে যাচ্ছি।'

'ঠিক। এককালে আমরা স্বামী-স্ত্রী ছিলাম। ধরে নিন সেই টানে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপত্তি আছে?'

'বিন্দুমাত্র না।' মিথ্যে কথাটা যতটা সম্ভব সহজ গলায় বললাম।

ট্রেন এল। দুটো সিট পাশাপাশি। আমি লক্ষ করেছি ট্রেনে কিছু অদ্ভুত ধরনের যাত্রী থাকেন। এঁরা মাঝরাত্রেও ঘুমান না, গল্প করেন, চা খান। একটি ছেলে বলল, 'এখন তো ভোর হতে দেরি নেই, বউদি আপনারা কি ঘুমোবেন?'

শিউলি আমার দিকে তাকাল। বউদি শব্দটা তাকে স্বস্তি দেয়নি। বললাম, 'হ্যাঁ ভাই, ঘুমাবো। আপনাদের অসুবিধে হলেও কিছু করার নেই!'

আমি শুয়ে পড়লাম। মাঝখানের বাঙ্ক খোলা হওয়ার কারণে শিউলিকে নিচে শুতে হল। খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম। রাত জাগার অভ্যেসও নেই। ঘুম ভাঙল যখন তখন দিনের আলো ফুটেছে। উল্টোদিকে বসা ছেলেটি মন্তব্য করল, 'দাদা জেগেছেন।'

রাগ হল খুব কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। আজকাল থ্রি টায়ারে ট্র্যাভেল করতে যে চাই না তার যথেষ্ট যুক্তি আছে। গায়ে পড়ে কথা বলার স্বভাব বাঙালির মতো আর কারও নেই। নোংরা, ভিড়, আসন জবরদখল এ তো আছেই। পাঁচ মিনিটের আলাপে কি দিয়ে কাল ভাত খেয়েছি জানতে চায় বঙ্গ-সন্তানই। এন জে পি পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা তেমন কথা বললাম না কারণ আমাদের কথা কোথায় পৌঁছাবে জানি না আর তা ওই সহযাত্রীদের কৌতূহল নির্ঘাত বাড়িয়ে দেবে।

নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে একটু দেরিতে দার্জিলিং মেল পৌঁছালে জলপাইগুড়ি শহরে যাওয়ার লোকাল ট্রেনটা আর ধরা যায় না। তখন সাইকেল রিক্সায় বাস ধরতে ছুটতে হয়। আজও তাই হল।

শিউলি বলল, 'বাস স্ট্যান্ডেই চলুন।'

বললাম, 'সারারাত ঘুমাইনি। আর ছোটাছুটি না করে ট্যাক্সি নিচ্ছি

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'জলপাইগুড়ি।

'আমি ওদের বাড়িতে যাব।'

শিউলির দিকে তাকালাম। এত বছর বাদে সে বাড়িতে গেলে কি শিউলি ভাল অভ্যর্থনা পাবে? ছেলের মৃত্যুর পর ওঁর কি আলাদা হয়ে যাওয়া বাড়ির উকে গ্রহণ করতে পারবেন? কিন্তু আমি ওইসব প্রশ্ন করলাম না। জলপাইগুড়ি খান থেকে মিনিট পঁয়তাল্লিশে পৌঁছে যাওয়া যায়। দেবুদের বাড়ি সেখান থকে থেকে আরও ঘণ্টাখানেক দূরে। বাবা অবসর নেবার পর আমরা ওখান থকে শহরে চলে এসেছি। এতটা রাস্তা শিউলি একা যাবে? মুহূর্তেই মত বদলে ফললাম। যেখানে আমার বাল্যকাল এবং যৌবনের প্রথম দিক কেটেছে সখানে পরিচিত মানুষের সংখ্যা তো কম নয়। তাদের বাড়িতে আমি স্বচ্ছন্দে ঠতে পারি। শিউলিকে বললাম, 'এসো।'

ট্যাক্সিতে উঠে শিউলি বলল, 'কি দরকার ছিল! একজন স্কুল শিক্ষিকার াক্ষে এ ভাবে যাওয়া বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।'

'শিউলি, তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

'আপনার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

আমি তর্ক বাড়ালাম না। অ্যাম্বাসাডার গাড়ির পেছনের সিটের দু প্রান্তে মামরা দুজনে বসে। শিউলি জানলা দিয়ে দূরের মাঠ দেখছে। প্রায় একই রকমের চেহারা যা আমি যৌবনের শুরুতে দেখেছি। চোখ বন্ধ করলাম।

দেবুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম আমি। সদলবলে ওরা এসেছিল কলকাতায়। দেবুর বড়দা বলেছিলেন, 'কলকাতার নিয়মকানুন তেমন জানি না, তুমিই বরকর্তা'।

খেটেছিলাম খুব। গোলপার্কে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওরা বিয়েটা দিয়েছিল। বিয়ের আগে কনের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'চিনতে পারছেন?'

শিউলি মুকুট মাথায় রাজেন্দ্রাণীর মতো তাকিয়েছিল, জবাব দিতে পারেনি। বলেছিলাম, 'আপনি তো মোটা হবার ভয়ে সন্দেশ খান না।'

সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে ফেলেছিল, 'আপনি প্রসাদ দিচ্ছিলেন।'

'ঠিক। অ্যাক্সিডেন্ট আমারও হয়েছিল।'

সে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। বউভাতে আমি যেতে পারিনি। মাস দুয়েক পরে চাবাগানে গেলে আমার হাত ধরে নিয়ে গেল বাড়িতে। মাসিমা খুব অনুযোগ করলেন বউভাতে আসিনি বলে। দেবু চিৎকার করে শিউলিকে ডাকছিল। মাসিমা চাপা গলায় আপত্তি জানালেন। আমাকে বললেন, 'এই এক

হয়েছে। নতুন বউ-এর আব্রু থাকবে না? কলকাতার মেয়ে বলে পরপুরুষের সামনে ড্যাংডেঙিয়ে বেড়াতে হবে?'

দেবু প্রতিবাদ করল, 'ও এ বাড়িতে পরপুরুষ'?

'ওর কথা বলছি না। যা, ভেতরে গিয়ে দেখা করে আয়।' খুবই সূক্ষ্ম তব আমার মনে হল মাসিমা শিউলিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এ ভাবে সম্পর্ক ঠিক থাকবে না।

শিউলি বই পড়ছিল, আমাকে দেখে সেটা রাখল, 'আসুন। কবে এলেন?

'আজই। কেমন লাগছে?'

'ভাল।'

দেবু বলল, 'ওটা কথার কথা। একরকম বন্দীদশায় আছে বলতে পারিস মা যত রাজ্যের নিয়মশৃঙ্খলা ওর ওপর চাপাতে চেষ্টা করছে।'

'প্রথম প্রথম ও রকম হয়ই।' বললাম, 'একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন।

'আপনার বন্ধুকে বলুন।' শিউলি গম্ভীর হল, 'আমি যেতে চাইলে কলকাতার মেয়েদের দুর্নাম হবে।'

'তা কেন? আমি মাসিমাকে বলব।'

খানিকটা গল্প করে সেদিন চলে এসেছিলাম। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল শিউলি এখানে এসে ভাল নেই। এ কথা দেবুও বলল। তার মা মেয়েদের বেলায় যত স্বাধীনতা দিয়েছেন পুত্রবধূদের বেলায় সেটা দিতে রাজি নন। দেবুর বউদি তো বছর আটেক বাপের বাড়িতে যান না। মাকে বুঝিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না ওর।

ফিরে আসার আগে দেখা করতে গেলাম। সেদিন মাসিমাকে নিয়ে দেবু গিয়েছিল ডাক্তারবাবুর কাছে। আমাকে দেখে শিউলি খুশি হল। বললাম, 'আজ কলকাতায় যাচ্ছি।'

'কলকাতায়?' শিউলির হাসি উধাও হয়ে গেল।

বললাম, 'মানিয়ে নিন। একটু সময় গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

বছরখানেক বাদে আবার গেলাম চা-বাগানে। দেবু বিশাল অঙ্কের কাজ পেয়েছে। আমি গিয়েছি খবর পেয়ে ছুটে এল। দেখলাম পরিশ্রমের ছাপ শরীরে। বলল, 'মন মেজাজ খারপ। শিউলির বাচ্চা হবে না।'

'সে কি? মা চাইছিল নাতির মুখ দেখতে। নয়মাসেও যখন কনসিভ করল না তখন ডাক্তার দেখালাম। তিনজনই রায় দিয়েছে সম্ভব নয়।'

'জলপাইগুড়ির ডাক্তার কি বলেছেন, কলকাতায় নিয়ে যাবার কথা।'

'ও যেতে চাইছে না।'

'কেন?'

'তুই আয় না, বোঝাবি।'

তখন বয়স অল্প, উৎসাহ প্রচুর। গেলাম। শিউলিকে বেশ রোগা দেখলাম। আমাকে দেখে হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে দেবু বলল, 'আরে, তুই ওকে আপনি বলছিস কেন? তুমি বল।'

বললাম, 'যাকে বলছি তার তো আপত্তি থাকতে পারে।'

'দূর! ওর আবার আপত্তি!'

শিউলি বলল, 'শুনলেন তো! তা আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন।'

দেবুকে দেখলাম একটা কাজের বাহানা করে উঠে যেতে। মাসিমাকে দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করলাম। শিউলি বলল, 'ছোট মেয়ের বাড়িতে। উনি আজকাল প্রায়ই তাঁর মেয়েদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান।'

'কলকাতায় যাচ্ছ কবে?'

'কেন?'

'দেবু চাইছে ভাল ডাক্তার দেখাতে।'

'এই ভাবে একটার পর একটা ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করুক আমি চাই না। ইতিমধ্যে তিনজন করেছেন। আর তাতে আপনার বন্ধুর ধারণা আমি সতীত্ব হারিয়েছি।'

'সেকি?' দ্বিতীয়বার অবাক হলাম।

'ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'বেশ তো, কলকাতায় অনেক ভাল মহিলা গাইনি আছেন।'

'ঠিক। কিন্তু যে পরিবার একজন পুরুষ গাইনির কাছে গেলে সতীত্ব যায় বলে মনে করে তাদের জন্যে বংশবৃদ্ধি করা দরকার বলে মনে করি না। তা ছাড়া, পরীক্ষা তো একা আমার ওপর হচ্ছে। আপনার বন্ধুর বেলায় সেটা হওয়া দরকার। তাই না?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু উনি তাতে রাজি নন।' শিউলি বলল, 'এখানে কি রকম বন্য মানসিকতা। আমি তাল রাখতে পারছি না। আপনি বলেছিলেন মানিয়ে নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার কথা রাখতে গেলে এ জীবন এ ভাবেই কাটাতে হবে।'

''ঠিক আছে। দেবু আমার ভাল বন্ধু। তোমাকে আমরা একসঙ্গে দেখেছিলাম মনে হয় আমি বললে ও কথা শুনবে।'

পরে দেবুকে একা পেয়ে কিছু বলার আগেই ও প্রশ্ন করল, 'তোকে বলল ?'

'কি ব্যাপারে?'

'আমার বিরুদ্ধে কিছু বলল?'

'তোর বিরুদ্ধে বলেনি। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়ে তুই রি-অ্যাক্ট করেছিস?'

দেবু বলল, 'বাঃ। বলেছে। ইয়েস। আমার স্ত্রীর শরীরে অন্য একটা লোক হাত দেবে তা ভাবতে একটুও ভাল লাগে না।'

'অসুখ হলে ডাক্তার দেখবে না?'

'তুই বুঝবি না!'

'আমি বাধ্য হচ্ছি বলতে তুই মধ্যযুগীয় কথাবার্তা বলছিস।'

'তাই তো বলবি। নিজে বিয়ে করিসনি তো।'

'দেবু ! তুই আধুনিক যুগের ছেলে।'

'ঠিক। কিন্তু আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

'না বললে হবে না। ওকে নিয়ে কলকাতায় আয়। নিজেকেও দেখা। তোরও তো কোনও প্রব্লেম থাকতে পারে। চিকিৎসা করালে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তার মানে আমাকে নিয়ে ভালই আলোচনা হয়েছে। ও কি তোকে রক্ষাকর্তা বলে ঠাউরেছে? শোন, তোর কোনও লাভ হবে না।'

'কি বলছিস তুই?'

'কিছু না।'

এসব অনেক বছর আগের কথা। মাস ছয়েক বাদে যখন গেলাম তখন দেবু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। কিন্তু তপন বলল, 'দেবুর ব্যাপারটা শুনেছিস?'

'না। কি হয়েছে?'

'ওর কাজকর্ম সব ডকে উঠবে।'

'কেন?'

'দিনরাত মদ খাচ্ছে।'

'দেবু মদ খাচ্ছে?' চমকে উঠলাম।

'ওর বউ ওই বাড়িতেই আলাদা থাকে। এখানকার স্কুলে কাজ নিয়েছে। নিজে রান্না করে খায়। দেবুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললে চলে।'

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'বীরপাড়ার কাছে একটা কনস্ট্রাকশনের কাজ পেয়েছিল। সাইটেই পড়ে থাকে।'

খবর নিয়ে বাস ধরে চলে গেলাম। পিচের রাস্তা থেকে অনেকটা হাঁটার পর নির্জনে ওর কাজের জায়গা। লক্ষ্য করলাম কোথাও কোনও কাজকর্ম হচ্ছে না। একটা কাজের লোক আমাকে যে ঘরটায় নিয়ে গেল সেখানে বিবিধ-ভারতী বাজছে। লোকটা ডাকল, 'সাব, এক আদমি আয়া হ্যায়।'

'বোলাও হিঁয়া।'

ভেতরে ঢুকলাম। হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে দেবু শুয়েছিল। মুখে কদিনের না কামানো দাড়ি। আমাকে দেখে বলল, 'তুই'?'

'কি করছিস?'

'মাল খাচ্ছি। খাবি?'

'তোর এই অবস্থা!'

'জ্ঞান দিবি না। জ্ঞান আমি সহ্য করতে পারি না।' বলেই চেঁচালো, 'ধেনু, এ ধেনু! আমার জিগরি দোস্ত এসেছে। মুরগি বানা, এতোয়ারি কোথায়?'

'ঘর গিয়া।'

'ডাক তাকে। আজ রাতভোর ফূর্তি হবে। শোন ইয়ার, আজ আমার অনারে তোকে মাল খেতে হবে। আজ আমার লাস্ট স্টক অফ বিলিতি আছে।' হাত নেড়ে লোকটাকে সরালো সে।

'তোর লজ্জা করছে না দেবদাসের নকল করতে?'

'দেবদাস? তার মানে তুই স্বীকার করছিস আমি মেয়েছেলের কাছে চোট খেয়েছি!' বোতল থেকে মাল ঢেলে জল মেশালো সে।

'শিউলি কোথায়?'

'সে বহাল তবিয়তে আছে। আমার পয়সা ছুঁতে তার ঘেন্না লাগে। বহুৎ বাকি পড়ে গেছে রে! আমাকে হাজার পঞ্চাশেক ধার দিবি? তাহলে এই কাজটা তুলে দিতে পারি।'' বলে মদ খেতে লাগল সে।

'আমি অত টাকা কোথায় পাব?'

'তা অবশ্য। তোরা তো ডরপুক কেরানি। অ্যাম্বিশন নেই। তোর মতো

একটা কেচোর সঙ্গে বিয়ে হলে শিউলিরা ভাল থাকে।'

'আমি যাচ্ছি।'

'নো। এসেছ নিজের ইচ্ছেয় যাবে আমার অনুমতি নিয়ে। এই শোন, তুই শিউলি ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিস?'

'দেবু?' চিৎকার করে উঠলাম।

'রাগ করো না গুরু। তুমিই শালা প্রসাদ দিয়ে ওকে বাগাতে চেয়েছিলে। বেঁচে গেছিস শালা। তোর হয়ে আমি বিষ খেলাম।'

'বিষ?'

'নিশ্চয়ই। মেয়েছেলে যখন রেফ্রিজেটার হয় তখন পুরুষের জীবন বিষ বিষময় হয়ে যায়। শিউলি একটা ডিপফ্রিজ।'

'ছি! নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে এভাবে কথা বলছিস?'

'ইয়েস বলছি। কালেভদ্রে তার মর্জি হলে আমি শুতে পারব। আমি চাইলে বলবে তুমি মানুষ না পশু। নো কোয়াপরেশন। আর কথায় কথায় তোর প্রশংসা। তুই নাকি আমার থেকে বেটার মাল। অথচ আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার আর তুই বাংলায় এম.এ। বোঝ!'

এইসময় একটি স্বাস্থ্যবতী আদিবাসী মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হল দেবু, এই যে, এসে গিয়েছে। ওর নাম রেখেছি রম্ভা। সেক্স বম্ব। রম্ভা মুরগি বানাও, এই বাবুকে সেবা করতে হবে। আমার একটা বউ আছে জানো তো, সে এই বাবুকে হিরো ভাবে।'

রম্ভা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসে, 'তোর শত্রু বল?'

হা হা করে হাসে দেবু, 'না, না। শত্রু হবে কেন? পরম বন্ধু। হাঁস ডিম পাড়ে কষ্ট করে আর দারোগাবাবু সেই ডিমের ওমলেট খায়।' বলেই গলা নামাল, 'কেমন দেখছিস রম্ভাকে। পাগল করে দেবে। কিন্তু আমি পাগল হই না।'

বলেছিলাম, 'যথেষ্ট অপমান করেছিস। আমি চললাম।'

'না ভাই, প্লিজ। অনেকদিন পরে মন খুলে কথা বলছি। এখনই যদি চলে যাস তা হলে খুব খারাপ লাগবে। অনেস্টলি বলছি। এই যা, মুরগি বানা।'

রম্ভা চলে গেল। এই মাঠের মধ্যে সাময়িকভাবে বানানো দরমার ঘরে দেবু যেভাবে আছে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বললাম, 'নিজেকে নষ্ট করছিস কেন?'

'নষ্ট করছি কে বলল?'

'শিউলির সঙ্গে তোর কি ঝামেলা হয়েছে?'

'শিউলি! নো। কোনও ঝামেলা নেই। ও আমার জীবনযাপন পছন্দ করে না, আমি ওকে মানতে পারি না। ব্যাস, চুকে গেল।'

'চুকে যদি গিয়ে থাকে তা হলে এই ভাবে থাকতে হবে?'

'কিভাবে থাকছি? ধর, তুই, ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত মানুষ। পুতু পুতু করে এটা অন্যায়, ওটা ঠিক নয় করে আশি বছর কাটিয়ে মরে যেতে বাধ্য হলি, কি লাভ হল তোর? সেই তো মরতে হল। মাঝখান থেকে কোনও আনন্দই পেলি না। বাছবিচার করতে করতেই সময় কেটে গেল, জীবনটাকে ভালোভাবে দেখতেই পেলি না।' গ্লাস শেষ করল সে।

'তুই জীবন দেখেছিস?'

'আলবৎ!'

'ওই শরীরসর্বস্ব রম্ভার সঙ্গে ফুর্তি করা মানে জীবন দেখা?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সে। আমাকে ইশারা করে বোতল হাতে বাইরে বেরিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করলাম। দেখলাম যে লোকটা আমাকে ওর কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে মুরগির পালক ছাড়াচ্ছে। একটা কুয়োর সামনে দাঁড়িয়ে দেবু বলল, 'কয়েক বছর আগে আমার সেই পার্টনার বন্ধুর কাণ্ড দেখিয়েছিলাম তোকে। ব্যাটা একটা কাজের সময় কুয়ো অর্ধেকটাও ভর্তি করতে পারেনি। তুই চেয়ে দ্যাখ।'

দেখলাম। আধহাত জায়গাও বাকি নেই, বোতলে বোতলে ভর্তি হয়ে গেছে কুয়ো।

'এত মদ তুই খেয়েছিস?'

'কি আরাম বুঝবি না!'

'তোর লিভার নষ্ট হয়ে যাবে।'

'গেছে। যাবে না, গেছে। শুধু লিভার নয়, আমার অনেক ক্ষমতাই উধাও হয়ে গিয়েছে। ওই রম্ভাকে জিজ্ঞাসা কর, ওর পাশে শুলে আমাকে ওর এক বছরের শিশু বলে মনে হয়। আস্ক হার। এক বছরের শিশু তো আর তোর কথামত ফুর্তি করতে পারে না।'

কি রকম মায়া হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই আমার সঙ্গে যাবি?'

'কোথায়?'

'কলকাতায়। তোকে ভাল ডাক্তার দেখাতে চাই।'

'দূর। আমি ভাল আছি। খামোকা সুস্থ শরীরটাকে ব্যস্ত করতে যাব কেন?

সেদিন অনেক বুঝিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু যে মানুষ বলে তার কোনও সমস্যা নেই, দিব্যি আছে তাকে কি আর বোঝানো যায়!

মুরগি রান্না হবার আগেই ওর কথা জড়িয়ে গেল। ক্যাম্প খাটে শুয়ে কথা বলতে বলতে চোখ বন্ধ হল এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। অ্যালকোহলের কারণে ওই ঘুম তাড়াতাড়ি ভাঙবে না। দেবুর মুখের দিকে তাকালাম। অত্যাচারের ছাপ বড় বেশি স্পষ্ট। গায়ের রঙও নষ্ট হয়ে গেছে। অসুস্থ যে তা এক পলকেই বোঝা যায়!

টেবিলে কিছু বইপত্র খাতা রয়েছে। অদ্ভুত সব বই। মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'র সঙ্গে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'চিতা বহ্নিমান।' ঠিক পাশেই বিমল করের 'পূর্ণ অপূর্ণ।' এই তিনটে বই একই সময়ে কোনও পাঠক পড়তে পারে? খাতাটা খুললাম। ডায়েরি গোছের লেখা। পরপর নয় অবশ্যই। অন্যের ডায়েরি পড়া উচিত নয় কিন্তু আমার নামটা নজরে আসায় কৌতূহল হল।

দেবুর হাতের লেখা জড়ানো। কিন্তু পড়তে অসুবিধে হল না, 'শিউলির একটা ভাল বর দরকার ছিল। পরিষ্কার, ভদ্র, শিক্ষিত বর। যাকে ও দুধ খাওয়াবে, গলায় চেন দিয়ে সত্যজিতের ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে। যেমন-' নিজের নামটাকে এত বিশ্রী এর আগে কখনও লাগেনি। মুখ ফিরিয়ে দেবুর দিকে তাকালাম। মৃতদেহ বলে মনে হল।

ওই পাতায় আর কোনও লেখা ছিল না। পরের পাতায় শুরু হচ্ছে এইভাবে, 'ওর সন্তান দরকার। আমার এলেম নেই। আগেকার দিনে নিয়োগ প্রথা চালু ছিল। ও যদি সেটা মেনে নেয় তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। যে এককালে সন্দেশ খাওয়াতে চেয়েছিল সে তো লগবগিয়ে উঠবে প্রস্তাব শুনলে। অবশ্য ভদ্রলোক তো, প্রস্তাব শুনলে ভয়ও পেতে পারে (ভদ্রলোকরা গোপনে গোপনে যা চেটে খেতে ভালবাসে....প্রকাশ্যে সেটা পছন্দ করে না বলে ভান করে।) শালা, আমি জীবনে ভদ্রলোক হব না।'

আর পড়তে ইচ্ছে করল না। খাতাটা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনে রম্ভা, 'মুরগি হয়ে গেছে। দেব?'

'না। দেবুকে বলো আমি চলে গেছি।'

'যাবি মানে? তোর জন্যে মুরগি বানালাম, না খেয়ে যাবি কেন?'

'তোমরা খেয়ে নিও।'

'বুঝতে পেরেছি। বাবুর কথায় রাগ হয়েছে। ওই বাবুটা ওই রকম। কিন্তু ান খুব ভাল। আমরা তাই বাবুর কথায় রাগ করি না।' তারপর অদ্ভুত হাসল ম্ভা 'বাবু বলল নাচ হবে, ফুর্তি হবে। চলে গেলে সেসব কি করে হবে?'

আমি আর দাঁড়ালাম না। প্রশ্নের জবাব দিতে ঘেন্না করছিল।

তপন এবং বিশুর কাছে বিস্তারিত জানলাম। কর্তৃপক্ষ ওর কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দিয়েছেন তবু দেবু সাইটে পড়ে আছে। মাঝেমাঝে জিপটা নিয়ে গঞ্জে আসে। সে সময় স্টিয়ারিং-এ থাকে দেবু, আর মন্থর পেছনে। ভগীরথের মদের দোকানে ঢুকে যায় দেবু। সেখান থেকে তার জ্ঞানহীন শরীরটাকে তুলে জিপ চালিয়ে ফিরে যায় মন্থর। ইতিমধ্যে দেবুর দাদা ভাইকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। দেবুর মা খুবই অসুস্থ।

ভদ্রমহিলাকে দেখতে গেলাম। বিছানায় মিশে আছেন বলা যায়। আমাকে দেখে চিঁচিঁ করে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এই সময় শিউলি এল। ছেলের বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন মাসিমা, শিউলি বলল, 'ওঁকে এসব বলে কি লাভ মা!'

মাসিমা চিৎকার করলেন, 'কাকে বলব? কে আসে আমার কাছে! আমার সোনার ছেলে নষ্ট হয়ে গেল তোর জন্যে আর তোর সেবা খেয়ে আমাকে মরতে হচ্ছে। ঘেন্না ঘেন্না !' মুখ বীভৎস হয়ে উঠল তাঁর।

শিউলি বলল, 'আর কাউকে যদি দেখতাম আপনার কাছে আসতে তাহলে নিশ্চয়ই ঘেন্না বাড়াতে আমি আসতাম না।'

মাসিমা বললেন, 'স্বামী পুরুষমানুষ। পুরুষেরা তো অন্যায় করবেই। মেয়েমানুষের কি উচিত তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বল্।'

শিউলি বলল, 'ঠিক আছে। এসব চিন্তা ছেড়ে ঠাকুরের নাম করুন। ডাক্তার বলেছেন এমন করলে ওষুধ কাজ করবে না। আপনি আসুন।'

শিউলির সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। চাতালে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কেমন লাগছে?'

'মানে?'

'এই যে জীবন দেখছেন, আমার সুখ?'

'সুখ?'

'আপনি তো তাই চেয়েছিলেন।'

'আমি? কি বলছ?'

''কেন? আপনি আমাকে চাননি? সন্দেশ খাওয়াতে না পেরে পরের দি
আমাকে দেখার জন্যে কারবালা বাগানে ছোটেন নি? আপনার সেবা করিনি
বলে আফশোস হয়নি আপনার? আপনার বন্ধুকে বিয়ে করেছি বলে বউভাতে
আসেননি, সত্যি নয়?'

'এসব কে বলেছে তোমাকে?'

'শুধু আপনার বন্ধু বললে কতখানি বিশ্বাস করতাম জানি না, তিনি সাক্ষী
হিসেবে বিশুবাবুকে নিয়ে এসেছিলেন। বলুন মিথ্যে?'

'দ্যাখো, তখন অল্প বয়স ছিল। অল্পবয়সের চাপল্য থেকে কত কিছু করে
লোকে। এটাকে কেউ গুরুত্ব দেয়।'

'আপনি তাহলে কি চান?'

'তুমি দেবুকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

'কেন? তাতে আপনার কি লাভ?'

'ও বেঁচে যাবে। এভাবে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য।'

'আপনি যান। আর কোনও কথার দরকার নেই।'

আমি চলে এসেছিলাম। এসব ঘটনা এখন ছায়াছবির মত চোখের সামনে
ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকবেন?'

'না। আপনি তিস্তা ব্রিজ দিয়ে চলুন।'

সেই নিউজলপাইগুড়ি থেকে শিউলি জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখে আসছিল
এবার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি শহরে যাবেন না?'

'না'

'চা বাগানে কি কেউ থাকেন?'

'আত্মীয় বলতে কেউ নেই। বাবা অবসর নেবার পর শহরে চলে এসেছিলেন
তবে কিছু বন্ধুবান্ধব তো আছে। গেলে আশ্রয় দিতে আপত্তি করবে বলে মনে
হয় না।''

'অবশ্যই। ছোটবেলার বন্ধু যদি খ্যাতিমান লেখক হয় তো কথাই নেই

'তোমার কিসে আপত্তি? আমার লেখা না জনপ্রিয়তা?'

'দুটোই। আপনার প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' খুবই কাঁচা ভাবনার লেখা
ফ্রেস লেগেছিল। যে কয়েকটা উপন্যাস আপনাকে জনপ্রিয়তা এবং অ
দিয়েছে তার মধ্যে উত্তরাধিকারে আপনি অনেস্ট ছিলেন, বাকিগুলো

কিভাবে কব্জা করা যায় সেই ভেবে লেখা।'

'ভাল! তাহলে পাঠককে কব্জা করার একটা ফর্মূলা আছে। কিন্তু সেই ফর্মূলা অবিক্রীত লেখকরা ব্যবহার করেন না কেন?'

'মাপ করবেন, কেন করেন না আমি জানি না। সুখেন দাস বা পরে অঞ্জন চৌধুরী জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত হয়েছেন। কেন অন্যান্যরা তাদেঁর অনুসরণ করেননি আমি জানি না, কিন্তু সত্যজিৎ বা তপন সিংহ হতে হলে প্রতিভার দরকার হয়।'

'ঠিক বলেছ। আমার প্রতিভা নেই কিন্তু চেষ্টা আছে। আছে বলেই শরৎচন্দ্র যে পথে গিয়েছেন সেই পথটাকে একটু অদলবদল করে নিয়ে করে খাচ্ছি। খুশি তো?'

'আপনার মাধবীলতা বা দীপাবলী তো তাই। অস্বীকার করেন?' মাথা নাড়ল শিউলি, 'বানানো, সাজানো কষ্টকল্পিত। বাস্তবে ওরকম মেয়ে হয় না। আর বাংলাদেশের যত বোকা মেয়ের দল তা পড়ে পুলকিত হয়ে ভাবে আমি কেন ওরকম হলাম না।'

'এসব থেকে প্রমাণ হচ্ছে তুমি আমার লেখা পড়!'

'দেশ রাখি, রাখলে পড়তে হয়।'

'কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দেয়নি যে লেখা ভাল লাগে না পড়তে হবে।'

শিউলি মুখ ফেরাল, 'আপনি বুঝবেন না, বুঝলে লেখক হতেন।'

মহিলারা যখন আক্রমণ করেন তখন তাঁদের কথার ধার অর্জুনের তীরের থেকেও ধারালো হয়। নীলকণ্ঠ হওয়া খুব কঠিন কিন্তু সেটা একবার হতে পারলে সেই আক্রমণ সামলানো যায়। আমি আর কথা বললাম না।

দেখতে দেখতে ময়নাগুড়ি বাইপাস হয়ে জলঢাকা নদী ডিঙ্গিয়ে ধূপগুড়ি হয়ে ট্যাক্সি চা বাগানের কাছে চলে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি তো দেবুদের বাড়িতেই যাবে!'

'সেখানে ছাড়া আর কোথায় যেতে পারি?'

'তুমি অযথা আমার উপর রেগে যাচ্ছ।'

'আপনি ইচ্ছে করলে এখানে কোথাও আমাকে নামিয়ে দিতে পারেন।'

'এখানে? এই জঙ্গলে?'

'হ্যাঁ। আমি একটা বাস ধরে চলে যাব। তাতে পাঁচজন জানতে পারবে না আপনি আমার সঙ্গে এসেছেন। এতে আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

শিউলি হাসল।

কথাটা যে আমার মনে আসেনি তা নয়। আমি ওখানে গেলে সবাই জানতে পারবে। এই যাওয়াটা এক রকমের। সঙ্গে শিউলি থাকলে সবাই বিস্মিত হবে। দেবুর যতই দোষ থাকুক তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া কলকাতার মেয়ে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমার সঙ্গে ফিরে এসেছে এই খবর অনেকের জিভে সুড়সুড়ি দেবে। মনেই এসেছিল কিন্তু সেটাকে সরিয়েও দিয়েছিলাম। শিউলি সেই কথাটাকে কি করে খুঁজে পেল জানি না।

দেবুদের বাড়িটা গত কুড়ি বছরে অনেক বদলেছে। আগে বড় কাঠের বাড়ি ছিল, এখন দুটো ইট সিমেন্টের বাড়ি হয়েছে তার জায়গায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে শিউলির সঙ্গে ওদের গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম! শিউলির মাথা নিচু, বাড়ির বউ বলে মনে হচ্ছে না।

দেবুর বড়দা সামনে দাঁড়িয়ে। মাথায় টাক পড়েছে। অশৌচের কোনও চিহ্ন তাঁর শরীরে নেই।

'কি ব্যাপার?' যেন বলতে হয় তাই বললেন ভদ্রলোক।

'দেবুর খবরটা।—' বললাম।

'হ্যাঁ, হতই, অনেক অগে হতে পারত, দেরিতে হয়েছে এই যা।'

পাশপাশি দুটো বাড়ি, বোঝাই যাচ্ছে ভাগাভাগি হয়েছে, শিউলি হয়তো বুঝতে পারছিল না কোনদিকে সে যাবে। বড়দা বললেন, 'তুমি কি এখানে থাকতে এসেছ?'

'না। আমি মালদায় আছি। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে যাব।'

'ও। তোমার বউদি ওই বাড়িতে আছেন, গিয়ে দেখা করো।'

শিউলি আমার দিকে তাকাল, 'আপনি কোথায় উঠছেন?'

বলালাম, 'দেখি। ইন্‌সপেকশন বাংলোতে জায়গা পেলে ওখানেই উঠব।'

সে ভেতরে চলে গেল। বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?'

'আমি মালদায় গিয়ে ওঁকে খবরটা দিই।'

'তোমাদের মধ্যে আগাগোড়াই যোগাযোগ ছিল?'

'না। আমি জানতাম না উনি কোথায় আছেন। খবর পেয়ে খোঁজ করে বের করেছি ওঁর ঠিকানা। কুড়ি বছর পরে ওকে গতকাল দেখেছি আমি।'

'আমরা বউমার ঠিকানা জানতাম না। তবু কলকাতার ঠিকানায় খবরটা টেলিগ্রাম করেছিলাম। কোনও জবাব আসেনি। প্রায় দু যুগ আগে যাকে ছেড়ে

বউমা চলে গেছে তার বাড়িতে মৃত্যুর পর না এলেই পারত। দেবুর মৃত্যু নিয়ে পুলিশ কেস হয়েছে।'

'পুলিশ কেস?'

'হ্যাঁ। আছো যখন তখন সবই জানতে পারবে। দেবুর ডয়েরি লেখার শখ ছিল। পুলিশ সে-সব নিয়ে গেছে। তবে ওর জীবনযাপনের কথা সবাই জানত। তাই ওর মৃত্যু নিয়ে কেউ বেশিদিন মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। এসো আবার।'

এই চাবাগানে আমি জন্মেছি, গঞ্জে বড় হয়েছি। দীর্ঘ ব্যবধানের পর রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে মনে হল একটা অচেনা শহরে এসে গেছি। স্কুলবাড়িটা নেই তবে পুজো বোধহয় এখন ওই বাঁধানো মঞ্চে হয়। রাস্তায় প্রায় সবই অচেনা মানুষ।

তপনদের বাড়িতে গেলাম। অনেক ডাকাডাকির পর পাশের বাড়ির লোক বেরিয়ে এসে বলল, 'উনি হ্যামিলটনগঞ্জে চলে গিয়েছেন অনেকদিন। এ বাড়িতে কেউ থাকে না।'

'ওর মা?'

'তিনি মারা গিয়েছেন অনেক আগে। বউছেলে নিয়ে হ্যামিলটনগঞ্জেই ।' আপনিই নিজের পরিচয় দিলাম তপনের বন্ধু হিসেবে। কিন্তু লোকটি , 'ও আচ্ছা! আপনি তো গল্প লেখেন! লাইব্রেরিতে আপনার বই পাওয়া যায়। কিন্তু জানেন, ডিপোজিট না দিলে বই পাওয়া যায় না। অত মোটা মোটা বই লেখেন কেন?'

বিশুকে পেয়ে গেলাম চৌমাথায়। মিষ্টির দোকান করেছে সে। প্রচণ্ড মোটা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, 'তুই?'

'চিনতে পারছিস না?'

'কি করে চিনব? তুই এখন বিখ্যাত লোক, প্রচুর টাকার মালিক, আমাদের মত সাধারণ মানুষকে পাত্তা দিবি কেন?' বলেই পাশে বসা এক ভদ্রলোককে সে বলল, 'চিনতে পার?'

ভদ্রলোককে উত্তর দিতে দিলাম না, 'দেখছি তোরই পরিবর্তন হয়েছে। তুই যদি এই ধরনের কথা বলিস তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে লাভ কি!'

এবার বিশু হৈ হৈ করে উঠল, 'আরে তুই রাগ করছিস কেন? আমি যা

শুনেছি তা বলেছি। আয়, আয়, বোস। চা খাবি?'

বললাম, 'না। রাত জেগে আসছি, একটা থাকার জায়গা দরকার।

'ও। তুই আমাদের বাড়িতে চল। কিন্তু—।

'কিন্তু কি?'

'তোর বোধহয় থাকতে কষ্ট হবে।'

'চল।'

একথা অস্বীকার করব না অভ্যেস মানুষকে অনেক বদলে দেয়। অর্থনৈতি কারণে এককালে যেটা স্বাভাবিক মনে হত এখন তা হয় না। যদি কেউ খর করে সুখ কিনতে পারে তাহলে সে খামোকা কেন অসুখে থাকতে যাবে! মানু যখন অসমর্থ হয় তখন অসুখকেই সুখ মনে করে। বিশুর বাড়িতে গিয়ে বুঝলা ওর ব্যবসা খুব ভাল চলছে না। মোটামুটি চলে যাচ্ছে। ওর স্ত্রী একেবারে সাধারণ, আমাকে স্বামীর বাল্যবন্ধু হিসেবে জেনেও মাথায় ঘোমটা দিলেন ঝটঝট একটা ঘর খানিকটা পরিষ্কার করে আমাকে থাকতে বলা হল। বি বলল, 'আমাদের বাথরুমটা উঠোনের ওপারে। পাশেই কুয়ো আছে। শোন, তু এবেলায় এখানে থাক, ওবেলায় ইন্‌সপেকশন বাংলোয় গিয়ে উঠিস। আ এরমধ্যে কথা বলে রাখব।' ওকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল।

হাতমুখ ধুয়ে চা খাওয়ার পর বিশু একটু স্বাভাবিক হল।

বললাম, 'যা, তোর দোকান খোলা।'

'কর্মচারীরা সামলে নেবে। দেবুর খবর শুনেছিস?'

'বিস্তারিত কিছু জানি না। কাগজে দেখলাম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।'

বিশু মাথা নাড়ল, 'আর বলিস না। ইদানীং তো রাস্তাঘাটে পড়ে থাকত দশ বিশ করে কতটাকা যে আমার কাছে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। টাকা নি আর ভগীরথের দোকানে ঢুকে মাল খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেত। প্রথম প্রথ ওর বড়দা তুলে নিয়ে যেত খবর পেয়ে। পরে আর আসত না। পাটকাঠি মত রোগা হয়ে গিয়েছিল ও।'

'কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা?'

'কবে ধাঁ হয়ে গেছে। কে ওকে কাজ দেবে? মাঝে মাঝে আমার দোকানে বারান্দায় এসে রাত্রে শুতো। কেউ খেতে দিলে খেতো নইলে উপোস। প্রথ দিকে খুব কষ্ট হত, পরে সহ্য হয়ে গিয়েছিল। হাজার হোক ছেলেবেলার ব ফেলতেও পারতাম না। কিন্তু দু'চার টাকা হাতে এলেই ও মদ খেতে যেত

'অ্যাকিসিডেন্ট হল কি করে?'

'মাসখানেক হল দোকানে এসে বলত, বিশু টাকা দে, কলকাতায় যাব। জিজ্ঞাসা করতাম কলকাতায় কি দরকার! ও মাথা নাড়ত, আছে, দরকার আছে। আমরা কেউ কথা বিশ্বাস করিনি। ভাবতাম টাকা দিলেই মদ খাবে। ওর একটা জিপ ছিল মনে আছে? মন্থর নামে একটা লোক চালাতো? তা সেই জিপ তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। ওটা কিনেছিল মালবাজারের এক ব্যবসাদার। সে মন্থরকেও চাকরি দিয়েছিল। সেবু একদিন মালবাজারে যায়। মন্থর যখন একা তখন দেখা করে। ওকে দেখে মন্থরের মন খুব খারাপ হয়। মালিকের ওই দশা দেখে কি করবে ঠিক করতে পারে না। দেবু তাকে বলে তার খুব ইচ্ছে জিপটাকে চালাবে। শেষবার। মন্থর রাজি হয়ে চাবি দেয়। জিপে উঠে দেবু স্পিড বাড়িয়ে দেয়। চিৎকার করে বলে সে কলকাতায় যাচ্ছে। জিপে কতটা তেল আছে তাও সে জানে না। আর দীর্ঘদিন না চালানোর অভ্যেস আর শরীরের যে হাল, সব মিলিয়ে দেবু আর ব্যালেন্স রাখতে পারে না। প্রচণ্ড স্পীডে জিপ একটা গাছের গায়ে আছড়ে পড়ে। স্পট ডেড।' বিশু একটানা বলে নিঃশ্বাস নিল, 'ভালই হয়েছে। ওর জন্য তো কেউ কাঁদার ছিল না।'

'তোর ধারণা ও কলকাতায় যেতে চেয়েছিল?'

'ধারণা কেন হবে; ও তো চেঁচিয়ে সেই কথা বলে গিয়েছিল। ওর বউ তো কলকাতায় থাকে।'

'কুড়ি বছর তার খবর না রেখে হঠাৎ ব্যস্ত হয়েছিল কেন?'

'জানি না। ওদের শুনেছিলেম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'দেবু তাই বলেছিল?'

'না। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত না। এদিকে অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু বলে ওর বড়দা তিনদিনে শ্রাদ্ধ চুকিয়ে দিল। কিন্তু পুলিশ নাকি এনক্যুয়ারি করছে।'

'কিসের এনক্যুয়ারি?'

'তা জানি না।'

'ওর বউ কবে এখান থেকে গিয়েছে জানিস?'

'জানব না কেন?' চোখ বন্ধ করল বিশু। বুঝলাম মনে করার চেষ্টা করছে। শেষপর্যন্ত বলল, 'তুই লাস্ট এসেছিলি কবে?'

বললাম। সে মাথা নাড়ল, 'তার কিছুদিন পরে। ওর কাজ করার কথা ছিল যে সাইটে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কন্ট্রাক্টটা অন্য লোক

পেয়েছিল। হাতে যা ছিল সব উড়িয়ে দিচ্ছিল সেই সময়। একই বাড়িতে ওর বউ আলাদা থাকত। তা হঠাৎ একটা আদিবাসী মেয়েকে নিয়ে তুলল বাড়িতে। ওর দাদা বের করে দিল মেয়েটাকে। মেয়েটা চিৎকার করছিল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। দেবু ওর ইজ্জত নষ্ট করেছে, এখন তাকে বিয়ে করবে বলে এনে তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। গঞ্জের লোকজন জমে গেল। তারা মজা পেয়ে মেয়েটাকে সাপোর্ট করতে লাগল। মহা কেলেঙ্কারি। গুজব রটে গেল মেয়েটার পেটে দেবুর বাচ্চা আছে। পাবলিক খেপে গেল তা শুনে। সেইসময় দেবুর বউ বেরিয়ে এল। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল গুজবটা সত্যি কিনা। মেয়েটি জবাব দেয়নি। তখন দেবুর বউ চিৎকার করে বলল, ও তোমার ইজ্জত নষ্ট করেছে, সত্যি করে বল?'

'মেয়েটা বলল, হ্যাঁ, করেছে।'

'দেবুর বউ রেগে গিয়েছিল, যে মানুষটার কোনও ক্ষমতা নেই সে কিভাবে তোমার ইজ্জত নষ্ট করবে! কেন মিথ্যে কথা বলছ?'

'তখন মেয়েটা স্বীকার করল দেবু তার শরীরে হাত দিয়েছে আর কিছু করেনি। জনতা হতাশ হয়ে সরে গেল। মেয়েটাও। কিন্তু দেবুর বউ তখনই ব্যাগ নিয়ে বাসে উঠল কলকাতায় ফিরে যাবে বলে। সেই যে গেল আর ফেরেনি।'

'কেউ বাধা দেয়নি?'

'দেবুর বড়দা চেষ্টা করেছিলেন আটকাতে কিন্তু পারেননি।'

এত বছর বাদে আমি এখানে এসেছি তা জানাজানি হয়ে গেল। পরিচিত অপরিচিত মানুষেরা দেখা করতে আসতে লাগলেন। স্থানীয় লাইব্রেরির পক্ষে বই-এর জন্যে আবেদন করা হল। স্কুলের প্রধানশিক্ষক মশাই তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হবার প্রস্তাব দিলেন। আর দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর আমি যখন ইন্সপেকশন বাংলোয় গিয়ে উঠলাম তখন স্থানীয় থানার দারোগা এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক। বললেন, 'এখানকার মানুষ তো আপনাকে নিয়ে গর্ব করে। আমার স্ত্রী আপনার লেখার বড় ভক্ত।'

বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনার আসার কারণ বোধহয় অন্য।'

লোকটা একটু হকচকিয়ে গেল, 'না, না, আপনাকে দেখার সাধ ছিল, তাই।'

'সত্যি তাই? আপনি দেবব্রত সম্পর্কে কিছু জানতে চান না?'

'কি জিজ্ঞাসা করার আছে বলুন। লোকটা মদ খেয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। টাকার জন্যে জিপ নিয়ে পালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে, মারা যায়। এভাবে বললে কোনও প্রব্লেম নেই।'

'অন্য কিভাবে বলা যায়?'

'কেউ কেউ বলছে এটা আত্মহত্যা। হাজার হোক ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, কয়েক লিটার তেল নিয়ে কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয় তা ও জানতো। চট করে মরার জন্যে ও জিপটাকে ব্যবহার করেছিল। এই কথাটাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না ওর ডায়েরি পড়লে।'

'সেখানে কি পেয়েছেন?'

'লোকটার মধ্যে হতাশা ছিল। আপনাকে খুব ঈর্ষা করত।'

'কবেকার লেখা?'

'লেখা অনেক বছর আগে। মাঝখানে পনেরো বছর কিছু লেখেনি। মারা যাওয়ার একমাস আগে লিখেছে, আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। পুরো ব্যাপারটার একটা ফয়সালা বেঁচে থাকতে থাকতে করে যেতে চাই।'

'কিসের ফয়সালা?'

'তা লেখেনি। আপনি জানেন?'

'না।'

'ওঁর স্ত্রীও জানেন না।'

'তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ও বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনারা তো একসঙ্গে এসেছেন।'

'এখন কি করতে চান?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, লোকটা যখন মদ খেয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকত, নিয়মিত খাবার জুটতো না তার জন্যে তখন দরদ দেখাননি কেন?'

'ওই তো ট্র্যাজেডি। আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ। সেই লোক যদি ক্রাইম করে তাহলে জেলে পুরে দুবেলা পেটভরে খেতে দিই।'

'আপনি আমাকে কি করতে বলেন?'

'ছি ছি ছি। আপনার মত নামী লোককে আমি কিছু করতে বলতে পারি? বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি এসেছেন এটা কত বড় কথা। আচ্ছা, আপনি কিভাবে খবরটা পেলেন? কে জানালো?'

'কাগজে অ্যাকসিডেন্টের খবর বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু সেখানে তো কোনও নাম ছিল না।'

'ইঞ্জিনিয়ার এবং নেশার কথা থাকায় সন্দেহ হয়েছিল।'

'তার মানে আপনি জানতেন দেবুবাবু আত্মহত্যা করতে পারে!'

'আপনি আমাকে দিয়ে কি বলাচ্ছেন?'

'কিছু না স্যার। এ কেস নিয়ে এগোবার কোনও কারণ নেই। আপনি কবে যাচ্ছেন?' দারোগা উঠে দাঁড়ালেন।

'হয়তো কালই।'

'তাহলে এটা রেখে দিন। ফাইল যখন বন্ধ করে দিয়েছি তখন এটাকে আমার কাছে রাখার কোনও মানে হয় না। বরং আপনার কাছে থাক, লেখক মানুষ, কিছু মালমশলা পেয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা নমস্কার।' ব্যাগ থেকে সেই খাতাটা বের করে আমার সামনে রেখে চলে গেলেন তিনি।

স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। একসময় বাইরে বেরিয়ে চৌকিদারকে ডেকে বলে দিলাম কেউ এলে জানিয়ে দিতে আমার শরীর খারাপ, দেখা করব না। শরীর ক্লান্ত ছিল কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল না। দেবু কলকাতায় যেতে চেয়েছিল কেন? এখান থেকে কলকাতার অর্ধেকটা পথ মালদহ, ও কি জানত না শিউলি মালদহে থাকে! তারপরেই মনে হল ও কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল? কেন? পুরো ব্যাপারটার কোনও ফয়সালা সে বেঁচে থাকতে থাকতে করে যেতে চেয়েছিল। এর উত্তর আর কখনও পাওয়া যাবে না।

শিউলির খবর অনেকক্ষণ পাইনি। এত বছর বাদে তাকে সবাই কিভাবে নিয়েছে? স্বামী জীবিত থাকতে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গিয়েছিল তাকে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই বরণ করে নেবে না। সেক্ষেত্রে ও এতক্ষণ সেখানে কিভাবে আছে? শিউলির খবর নেবার জন্য যখন ব্যস্ত হয়ে উঠলাম তখনই দারোগার কথা মনে এল। উনি শিউলির সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তেমন অসুবিধে হলে শিউলি ওখানে থাকার মেয়ে নয়।

এর মধ্যে কয়েকজন ভিজিটর এসেছিল। চৌকিদার তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিল। আমি খাতাটা টেনে নিলাম। বাঁধানো খাতা, ডায়েরি বলা চলে না। একই খাতায় দেবু বছরের পর বছর যা মনে এসেছে লিখে গেছে। এই খাতা আমি আগে দেখেছি যখন ওর ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। একটা মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু তার জ্বালা রেখে গেছে লাইনে লাইনে ছড়িয়ে। পাতা ওল্টাতে

াগলাম। 'শিউলির একটা ভাল বর দরকার ছিল। পরিষ্কার, ভদ্র, শিক্ষিত বর। াকে ও দুদু খাওয়াবে, গলার চেন দিয়ে সত্যজিতের ছবি দেখতে নিয়ে াবে। যেমন-।' তারপরেই নজরে পড়ল, 'ওর সন্তান দরকার। আমার এলেম নেই।'

ঠোঁট কামড়ালাম, ওর যে এলেম নেই তা শিউলি জানত বলে একটা বিরাট দনামের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পেরেছিল। কিন্তু বাঁচিয়ে কি লাভ হয়েছিল শিউলির? অথবা বেঁচে যাওয়ার পর দেবুর? কিস্যু না। দেবু যে আমাকে শিউলির সন্তানদাতা হিসেবে নিয়োগ করতে চেয়েছিল, ডায়েরির লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে তাতেও সে স্থির ছিল না। আমার মধ্যে তথাকথিত ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছিল সে।

দেবু যদি আমাকে অনুরোধ করত তাহলে কি আমি রাজি হতে পারতাম। যদি সে বলত তুই শিউলির সন্তান দে তাহলে আমাদের সংসার, সম্পর্ক বেঁচে াবে তাহলে আমি কি করতাম? দেবু ঠিকই লিখেছে, আমার সৌজন্য বা ভদ্রতাবোধ আড়াল হয়ে দাঁড়াত। ওর প্রস্তাব শুনে আমি কখনই শিউলির ামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম না। কিন্তু, কিন্তু দেবুকে না জানিয়ে যদি শিউলি আমার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলতো, যদি আমাকে তার ভালবাসার কথা জানাতো তাহলে পৃথিবীর তাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকার মত আমরা সব কিছু করতে পারতাম। দেবু যেটাকে গোপনে গোপনে চেটে খাওয়া বলেছে ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়াতো।

'শিউলি চলে গেল। রম্ভা যে এমনভাবে আমাকে ফাঁসাতে চাইবে আমি ভাবিনি। শিউলি আমার ক্যাম্পে যাওয়ার পর থেকেই রম্ভার ব্যবহার বদলে গিয়েছিল। উল্লুকটা একই সঙ্গে শিউলি এবং রম্ভাকে পটিয়েছে। কিন্তু রম্ভাকে লেলিয়ে দিল কে? সেই মাল এখন কলকাতায়! ওর কোনও এজেন্ট এখানে আছে নাকি! তপন? বিশু? কিন্তু শিউলি ডাঁট দেখিয়ে চলে গেল। আমাকে য়া না করলেও পারত। আসলে ওর চলে যাওয়ার জন্যে একটা ছুতো দরকার ছিল। সেটা পেয়েই কলকাতায় গেল পীরিতের নাগরের সঙ্গে দেখা করতে। এখন ওরা রস খাবে আর আমি আটি হয়ে পড়ে থাকব এখানে। চুলোয় যাক। ভোগই যখন করতে পারব না তখন একটা ডাগর মেয়েছেলেকে নাকের ডগায় বসিয়ে রেখে লাভ কি। শূন্য গোয়াল ঢের ভাল।'

আশ্চর্য। রম্ভা এসেছিল ওকে ব্ল্যাকমেইল করতে তা এই লেখা পড়ে আমি

জানলাম। বিশু আমাকে মেয়েটার নাম বলেনি। অথচ দেবু, তুই আমাকে ও ব্যাপারেও সন্দেহ করলি? শিউলি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, এতবছর ধরে আমরা কেউ কারও খবর রাখতাম না এই তো আর তোকে বোঝাতে পারব না আমি। আমার ঠিকানা তুই ইচ্ছে করলেই পেতে পারতিস। কেন একটা পোস্টকার্ড লিখলি না!

পাতা ওল্টাতে লাগলাম। সাদা পাতা। বছরের পর বছর কিছুই লেখেনি সে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মাসখানেক আগে লিখতে চেষ্টা করেছে। হাতের লেখা একদম বদলে গিয়েছে। কাঁপা কাঁপা এবং জড়ানো। পড়তে অসুবিধা হয়।

'কাল রাত্রে আমি মরে যাচ্ছিলাম বিশুদের দোকানের বারান্দায়। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওকে দেখতে পেলাম। আমাকে বলল, 'তুই ভুল বুঝছিস দেবু, একদম ভুল। ওকে ভগবানের মত দেখাচ্ছিল আবার ভুতের মতন। শালা বেঁচে আছে কিনা কে জানে। মরে গেলে আত্মা শুনেছি ওইভাবে কথা বলে যায়। আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। যেমন করেই হোক। পুরো ব্যাপারাটার একটা ফয়সালা বেঁচে থাকতে থাকতে করে যেতে চাই। এখন আর কিছু নেই বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান। ফুট করে মরে যেতে পারি যে কোনও সময়। বিয়ের পর যেদিন বুঝলাম আমি পুরুষ হিসেবে অক্ষম সেদিন শিউলিকে বলেছিলাম ডিভোর্স নিতে কিন্তু সে রাজি হয়নি। আমাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে চেয়েছিল। আরে সেসব তো আমি অনেক আগে করে ফল জেনে ফেলেছি। জেনেছি বলেই চেয়েছি শিউলি ওর সঙ্গে সম্পর্ক করুক। একটা বাচ্চা হোক। ও সুখী হবে। মানুষ যা চায় তার কিছুই হয় না। কিন্তু আমি কলকাতায় যাব। ওকে বলব শিউলি খুব ভাল মেয়ে। আর বলব, আমি তোকে বন্ধু বলে মনে করি। এখনও।'

চমকে উঠলাম। আমি গল্প লিখি। বানিয়ে। চরিত্রগুলোকে বাঁক নেওয়াই ইচ্ছেমতন। কিন্তু নিজের জীবনের গল্পে এমন চমক কখনই আশা করিনি দারোগা এই লেখা পড়েছেন কিন্তু মাঝখান থেকে লাইন তুলে আমাকে বলে গেলেন। দেবু আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার সবটাই অভিনয় ছিল? তাহলে কলকাতায় যাওয়ার জন্যে জিপ নিয়ে রওনা হয়ে সে কেন গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল?

উত্তরটা জানার জন্যে ছটফট করছিলাম। যে বলতে পারত সে নেই। হঠাৎ মনে পড়ল দেবু যেখানে যেখানে যেত সেখানে গেলে কেমন হয়। এখন তে

র সঙ্গে।

এই জায়গায় আমি জন্মেছি, শৈশব কেটেছে। বালক বয়স, কৈশোর এবং যৌবনের শুরুতে বারংবার এসেছি এখানে। এখানে কোন গাছে কদম ফোটে, কোথাও শিউলি ঝরে, অবলীলায় তা একদা মুখস্থ ছিল। কমলদার কথা মনে ল। আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড় মানুষটা। ওঁর বাবা চা বাগানে জ করতেন। ওদের বাড়িতে পুরোন দিনের গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। পান্নালাল ঘায, আব্বাসউদ্দিন। ওসবের চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল পিসিমার হাতের নারকেল াড়ু। এই পিসিমা যে কমলদার সৎমা তা জেনেও পার্থক্য টের পাইনি। আমি ার দেবু পিসিমার খুব প্রিয় ছিলাম। পরে মনে হয়েছে পিসিমাকে ফিল্মের মিত্রাদেবীর মত দেখতে। তুলনায় পিসেমশাস নৃপতি চ্যাটার্জির মতন। দেবুর বর কি কমলদা-পিসিমা রাখেন?

চুপচাপ বেরিয়ে গেলাম। এখন এখানকার রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ সে গিয়েছে। কোথায় কদম ফোটে বা শিউলি ঝরে তা গুলিয়ে যাচ্ছিল। ইসব পথে যখন হাফ প্যান্ট পরে বেড়িয়েছি তখন আমি সম্রাট ছিলাম। নপোলিয়ান যখন সিসিলি দ্বীপে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন তাঁর অবস্থা খন টের পাচ্ছি।

কমলদা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?'

টাক মাথা প্রৌঢ়টিকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। তবু নিজের পরিচয় দিলাম। ঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হলেন কমলদা, 'আরে, তুমি! কি সৌভাগ্য আমার! এসো সো।'

'এভাবে বলছ কেন? এ বাড়িতে আমরা দিনরাত আসতাম। তুমি তুই লতে।'

'হে হে। এখন তুমি বিখ্যাত লোক। দিল্লি থেকে পরস্কার পেয়েছ, এখন কি আর আগের মতন, এসো এসো।' কমলদাকে কেঁচোর মত দেখাচ্ছিল।

'পিসিমা কোথায়?'

'মা? মা তো এখন শ্যামলের সঙ্গে থাকে। ওই যে ওই কোয়ার্টার্স।' বুঝলাম কমলদার ভাই শ্যামলও ওই চা বাগানে চাকরি করে। কথা না বাড়িয়ে শ্যামলের কোয়ার্টার্সে এলাম। পিসিমার দেখা পেলাম। কোনও রক্তের সম্পর্ক ছিল না,

বাবাকে দাদা বলতেন তাই তিনি আমার পিসিমা। বাল্যকালে চা বাগানে সবাই এরকম সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলাম। আজ এত বছর পর আমি যে বৃদ্ধার সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর সঙ্গে সুমিত্রাদেবীর কোনও মিল নেই। পরিচয় পেতেই যেভাবে কেঁদে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তাতে চোখের জল সামলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। পঞ্চাশ পেরিয়ে আসা শরীরটা হঠাৎ আমার বশে আর রইল না। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোরা কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর সব ভুলে গেলি? সব?'

কি জবাব দেব? আমি কিছুই ভুলিনি। সময় শুধু ভুলের পলিমাটি ফেলে গেছে আর সেটা হয়েছে আমার সময়হীনতার কারণে। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্থির হলেন। মানুষের বেঁচে থাকা সুন্দর হয় শুধু প্রেম ভালবাসা শ্রদ্ধা পেলে নয়, তার স্নেহ দরকার হয়। পঞ্চাশে পা রেখে দেখেছি স্নেহ করতে পারেন এমন বয়স্করা যেন পালা করে চলে যাচ্ছেন। সেইসব বৃদ্ধদের কথা ভাবলে কষ্ট হয় যে যারা স্নেহ থেকে বঞ্চিত।

পিসিমা আমাকে হাত ধরে বসালেন, 'তোর সব বই আমি পড়েছি। সব লাইব্রেরি থেকে আনাই, গর্বে বুক ভরে যায়। হ্যাঁরে, আমার কথা কোথাও লিখিসনি কেন?'

কোনও জবাব ছিল না। সেই নারকোল নাড়ু আর তিলের নাড়ুর দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। দেবু সব সময় আমার থেকে একটা বেশি খেত। হঠাৎ পিসিমা বললেন, 'শুনেছিস?'

মুখ তুললাম।

'দেবুটা নিজেকে মেরে ফেলল।'

'জানি।'

'লোকে ওর বউ-এর কথা বলে কিন্তু তার কোনও দোষ নেই।'

'আপনার সঙ্গে দেবুর শেষ দেখা কবে হয়েছে?'

'এই তো, দিন কুড়ি আগে। এসে বলল, পিসিমা আমি আর মদ খাচ্ছি না। শুনে বুক জুড়িয়ে গেল। কিন্তু চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলাম যতই ছাড়ুক আর কিছু করার নেই। এ বাড়ির লোক ওকে পছন্দ করত না, ও আসুক চাইত না। কিন্তু ও এলে আমি তো না বলতে পারতাম না। তাছাড়া ও আমার কাছে

শুধু নারকোলের নাড়ু ছাড়া কিছু চাইতো না। শুনেছি এর ওর কাছে টাকা ধার করে মদ খেতো কিন্তু আমার কাছে একটা পয়সাও চায়নি। মুখ দেখে মনে হয়েছে দুদিন পেটে ভাত পড়েনি। আমি খেতে বলেছি কিন্তু সে রাজি হয়নি। বলতো, নারকোলের নাড়ু থাকলে দাও। এরা রেগে যেত তবু আমি ওর জন্যে নারকোলের নাড়ু বানিয়ে রাখতাম। এরকম কেন হল রে! ও তো মরে যাওয়ার আগেও আমার কাছে সেই ছোটবেলার মতনই রয়ে গেল।'

'আমার সম্পর্কে কিছু বলতো?'

'আমি কথা তুললেও চুপ করে থাকত। একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ওর বই তুমি পড়? বললাম, হ্যাঁ। বলল, আমি পড়ি না, চশমা নেই তো। আমার সম্পর্কে কিছু লিখেছে? তেমন কিছু আমি পড়িনি বলতে বলল, বেঁচে গেল। উল্টোপাল্টা লিখলে আমি কেস করতাম। যার দুবেলা ভাত জোটে না সে কোত্থেকে কেস করবে তা জিজ্ঞাসা করিনি। বললাম, সেরকম ও লিখতে যাবে কেন? ও মাথা , লিখতেও পারে। আমার ওপরে রাগ আছে তো! শেষবার যখন এসেছিল তখন বলল, কলকাতায় যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, বউ-এর কাছে? সে হাসল, দূর! বারো বছর সম্পর্ক না থাকলে আর বউ থাকে নাকি? দ্যাখো পিসিমা, লোকে বলে বউকে ডিভোর্স করতে পারে, ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারে, কিন্তু মা মাসিকে ওসব কিছুই করতে পারে না, ভাইকেও নয়। আমরা যতটা বন্ধু ছিলাম ততটা ভাই ভাই-ও। জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি ওর কাছে ? সে জবাব দিয়েছিল, দেখি।

পিসিমার সঙ্গে আরও খানিকটা কথা বলে বিদায় নিলাম। আমার এই হঠাৎ আসাটা বৃদ্ধাকে নাড়িয়ে দিয়েছে বুঝতে পারলাম। পিসেমশাই-এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী উনি। তখনই ওঁর তুলনায় পিসেমশাইকে বেশ বৃদ্ধ বলে মনে হত। অথচ কি হাসিখুশি ছিলেন মহিলা! শেষবার বললেন, 'তোর সঙ্গে কি আর আমার দেখা হবে? কার টানে এখানে আসবি? আমার মরার খবর ঠিক সময় পাবি না।' আমি আর পেছন ফিরে তাকাইনি।

চা বাগানের রাস্তায় আগে বিকেল শেষ হলেই রাত নামত। এখন আটটার কাছাকাছি সময় কিন্তু বিদ্যুৎ চেহারা পাল্টে দিয়েছে। চৌমাথায় চলে এলাম। লোকজন কম। মনে পড়ল ভগীরথের মদের দোকানে দেবু পড়ে থাকত

এককালে। বাল্য বা কৈশোর ওই একটা এলাকা আমরা সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতাম। নিষিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে দেখার প্রবণতা যৌবনেও ছিল। কিন্তু এখন মনে হল ভগীরথের দোকানে গেলে আমি দেবুর খবর কিছু পেতে পারি।

সরু গলি দিয়ে ভগীরথের দিশি মদের দোকানে পৌঁছে দেখলাম মাটিতে চাটাই পেতে বসে জনা পনেরো মানুষ নেশা করছে। কেমন আলোআঁধারি হয়ে আছে জায়গাটা। একপাশে কুপি জ্বালিয়ে ছোলা সেদ্ধ বিক্রি হচ্ছে। জড়ানো গলায় কথাবার্তা চলছে। প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ওপাশে একটা বেঞ্চি মাটিতে পোঁতা রয়েছে। দু'জন লোক, দেখলেই বোঝা যায় চালচুলো নেই, নবাবী ভঙ্গিতে মদ খাচ্ছে। চুপচাপ তাদের পাশে গিয়ে বসলাম।

দুজনেই আমার দিকে তাকাল। তারপর একজন চেঁচাল, 'এ মাংরা, এইখানে আয়।' চেঁচানো মাত্র একটা শুঁটকো লোক ছুটে এল। লোকটাকে বলল, 'বোতল দে একে।'

শুঁটকো বলল, 'সাড়ে দশ টাকা।' হাতটা এগিয়ে এল।

দ্বিধাটা কাটালাম দ্রুত। রোমে বাস করতে হলে রোমান হতেই হবে নইলে এরা কেউ আমাকে স্বজাতীয় বলে মনে করবে না। টাকাটা দিলাম। বিশ্রী টোকো গন্ধ বাতাস ভাসছে। গা গুলিয়ে ওঠে। এই পরিবেশে দেবু দিনের পর দিন কাটাতো? নিশ্চয়ই খারাপ লাগত না ওর। ও যেটা এত বছর পেরেছে আমি একটা দিনই বা কেন পারব না?

'দাদার চেহারাটা নতুন মনে হচ্ছে?' পাশের লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। এখানে এই প্রথম এলাম।'

'কোনও ঠেকে যাওয়া হয়?'

উত্তরটা দিতে গিয়ে সামান্য হাতড়াতে হয়, 'মালবাজার।'

'অ। ওইদিকে। আমাদের এই ঠেকের একটা সুনাম আছে, বুঝলেন। দু নম্বরী মাল পাবেন না। জিনিস সবসময় খাঁটি। কি হে, বল না!'

দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'ঠিক!'

তার মাথা ক্রমাগত দুলতে লাগল।

'আপনারা এখানে বহুদিন আসছেন?'

'কুড়ি বছর বয়স থেকে। কত মাতাল এলো গেলো আমরা ঠিক আছি

্র গোপন রহস্য কি? হাঘরের মত খাই না, যেটুকুতে মেজাজ সেটুকুই। দম শেষ করে দৌড়ালে আছাড় খেয়ে পড়তেই হবে, আমরা হলাম গিয়ে ওই যে ক বলে ওই যে, মাইলের পর মাইল যারা দৌড়ায়, সেইরকম। নিন। শুরু করুন।' লোকটা ইশারা করল। গুটকো লোকটা তখন বোতল দিয়ে গেছে। খানে গ্লাসের বালাই নেই। এসের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে আমার কয়েক টাক খাওয়া উচিত। কিন্তু এ কি গলা দিয়ে নামবে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে গলায় ঢাললাম।

এরকম বিদঘুটে কিচ্ছিরি অনুভূতি আমার কখনও হয়নি। দুর্গন্ধ এবং উত্তাপ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল

'কিরকম লাগছে?'

'ভাল

'ভাল বলতেই হবে। একবার এক সাহেব এসেছিল এখানে। বোতল খেয়ে বলল কোথায় লাগে আমাদের দেশের মদ, এ তো অমৃত। একটা কথা বলি শুনুন, এই মদ খেলে পুরুষের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে।'

'সেটা কিরকম?' অবাক হলাম।

'লোকে বলে মদ খেলে মেয়েমানুষ দরকার হয়। কোন মদ? না, বিলিতি মদ। কিন্তু আমাদের এই মদ খেয়ে কেউ মেয়েছেলের ধান্দা করে না। দেখুন না, এখানে এত বছর ভগীরথের দোকান চলছে কিন্তু কাছাকাছি তো দূরের কথা বিশ মাইলের মধ্যে কোনও বেশ্যাপাড়া নেই। কোনও মাতাল রাস্তায় নেমে মেয়েদের অসম্মান করে না। শেষ করুন।'

করলাম। এবার অনেকটা সয়ে গেল। শেষ হওয়ামাত্র গুটকো ছুটে এল, দশ টাকা আট আনা।'

বললাম, 'না, থাক।'

লোকটা বলল, 'এই রে, তার মানে দাদার মাল খারাপ লেগেছে! ছি ছি ছি।'

বললাম, 'না না। আচ্ছা, নিয়ে এসো।'

টাকা নিয়ে গুটকো চলে গেল। কান গরম, শরীরে হাওয়া বইছে। কায়দা করে জিজ্ঞেস করলাম 'এখানকার একজন মালবাজারে মাল খেতে যে

দেবুবাবু।'

'মরে গেছে।' লোকটি হাত নাড়ল, 'অনেক আগেই মরত, কি করে বেঁ ছিল সেইটে রহস্য। ও মাল খেতো না, মাল ওকে খেতো। কতবার বলেছি দেবু সব কিছুর একটা নিয়ম আছে, নিয়মটা ভাঙিস না। কে শোনে কার কথা

'লোকটা কিরকম ছিল?'

'এই মরেছে! শাজাহান কিরকম ছিল মশাই?'

'কে শাজাহান?' দ্বিতীয় বোতলটা পেয়ে গেলাম।

'তাজমহলের শাজাহান। বউ মরার পর মিনার বানালো। প্রেমিক হ গেল। সেটা করতে গিয়ে কত মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে তার হিসে জানেন? লোকে বলত বউ পালিয়ে গিয়েছে বলে দেবু মদ খায়। কিন্তু এ বেঞ্চিতে, যেখানে আপনি বসেছেন, সেখানে বসে দেবু আমাকে বলেছে, সব বাজে কথা। বউকে ও নিজেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। পারেনি। শে পর্যন্ত একটা কামিনকে টাকা দিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে কথা শিখিয়ে নিজে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল সে। সেই কামিন কথামত ওর নামে দুর্নাম দি রেগেমেগে বউ বাপের বাড়ি চলে গেল। দেবুও বেঁচে গেল।'

হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল লোকটা।

আমি তাজ্জব। রম্ভাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিল দেবু?

'কিন্তু ও বউকে সরাতে চেয়েছিল কেন?'

'ওর বউ আর একজনকে ভালবাসত।'

'কাকে?'

'তা জানি না মশাই। এ সব অনেক আদ্যিকালের ঘটনা। একসময় আ দেবুকে অনেক মাল খাইয়েছি। তখন খাওয়াতাম ভয়ে, কি মেজাজ ছিল তার কথায় কথায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত। পরের দিকে যখন প্রায় ভিখিরি হয়ে গে এখানেও ঢুকতে দেওয়া হত না তখন মাঝে মাঝে দয়া দেখাতাম। আপ কখনও কাউকে দয়া করে মাল খাইয়েছেন?'

'না।' আমার শরীর ভারী বলে মনে হচ্ছিল।

লোকটা মাংরাকে ডাকল, 'দুটো বোতল দে।'

সঙ্গের লোকটা চুপচাপ বসেছিল, সে সোজা হল। প্রথম লোকটি তা

ধমকালো, 'তোমার কোটা হয়ে গিয়েছে। আর একটা বলেছি দাদার জন্যে।'

'আমার জন্যে কেন, না না, আমি খাব না।'

'এখানে কোনও বাড়িতে বউ রেখে এসেছেন?'

'না তো!'

'তা হলে কি চিন্তা, খান। নেশা হবে অথচ পা টলবে না, খিদেও থাকবে তবেই আসল মৌজ পাবেন। অনেক মাতাল আছে যারা মদ খাওয়ার পর খাবার খেতে পারে না। দু চক্ষে তাদের দেখতে পারি না।'

নতুন বোতল শুরু করলেন তিনি।

'তবে হ্যাঁ, লোকটা মারা যাওয়ার আগে অন্তত মাসখানেক কি পাঁচ সপ্তাহ মদ খায়নি।'

'টাকা ছিল না, তাই।'

'না-না। একদিন দেখলাম পেট্রোল পাম্পের সামনে বসে আছে। আমায় দেখে বলল, দাদা, দশটা টাকা চাঁদা দেবে, কলকাতায় যাব! এ সব কায়দা তো আমার জানা, বললাম, ভাগ্। সে পিছন পিছন এলো, বিশ্বাস কর, কলকাতায় যেতেই হবে আমাকে। ওখানে গিয়ে ক্ষমা না চেয়ে আসা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই। বললাম, টাকা নিয়ে তো মদ খাবি, চল আমার সঙ্গে, আমি খাওয়াচ্ছি, আমি বললে ভগীরথ তোকে ঢুকতে দেবে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে পড়ল, আমি তো আর মদ খাব না। বললাম, তাই নাকি? ভূতের মুখে রাম নাম। মদ খেলে টাকাও দেব। যাবি? কিন্তু সে দাঁড়ালো না। ফিরে গেল। আমি তো অবাক।' লোকটা গলায় মদ ঢাললো, 'আঃ। হ্যাঁ মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরেও কয়েকদিন ওকে বলেছি, ও রাজি হয়নি। শুধু বলত, আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।'

'কেন যাবে জিজ্ঞাসা করেছেন?'

'হ্যাঁ। জবাব দেয়নি।'

'শেষ দিকে ও কোথায় থাকত? বাড়িতে তো জায়গা ছিল না।'

'যেখানে সেখানে। হাফ প্যান্ট ময়লা চিকুটে। সাত দিনে এক দিন স্নান। তবে মাঝে মাঝে আদিবাসী মেয়েটা নিয়ে যেত। মেয়েটা এখন বুড়ি হয়ে গিয়েছে। বিয়ে-থা করেছে, বাচ্চারাও বড় হয়ে গেছে। কিন্তু ওর ওপর মায়া ছিল।'

'তার মানে ওদের মধ্যে প্রেম ছিল।'

'দূর। তা কেন? মেয়েছেলের মায়া মানে প্রেম? পেটে যাদের মাল পড়ে না তারা এসব বলে। মদ খেলে মন দরাজ হয়। খান, ভাল করে খান।'

এখন আর এই মদে কোনও উৎকট গন্ধ পাচ্ছি না। শরীরেও কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

এক-একটা ঢোক গলা দিয়ে নামছে আর মনে হচ্ছে শরীরের হাড়ে হাড়ে বাতাস খেলে যাচ্ছে। কি আরাম। মাথার ওপরে আকাশটা দারুণ নীল। গিজ গিজ করছে তারা। এই সব তারা কলকাতায় থাকে না। ভাবতেই হাসি পেল কলকাতায় শেষ কোন রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়েছি নিজেরই মনে নেই ওই হল কালপুরুষ! ছেলেবেলায় দেখেছি। এত বছর পরে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সন্ধেতারাটা কোথায় গেল? এই তো একটু আগে সন্ধে হল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল সব তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে আমার চোখের ভেতর ঢুকে পড়েছে। চোখ বন্ধ করলাম। মানুষ মরে গেলে কি তারা হয়ে যায়? ছেলেবেলায় কে যেন বলছিল। তা হলে দেবু কোন তারা? দেবু হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম দেবুর মুখ মনে করতে পারছি না। কিরকম ছিল দেবু? মুখটা কিরকম ছিল? পাশের লোকদুটো তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়ে, দেবু দেখতে কিরকম ছিল? ডেসক্রিপশন দিন তো।'

প্রথম লোকটি দ্বিতীয়জনকে টানল, 'এঃ, মাতাল হয়ে গিয়েছে।'

ওদের চলে যেতে দেখলাম। দেবুকে কেমন দেখতে ছিল? কেউ এসে বর্ণনা দিক।

'বাবু, দোকান বন্ধ। উঠতে হবে।' শুঁটকো আমার সামনে এসে দাঁড়াল

'তুম দেবুকো চিনতা হ্যায়?'

'কোন দেবু?'

'আরে, যে এখানে এসে মদ খেতো। মরে গেছে কদিন আগে।'

'ও, চিনতাম।'

'ওঃ। তা আমাকে দয়া করে বল তো, সে দেখতে কেমন ছিল'?

'দেবুদা ওর মতো দেখতে ছিল।'

'আঃ মুখ চোখ না --আমি ওর মুখ মনে করতে পারছি না।'

'আপনি বাড়ি যান।'

আমার মাথায় তখন যন্ত্রণা হচ্ছে। রেগে গেলাম, 'মুখ কিরকম ছিল?'

'ভাল।'

'কিরকম ভাল! না চোখ?'

'আপনার মতন'। শুঁটকো চট করে সরে গেল সামনে থেকে।

নিজের নাক, চোখে হাত দিলাম। দেবু আমার মতো দেখতে ছিল। যাচ্চলে। এ কথা আগে কখনও মনে হয়নি কেন আমার? আমার মতো দেখতে একটা মানুষ দুঃখ পেয়ে মদ খেয়ে মরে গেল? উঠে পড়লাম। দাঁড়াতেই পা টললো। আমার মতো দেখতে একটা লোক এখান থেকে মদ খেয়ে এই গলি দিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেত এত রাত্রে। তখন কি আকাশে তারারা জ্বলতো? না জ্বলে যাবে কোথায়? নিজেকে সামলাতে সামলাতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। শূন্য রাস্তায় কুকুর ডাকছে। রাস্তার আলোগুলো এখন টিমটিম করছে। আমি যেন কোথায় যাব? কোথায় উঠেছি? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করলাম। ঠিক তখনই জিপের হেডলাইট মোড় ঘুরে পড়ল আমার ওপর। জিপটা এগিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল, 'আরে! আপনি এখানে?'

দেবুর জিপ ছিল। সেই জিপ নাকি? চালাচ্ছে কে? মন্থর! এগিয়ে গেলাম। খুব সতর্ক ছিলাম যাতে পা না টলে যায়।

'বাংলোয় যাবেন তো, উঠে আসুন।'

এবার আমি চিনতে পারলাম। থানার দারোগা। এত রাত্রে লোকটা কোথায় যাচ্ছে? বললাম, 'ঠিক আছে।'

দারোগা আমাকে দেখল, 'আপনি বোধহয় ঠিক নেই।'

'কে বলল? ঠিক আছি। ফার্স্ট ক্লাস।' আমি হাত নাড়লাম।

দারোগা জিপ থেকে নেমে এলো, 'এখান থেকে বাংলো কিছুটা দূরে। আপনি উঠুন।'

রাগ হচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল লোকটা তো দেবুকে দেখেছে। দেবু কেমন দেখতে ছিল নিশ্চয়ই আমাকে বলে দিতে পারে। অতএব কথা না বাড়িয়ে আমি জিপে উঠলাম।

দারোগা পাশে বসে বললেন, 'তখন আমাকে বললেই পারতেন, এ সব জায়গায় আপনার মতো লোকের আসা উচিত হয়নি। খুনখারাপি তো লেগেই আছে।'

'দেবুকে আপনি দেখেছেন। তার মুখটা কিরকম ছিল?'

ফালতু কথা না বলে জিজ্ঞাসা করলাম।

'মাল খেয়ে খেয়ে শরীর তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওহো, আজ বিকেলে একটা ঘটনা ঘটেছে।'

আমি কথা বললাম না। মাল খেয়ে শরীর কিরকম নষ্ট হলে দেবু হয়ে যায়?

'যে আদিবাসী মহিলা দেবুবাবুকে মাঝে মাঝে আশ্রয় দিত সে আজ বিকেলে আত্মহত্যা করেছে। বিকেলে গিয়েছিলাম। আজ বডি চালান করা গেল না, কাল যাবে সদরে।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম, 'সেকি! আত্মহত্যা করেছে কেন?'

'কারণ জানা যাচ্ছে না। দুপুরে বেরিয়েছিল। বাড়ি ফিরে গলায় দড়ি দিয়েছে বুড়ি।'

'বুড়ি?'

'হ্যাঁ, এরা তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশেই বুড়ি হয়ে যায়।'

বাংলোর সামনে জিপ থামল। দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পৌঁছে দিতে হবে?'

'নো। না। আমি ঠিক আছি।' টলতে টলতে নামলাম। জিপ ফিরে গেল।

এখন বাংলোর বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কাঠের বারান্দায় যে আলো জ্বলছে তার তেজ বিন্দুমাত্র নেই। আলোর ছায়া নেতিয়ে আছে সেখানে। আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। যে আদিবাসী মেয়েটা আজ আত্মহত্যা করেছে, তার নাম যদি রম্ভা হয়, তা হলে সে আত্মহত্যা করতে গেল কেন? এত দিন পরে কি দুঃখ হল তার? আশ্চর্য! আমি দেবুর মুখ কল্পনা করতে পারছি না অথচ রম্ভাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই কত বছর আগে দেবুর কাজের জায়গায় গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে দেখেছিলাম, অথচ এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দারুণ খলবলে চেহারা ছিল তার, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চমক, যা রক্তের স্রোত বাড়িয়ে দেয়। এখন কিরকম ছিল সে। বুড়ি হয়ে গেলে শরীর শুকিয়ে যায়। রম্ভার আসল নাম কি? রম্ভার ছেলেমেয়ে স্বামী নিশ্চয়ই কাঁদছে। কিন্তু বেচারা কোন দুঃখে আত্মহত্যা করতে গেল!

টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। চিৎকার করে চৌকিদারকে ডাকলাম। দ্বিতীয়বার ডাকতেই লোকটা সাড়া দিল।

দৌড়ে ওপরে উঠে এসে দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিল। আমি ও কে ইশারা করলাম চলে যেতে। এখন বিছানায় শরীর না এলিয়ে দিলে আমি মরে যাব।

'খানা দেব স্যার?'

মাথা নেড়ে না বললাম। চোখ বন্ধ করতেই মনে হল আমি তলিয়ে যাচ্ছি। অন্ধকার ঢেউ এসে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে অতলে। আমার কোনও শক্তি নেই প্রতিরোধ করার।

'স্যার।'

খুব ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল। কোনওরকমে চোখ মেললাম।

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন।'

হাত নাড়লাম, ঠিক আছে।

'ঘর বন্ধ ছিল, আপনি ছিলেন না বলা সত্ত্বেও উনি যাননি। নিচের ভিজিটার্স রুমে বসে আছেন। কি বলব?' লোকটি খুব বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল।

যদি আমার নেশা হয়ে থাকে, যাকে মাতাল বলা হয় তাই যদি হয়ে গিয়ে থাকি তবু ওই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কের কোনও কোষ মেঘমুক্ত হল চট করে।

বসলাম, 'কে?'

'নাম তো বলেনি স্যার।'

'এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ স্যার। সঙ্গে ব্যাগ আছে।'

'ডেকে নিয়ে এসো।'

লোকটা চলে গেলে মনে হল আমার একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। কোনওমতে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। কল খুলে মুখ ঘাড়ে জল দিলাম, কুলকুচি করলাম। তোয়ালের গায়ে মুখে দিয়ে গিয়ে ঘষলাম। একটু ঠাণ্ডা হল শরীর তবুও কিন্তু চোখে ঝাপসা দেখছি সব কিছু।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। শিউলি দাঁড়িয়ে আছে। ওর ব্যাগ নিচে নামিয়ে রেখেছে। শিউলির মুখ নামানো।

'এ ভাবে আসতে হল বলে আমি খুবই দুঃখিত। সন্ধের পর এখান থেকে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, না হলে আমি আজই ফিরে যেতাম।'

শিউলি বলল।

অনেক চেষ্টা করে গোটা গোটা কথা বললাম, 'কি হয়েছে?'

'ও বাড়িতে থাকতে পারলাম না। কেউ খবর দিয়েছিল নইলে সেই আদিবাসী

মেয়েটি জানবে কি করে আমি এসেছি। বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করল। সন্ধের মুখে শুনলাম সে নাকি আত্মহত্যা করেছে। শোনামাত্র আপনার বন্ধুর বড়দা বললেন আমাকে চলে যেতে হবে। এবার নাকি ওই আত্মহত্যার তদন্ত করতে পুলিশ আসবে। উনি আর নতুন ঝামেলা চান না।'

'পুলিশ দুপুরে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল। সেটা কিছু নয়। কিন্তু বড়দা বললেন তাঁর ভাই-এর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক নেই, আমাকেও উনি থাকতে দিতে পারেন না। মনে হল আজকের রাতের জন্য আপনার সাহায্য চাইতে পারি।'

শিউলি মুখ তুলল।

আমি হেঁটে বিছানার কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু আমার পা ইচ্ছেমতন এগোচ্ছিল না। শিউলির চোখ বড় হয়ে গেল। কোনওমতে বিছানায় পৌঁছে বললাম, 'সাহায্য? অ্যাঁ? আমার কাছে? আমি কে? অ্যাদ্দিন বাদে আমি কি সাহায্য করতে পারি? চমৎকার!'

'আপনি--আপনি--!' কথা শেষ না করে দু হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল শিউলি।

'মদ খেয়েছি। বেশ করেছি। তোমার তাতে কি?' কথাগুলো বলতে বলতেই খেয়াল হল আমি ঠিক বলছি না। এ সব কথা আমার বলা উচিত নয়। কিন্তু আমার ভেতর থেকে কেউ অনায়াসে বলে যাচ্ছে। আমি মাথা নাড়লাম।

ততক্ষণে ব্যাগ তুলে নিয়েছে শিউলি। সেটা দেখতে পেয়ে হাত নাড়লাম, 'ঠিক আছে, বসো। প্লিজ, বসো।'

শিউলি দরজার কাছে চলে গিয়েছিল। আমার ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল, 'ওই মুখ আমি চিনি। কুড়ি বছর আগে অনেক ঘেন্না আমাকে শক্তি দিয়েছিল ওই মুখকে জীবন থেকে মুছে ফেলার। নতুন করে আবার সেই মুখকে মেনে নিতে পারব না।' দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। আমি চিৎকার করে তাকে ডাকলাম। টলতে টলতে বারান্দায় এলাম। অন্ধকারে শিউলিকে কোথাও দেখা গেল না।

চোখ বন্ধ করলাম। এই মুখ শিউলি চেনে। মেয়েটা না জেনে আমার উপকার করে গেল। সন্ধে থেকে আমি দেবুর মুখটাকে কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। টলতে টলতে আবার বাথরুমে ফিরে গেলাম। ঘষা আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ছে। এখন আমি দেবুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মনের ওপর আর কোনও চাপ নেই। চাপ থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না।

যুগল মিলন

টেলিফোনের বোতামদুটো বারংবার আটকে যাচ্ছিল. ঝাঁকুনি দিয়ে ডায়ালটোন পেতে হচ্ছিল। টিটো হিসহিসে গলায় বলল, 'শালা তিন নম্বরী মাল রেখে দিয়েছে এখানে।' বেশ জোরে ঝাকুনি দিতে ডায়ালটোন ফিরে এল। মিনিট দশেক ধরে সে ক্রমাগত ডায়াল করে যাচ্ছে। কোন শব্দ নেই। ওয়ান নাইন নাইনের দিদিমণিদের গ্রাহ্যি নেই রিসিভার তোলার। হাল ছেড়ে দিয়ে টিটো এবার জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। না, এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

বাড়িটা আটতলা। সে আছে পাচে। আশেপাশে সব চারতলা তিনতলা-- শুধু একটু দূরে আর একটা পাঁচতলা। তাব টপ ফ্লোর বা ছাদে উঠে এদিকে ভাল করে নজর করলে কেউ শ্রীমান টিটো মুখার্জিকে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু সেই চান্স নেই। তবু একেবারে সরাসরি জানলায় নিজের শরীরটাকে নিয়ে যাচ্ছে না সে।

টিটো আবার যন্ত্রটার দিকে তাকাল। পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ওটা। রিসিভার তুললে বেশ জ্যান্ত বলে মনে হচ্ছে কিন্তু টু প্লাস টু হচ্ছে না। আজ বুধবার। পরশু রাত এগারটায় সে এখানে এসেছে। এসেছে বললে একটু ভুল হবে, তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি বলেছেন, 'এর চেয়ে সেফ জায়গা তুমি কলকাতায় পাবে না। কেউ তোমার খবর পাবে না। পাশের কিচেনে খাবার রেখে যাচ্ছি ফ্রিজে থাকবে। খিদে পেলে গরম করে নিও গ্যাসে। অ্যাটাচড্ বাথ আছে। আমি বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যাচ্ছি।'

তখন মনের অবস্থা এত খারাপ ছিল ফালতু প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল না। সে দেখেছিল তিনরুমের একটি ফ্ল্যাট। কার্পেটপাতা। আসবাব বেশি নেই। লোকজন এখানে বাস করে বলে মনে হয় না। পার্কিং প্লেসে গাড়ি থামার পর সে লিফট পর্যন্ত হেঁটে এসেছিল মাথা নিচু করে। তখন লোকজন প্যাসেজে ছিল না। এমনকি লিফটটাও অটো সার্ভিস হয়ে গিয়েছে। তাই এই পাঁচতলার ফ্ল্যাটে ঢোকা পর্যন্ত সে কারো নজরে পড়েনি। ফ্রিজে যা ছিল তা দিয়ে আজ দুপুর পর্যন্ত চলেছে। এখন আধইঞ্চি দুধ ছাড়া সব ফর্সা। এর আগে জীবনে কখনওই

সে নিজের খাবার গরম করে খায়নি। জাঁতাকলে পড়লে মানুষকে কত না কি করতে হয়!

টেলিফোনটার কাছে এসে সে চোখ বন্ধ করল। ব্যাস, এইটুকুই। খুব ছেলেবেলায় কে যেন শিখিয়েছিল কোন কাজ করার আগে চোখ বন্ধ করলে কাজটা করা সহজ হয়। রিসিভার তুলল সে। তারপর একটার পর একটা নাম্বার ঘোরাতে লাগল। এবং হঠাৎই তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পুলকিত হয়ে উঠল, ওপাশে রিং হচ্ছে।

' হেলো' একজন মহিলার মোটা গলা।

'বাদলদার সঙ্গে কথা বলব।'

'কে বলছেন?'

এক মুহূর্তে ধন্ধে পড়ল টিটো। নিজের নামটা বলা ঠিক হবে কি? মহিলা কে সে জানে না, কোথা থেকে যে ফেঁসে যেতে হবে কেউ বলতে পারে না। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ওঁর ভাই।'

'ভাই? কোন্ ভাই? ভদ্রমহিলা যেন একটু বিস্মিত।

'মাসতুতো।'

'খোকা নাকি? আরে কবে এলে? আমার গলা তুমি চিনতে পারছ না? আমি ছবি। ভাল আছ তো সবাই?' মহিলা এবার ফুরফুরে হলেন।

'এই, চলে যাচ্ছে।'

'দাঁড়াও। তোমার দাদা একটু আগে ফিরলেন, দিচ্ছি।'

টিটো সোজা হয়ে দাঁড়াল। শালা হারামি। ইন্টারভিউ দিতে হয় কথা বলার জন্যে। একটু বাদে বাদলদার গলা পাওয়া গেল, 'কিরে খোকন, কি খবর?'

'আমি খোকন নই। টিটো।' আলতো করে বললো সে।

একটু চুপচাপ, তারপরেই বাদলদার গলা বদলে গেল, 'কি ব্যাপার?'

'আমি কি হাওয়া খেয়ে থাকব?'

'কেন? খাবার শেষ হয়ে গেছে নাকি?'

'কি ছিল জানেন না? আমি শালা এখানে পচে মরছি আপনি কোন খবর নিয়েছেন? এসব নক্সা আমার ভাল লাগছে না।'

'দ্যাখো, তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি ওইসব ওয়ার্ড আমার সঙ্গে ইউজ করবে না। খাবার নেই পাবে। তুমি ওখান থেকে চারধারে টেলিফোন করছ নাকি?'

'আমাকে আপনি ধুর পেয়েছেন? আর হ্যাঁ, এখানে আমার সময় একটুও ।টছে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।'

'কেন? ওপাশের ঘরে প্রচুর বই আছে। উপন্যাস।'

'দূর তেরি কা! ওসব ভদ্দরলোকদের জন্যে। একটা ভি সি পি আর গোটা শেক ক্যাসেট নিয়ে আসবেন। হিন্দি। অ্যাকসন। রাখছি।' নিজেই রিসিভার রখে দিল টিটো।

থাক! দুটো সমস্যার সমাধান হল। হিন্দি ছবি দেখতে পেলে সময়টা দিব্যি কটে যাবে। সাতদিন তাকে এখানে থাকতে হবেই। তার আগে হাওয়া ঠাণ্ডা ্বে বলে মনে হয় না। বড্ড ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল এবার।

টিটো জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। পাঁচতলা বাড়িটার টপ ফ্লোরে নজর ।গল। এখন বিকেল। বেশ কিছুটা দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও ভালই দেখা যাচ্ছে। বাঃ, মৎকার জিনিস। শ্রীদেবী-শ্রীদেবী ফিগার। পরনে হাউসকোট। আয়নার সামনে াঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। ওখানে একটা আয়না আছে বুঝি? চিরুনি থেকে উঠে াসা চুলের একটা দলা পাশের জানলা দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা ারাপ। এই চুল কোথায় গিয়ে পড়ছে কে জানে! শ্রীদেবী চোখের আড়ালে লে গেল। তারপরেই ফিরে এল একটা শাড়ি নিয়ে। গায়ে ফেলে আয়নার ামনে দাঁড়িয়ে বোম্বে ডাইং-এর মডেলের মত ঘুরে ঘুরে দেখল। না। পছন্দ ্ল না। আবার চোখের আড়াল। এবার একটা নীল শাড়ি। মাথা নাড়ল। তারপর হাউসকোটের বোতামে হাত রাখল। মোচার খোলা ছাড়াবার মত ়াউস কোট খুলছে। টান টান হয়ে তাকাল টিটো। কিন্তু যাঃ শালা, আবার চোখের আড়ালে চলে গেল শ্রীদেবী। এক দুই তিন মিনিট। ফিরে এল সায়া ়াউজ পরে। শাড়িটাকে তুলে নিয়ে শরীরে জড়ালো। বেশ কায়দা করে পরছে াড়িটা। তারপর অন্যান্য প্রসাধন, চুড়ি পরা চলল। সবশেষে যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখনই টুপ করে নিভে গেল ঘরের আলোটা। এই বিকেলেও আলো জ্বেলে শ্রীদেবী সাজগোজ করছিল। শ্রীদেবী। টিটো হাসল। এই নামেই া হয় ডাকা যাক।

কিন্তু বাড়িটাতে, না, ফ্ল্যাটটাতে আর কেউ নেই? তারা দুটো জানলার একটাতেও আসছে না কেন? সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। শ্রীদেবী একা একা সাজগোজ করে গেল কোথায়। সে এবার জানলা থেকে মাথাটা একটু বাইরে বাড়িয়ে নিচের দিকটা দেখল। ওই ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে গোটা চারেক

গাড়ি দাঁড়িয়ে ; ওদের এনট্রেন্স এ বাড়ির উল্টো দিক দিয়ে। হঠাৎই তার নজরে এল শ্রীদেবী বেরিয়ে আসছে। এত ওপর থেকে সে শুধু শাড়ির রঙ দেখে চিনতে পারল। অনেক ওপর থেকে মেয়েদের একটুও সুন্দরী বলে মনে হয় না। কিন্তু শ্রীদেবী একটা গাড়িতে উঠতেই সেটা চলতে শুরু করল। ওটা কার গাড়ি? শ্রীদেবীর নিজের? কেসটায় গোলমাল নেই তো? পরশু রাত থেকে সে এখানে আছে অথচ একবারও এসব নজর করেনি। গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর সে অন্য ফ্ল্যাটগুলোর দিকে তাকাল। না, এখান থেকে কোন কিছুই ভাল করে নজরে আসছে না।

এই ঘরে আসবাব বলতে একটা টেবিল চেয়ার আর ডিভান। এই ভর বিকেলে কোন শালার ডিভানে শরীর পেতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে? খিদেটা জোর পাকাচ্ছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হল। সন্ধ্যের পর আলো জ্বালতে নিষেধ করেছে বাদলদা। যদি কেউ সন্দেহ করে। প্রয়োজনের জন্যে দুটো মোমবাতি দিয়ে গেছে। চিড়িয়াখানার জন্তুরাও বোধহয় এর চেয়ে আরামে থাকে। সে ঘড়ি দেখল। বাদলদা এখনও আসছে না কেন? আর একবার টেলিফোন করবে নাকি? যদি মুখের ওপর বলেই ফেলে, বাদলদা সন্ধ্যের পর একটু আধটু মাল খেলে ভাল লাগবে, কিছু মনে না করে এক বোতল নিয়ে আসবেন? মাথা নাড়ল টিটো। শালা বহুৎ হারামি। সঙ্গে সঙ্গে সতী হয়ে যাবে। আপাতত ওই লোকটাকে হাতে রাখা দরকার।

পরশু থেকে রয়েছে কিন্তু এই ফ্ল্যাটের অন্য ঘরগুলো ভাল করে ঘুরে সে দ্যাখেনি। বইপত্তর আছে বলল। আধপাতা পড়লেই ঘুম পায়। টিটো ডিভান থেকে উঠল। ভেতরটায় এরমধ্যেই অন্ধকার জমেছে। শালা ভূতের মত বসে থাকা। সে একটা মোমবাতি জ্বাললো। পাশের ঘরে ঢুকে সে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু কার্পেট। এরকম একটা ফ্ল্যাট কিনে খালি ফেলে রেখেছে কেন বাদলদা তা ভাল জানে। তিননম্বরী টাকা নিশ্চয়ই থিকথিক করছে। ওপাশে একটা ছোট্ট ঘর। সেখানে ঢুকে একটা দেওয়াল আলমারি দেখতে পেল টিটো। থরে থরে বই সাজানো। ওপাশের দেওয়ালের র‍্যাকে কাঁচের আড়াল। মোমবাতি নিয়ে সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তার চোখ চক চক করে উঠল। মালের বোতল। গোটা আটেক। নানান সাইজের। হাত বাড়িয়ে কাঁচ সরাতে চেষ্টা করল টিটো, কাঁচ সরল না। তলায় একটা ছোট্ট হুকের মধ্যে তালা ঝুলছে আধ-ইঞ্চি তালা। শালাকে মোচড় দিলেই খসে যাবে। এখন থাক। হাতে অনেক

সময় আছে। বুকটা খুশিতে ভরে গেল টিটোর। সঙ্গে সঙ্গে খিদের খিমচানিটাও কমে গেল। সে ধীরে ধীরে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতেই বাইরের ঘরে দপ করে আলো জ্বলে উঠলো।

টিটো হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। বাদলদা ছাড়া আর কারও আসার কথা নয় কিন্তু যদি কেউ আসে? পরশু বাদলদা তাকে বলেছিল এঘরের মধ্যেই থাকতে। সে চেয়ারটায় গিয়ে বসল। এবং তখনই বাদলদাকে দেখতে পেল। হাতে বড় ড় দুটো প্যাকেট। কোন কথা না বলে বাদলদা সোজা চলে গেল কিচেনে। নিট তিনেক বাদে খালি হাতে ফিরে এসে বাদলদা বলল, 'টেলিফোন করার : দরকার ছিল? আমার ওপর ভরসা নেই নাকি?'

'প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল।' সে কেটে কেটে বলল।

'আরও তিনদিনের খাবার দিয়ে গেলাম।'

'ভি সি পি।'

'বললেই আনা যায় নাকি? কাল পাবে।' বাদলদা উশখুশ করল, 'তোমার ঙ্গে দাড়ি কামাবার সেট নেই। মুখটা এরই মধ্যে ক্রিমিন্যাল ক্রিমিন্যাল হয়ে ঠেছে।'

গালে হাত বোলালো টিটো, 'তা তো বলবেনই।'

'তার মানে?'

'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

'মোটেই এবার আমার জন্যে তুমি কিছু করোনি।'

'বাঃ! হালদার আপনার শত্রু না?'

'অফকোর্স। কিন্তু এবার আমি তোমাকে কিছু করতে বলিনি।'

'তাহলে আমাকে শেল্টার দিলেন কেন?'

'অতীতে তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ, তাই।'

'বাজে কথা। এই ঘটনা থেকে আপনি অনেক ফায়দা লুটবেন।'

'ঠিক আছে। কাল সেভিং সেট দিয়ে যাব, দাড়ি কামিয়ে ফেল।'

'বাইরের অবস্থা কি?'

'তুমি ধরা পড়ে গেছ।'

'মানে?'

'হালদারের বউ তোমাকে আইডেন্টিফাই করেছে। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে তোমাকে। আজকের কাগজেও তোমার ছবি ছাপা হয়েছে।'

'সর্বনাশ।'

'হালদারের ট্রিটমেন্টের জন্যে আমি বোম্বে থেকে একজন স্পেশালি
ডাক্তারকে আনিয়েছি। পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করেছি অপরাধীর কালো হা
ভেঙে দিতে।'

'আপনি?' হা হয়ে গেল টিটো।'

'হ্যাঁ। হালদারের বউ এখন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে শুরু করেছে। আমা
ভোটাররা আমাকে মহানুভব ভাবছে। গত কর্পোরেশন ইলেকশনে তুমি পিস্ত
নিয়ে বেরিয়েছিলে একথা সবাই জানে আর সেটা আমার জন্যে নয় কার
আমি সেবার ইলেকশনে দাঁড়ায়নি। তাই মানুষকে বোঝাতে আমার অসুবি
হচ্ছে না যে, আমি তোমার শাস্তি চাই।

'আপনি, আপনি অদ্ভুত লোক!' টিটো বিড়বিড় করল।

'তা বলতে পারো। এতে তোমার লাভ হল। কেউ সন্দেহ করবে না
তুমি আমার শেল্টারে থাকতে পারো।' বাদলদা হাসল, 'তোমার নিশ্চয় সিগারে
দরকার।'

'আমার তো অনেক কিছুই দরকার।' তিক্ত গলায় বলল টিটো।

'বাজে বকো না। মনে রেখো, তুমি এখন রাজার হালে আছ অথচ থাক
কথা ছিল গারদে। সাতদিন দেখব, যদি তাতেও টেনসন না কমে তাহ
তোমাকে বাইরে যেতে হবে।' পকেট থেকে কয়েকটা সিগারেটের প্যাকেট বে
করে সামনে রাখল বাদলদা। টিটোর ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। রাজনী
যারা করে তারা সবাই দুনম্বরের। কিন্তু বাদলদার এই ফ্ল্যাটে থাকলে বাদল
নিজে তার সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না। কিন্তু বাইরে পাঠিয়ে দিলে

'বাইরে মানে?'

'দেখি। এখনও কিছুই ঠিক করতে পারিনি। যাও খেয়ে নাও, তোমার স
একটা দরকার আছে। চটপট করো।' বাদলদা হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গে

টিটো উঠল। শালা, সেই পাঁউরুটি আর মাখন। না, মাংস আছে। দিন কে
চলে যাবে। গ্যাস না জ্বালিয়ে মাংসের ঝোল আর রুটি খেয়ে নিল টিটো। খে
মাথা শান্ত হল। ধীরে সুস্থে ফিরে এসে দেখল বাদলদা চুপচাপ সিগারেট খাচ্
সে ডিভানে বসল। বাদলদা ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বল
শোন টিটো, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে। অবশ্য এটা করবে কি
তা নির্ভর করছে তোমার ওপর। করতেই হবে এমন জোর করছি না আমি

'ভনিতা না করে বলুন।'

বাদলদা ঠোঁট কামড়াল, 'তোমাকে আমি আর কতবার বলব যে এইভাবে লা কথা শোনা আমার অভ্যেস নেই?'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমি আপনার উপকার করব কিভাবে? আমি শালা ়াই ফ্ল্যাটে নিজেই বন্দী হয়ে আছি।' টিটোর খুব ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে।

'সেইটেই সুবিধে। পুলিশের ধারণা তুমি ইতিমধ্যেই কলকাতার বাইরে গা াকা দিয়েছ। তোমার বন্ধুদের ধরে অনেক রগড়েও তোমার হদিশ পায়নি ়ুলিস। এই সুযোগটা তোমাকে নিতে হবে।'

'কি করতে বলছেন?'

'আজ রাত্রে তুমি এখান থেকে বের হবে। রাত এগারটা নাগাদ। তখন লফটম্যান থাকে না। এ বাড়ির পেছন দিকে কোন গার্ড নেই। দেওয়ালটাও ারফুটের বেশি উঁচু নয়। বেরিয়ে রাস্তায় পড়বে। মিনিট দুয়েক হাঁটলেই ামরাস্তার মোড়। সেখানে বারোটা পর্যন্ত ট্যাক্সি থাকে। বুঝতে পারছ?'

'বলে যান।'

'ট্যাক্সি নেবে। বলবে, একজন আত্মীয় হাসপাতালে আছে। সিরিয়াস অবস্থা, াকে দেখতে যাচ্ছ। সোজা হাসপাতালে গিয়ে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দেবে।'

'তারপর?' টিটো টানটান হল। 'ধান্দাটা কি?'

'আমি তোমাকে বুঝবার সাহায্য করার জন্যে এই কাগজে ম্যাপ এঁকে নিয়ে াসেছি। সোজা এই ম্যাপ ধরে এগিয়ে গেলেই তুমি হালদারের কেবিনের ামনে পৌঁছে যাবে। হালদারের কেবিনের সামনে একটা সেপাইয়ের থাকার ়থা। কিন্তু লোকটা আজ পাশের করিডোরে ঘুমোতে যাবে। তুমি বুঝতে ়ারছ?'

'পারছি। কিন্তু ওখানে গিয়ে কি করব?'

'যা করতে চেয়েছিলে।'

আঁতকে উঠল টিটো, 'আপনি কি বলছেন বাদলদা?'

'ন্যাকামি করো না। হালদারকে তুমি মেরে ফেলতে চেয়েছিলে, পারোনি। জ রাত্রে মেরে ফেলবে। ব্যাস। কেউ সন্দেহ করবে না তুমি এই কাজ রছ।'

'কি করে বুঝলেন?'

'তোমাকে আমি গুলি বা ছুরি চালাতে বলছি না।'

'তাহলে?'

'তুমি শুধু ওর ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায় খুব জোরে আঘাত করবে। এখন য
কন্ডিশন তাতে সামান্য আঘাত লাগলেই হি উইল বি আউট অফ অল ট্রিটমেন্ট
এইটুকু করে তুমি সোজা নিচে নেমে আসবে। আর একটা ট্যাক্সি ধরে কোয়ার্টা
মাইল দূরে কোথাও নেমে এখানে হেঁটে ফিরবে। ক্লিয়ার?'

'না। এই কাজটা আমি করব না।'

'কেন?'

'আপনি যেভাবে বললেন তাতে মনে হল এটা যেন ফুলের ওপর
যাওয়া। না হয় ট্যাক্সি করে গেলাম। কিন্তু হাসপাতাল, কি শ্মশান? দারোয়া
অত রাত্রে আমায় ওপরে উঠতে দেবে? করিডোরে মানুষ থাকবে না? নার্স
ফার্স আমায় দেখলেই তো চিনতে পারবে। আর সেই পুলিশটা যদি না ঘুমায়?

'ওর ঘুমের ব্যবস্থা হয়েছে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কেবিনে ঢুকে যদি কোন নার্সকে দেখি?

'দ্যাখো, পরিস্থিতি বুঝে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় তা তুমি জানো।
আমায় মুখের ওপর বলে দাও করবে না, ল্যাটা চুকে গেল।'

'আপনি আর কাউকে দিয়ে এটা করাচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আর একজনের ঝামেলা আমাকে পোহাতে হবে তাহলে। আমি ডা
দিলে তোমার মত দশটা ছেলে চলে আসবে। কিন্তু তাদের ব্যবস্থা--। যাকগে

'এতে আপনার কি উপকার হবে?'

'হালদার মরে গেলে আমার কি কি উপকার হবে তার বিশদ
নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দেব না টিটোবাবু।'

'কিন্তু আপনিই বললেন ওর জন্যে ডাক্তার আনিয়েছেন, ওর স্ত্রী আপ
বন্ধু বলে ভাবছেন আবার আপনিই মারতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে বেরিয়ে আমি হালদারের বাড়ির সামনে যাব ওই জঘ
আক্রমণের জন্য ধিক্কার জানাতে। হালদারের স্ত্রী সেই সভায় থাকবে।
ঘোষণা করব যতই রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাক মানুষ হিসেবে আমি
ভালবাসতাম এবং প্রয়োজন হলে ওকে বিদেশে চিকিৎসার জন্যে পাঠাব।
খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ওখানে উপস্থিত থাকবে। কি করবে বল?

টিটো মাথা নাড়ল, 'বাদলদা আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।'

'কেন হে?'

'কি জানি। খুব ভয় করছে!'

'ভয়? তোমার? তুমি না নিজেকে শের বল?'

'যদি ফেঁসে যাই। আমি কখনও এর আগে মানুষ মারিনি।'

'মারোনি? কিন্তু হালদারকে তুমি মারতে গিয়েছিলে?'

'মারবো বলে গেলে কি আর হাসপাতালে থাকতো?'

'তার মানে?'

'লোকটা তিনদিন ধরে আমার পেছনে ঘুরছিল। মোটা টাকার লোভ খাল। টাকার খুব দরকার ছিল আমার। শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারলাম।'

'লোকটা কে জানো?'

'না। কিন্তু আপনার নাম করেছিল?'

'বাজে কথা। তোমাকে কিছু বলার হলে আমিই বলতাম। এই এখন যেমন লছি। আর এই কথাটা এর আগেও তোমাকে জানিয়েছি।'

'হ্যাঁ। লোকটা কিন্তু বলেছিল। পাঁচ হাজারে উঠেছিল। এক অ্যাডভান্স দিয়ে লেছিল বাকিটা কাজ শেষ করলে দেবে। যেখানে আসার কথা ছিল সেখানে ল না বলেই তো আমি আপনার কাছে ছুটে গেলাম।'

'গিয়ে ঠিক করেছ কিন্তু আমি কাউকে তোমার কাছে পাঠাইনি। ইন ফ্যাক্ট ামি তখন জানতাম না তুমি হালদারের ওপর ঝামেলা করেছ। জানলে হয়তো শেল্টারে আনতাম না। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমার সঙ্গে আমার ম্পর্ক যদি প্রেস জানতে পারে তাহলে আমার দশা কি হবে? থাক, যা হবার তো হয়ে গেছে। আমি শুধু বুঝতে পারছি না একটা অচেনা লোক তোমাকে জ লাগাল আর তুমি তার কাছ থেকে পুরো টাকা নিলে না? এখন বুঝতে ারছি পুলিশ তোমার নাম জানল কি করে!'

'কি করে?'

'সেই লোকটাই ইনফর্ম করতে পারে।' চোখ বন্ধ করল বাদলদা, 'তুমি কিন্তু খনও বললে না আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না! আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। আপনি আমার এত উপকার করেছেন।'

'ছি ছি। বাদল রায় কিছু করে পাল্টা ফেরত চায় না।'

'ঠিক আছে।'

'কত দিতে হবে।'

'মানে?'

'কাজটা করে দিলে তোমাকে কত দিতে হবে?'

'বাদলদা, আমার টাকা চাই না। আপনি শুধু আমাকে দেখবেন।'

'দেখব তো নিশ্চয়ই। কিন্তু টাকা তোমাকে নিতে হবে।' পকেট থেকে একটা বাণ্ডিল বের করল বাদলদা, 'পাঁচ হাজার আছে। যত্ন করে রেখে দাও। আর দশ টাকার নোটে দুশো টাকা। ট্যাক্সিভাড়া আর যদি কাউকে দিতে হয়।' বাদলদা টাকাগুলো টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল, 'কি দিয়ে হিট করবে?'

'ভেবে দেখি।'

বাদলদা পকেট থেকে একটা গ্লাভস বের করল। গ্লাভসের আঙুলের ওপর সার সার কাঁটা উঁচিয়ে আছে। বাকিটা রবারের। গ্লাভসটাকে টেবিলে রেখে বাদলদা বলল, 'এটা পকেটে নিয়ে যাবে। কেবিনে ঢুকে পরে নেবে। তোমার গায়ে তো ভাল জোর আছে। আরে, ওই কাগজটা তোল। ওটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হারিয়ে ফেললে হালদারের বদলে অন্য কারো কেবিনে ঢুকে যাবে। আমি চলি।'

টিটো কাগজটা তুলে ম্যাপের ছবি আর লেখাগুলো এক পলক দেখে নিয়ে পকেটে রাখল। বাইরের ঘরের দিকে যেতে যেতে বাদলদা বলল, 'যদি খুব দরকার পড়ে তবেই বাড়িতে ফোন করবে। নাম বলবে অনিল। বুঝেছ। আর হ্যাঁ, কাল সকালেই আমি নিজে এসে ভি সি পি দিয়ে যাব। দরজার নবে হাত দিয়ে বাদলদা গলার স্বর নামাল, 'এবার ঘরের আলোগুলো নিভিয়ে দাও। পাবলিক জানবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণই ওগুলো জ্বলে ছিল।'

আলোগুলো নিভিয়ে দিতেই বাদলদা চলে গেল।

নিজের ঘরে ফিরে এল টিটো। নিজের ঘর! বাঃ, চমৎকার! এর মধ্যে সে ঘরটাকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছে। বাদলদার দেওয়া প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো সে। আঃ! আরাম।

এখন সাড়ে ছ'টা। চারপাশে অন্ধকার। সন্ধে জমজমাট। সে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়িটায় আলো জ্বলছে। শুধু শ্রীদেবীরটা অন্ধকার। কোথায় গেল শ্রীদেবী? সে দেখল চারতলার একটি ফ্ল্যাটে একটা বাচ্চা মেয়ে জানলায় এসে দাঁড়াল। কি উদাস ভঙ্গি। মেয়েটার মনে নিশ্চয় খুব কষ্ট এসেছে।

ফিরে এল সে ডিভানে। এগারটার পরে বেরুতে হবে। পুরো ব্যাপারটা

গোলমেলে। ধরা পড়ার সেন্ট পার্সেন্ট চান্স। বাদলদা শালা সাপের মত। ওর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল হাতকাটা বৃন্দা। পুরো নাম বৃন্দাবন। তাদের পাড়ার মস্তান। রোগা চেহারা কিন্তু সাহস খুব। বৃন্দা তাকে বলেছিল, 'দ্যাখ টিটো, মস্তানি করতে হলে একটা ঠেক চাই। পলিটিক্যাল ঠেক। নইলে তুই ঠিক ভোগে চলে যাবি। আমাদের সঙ্গে পুলিশের মহব্বত খুব। আর এই মহব্বতটাকে নিরামিষ করে দিতে পাবে পলিটিক্যাল লিডাররা। চল তোকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। লোকটা পটে গেলে তোর কোন চিন্তা নেই।'

হাতকাটা বৃন্দা এখন ছবি হয়ে গেছে। কর্পোরেশন ইলেকশনের সময় ব্যাপারটা হয়। ছবি কথার কথা। বৃন্দার ছবি ওর মা বাপের কাছেই নেই। তা সেই সময় বাদলদার সঙ্গে আলাপ। এর মধ্যে তিনবার থানায় ফোন করে তাকে ছাড়িয়েছে বাদলদা। একবার ডেকে পাঠিয়ে ওর কারখানার এক লিডারকে তুলে টাইট দিতে বলেছিল। কাজটা হয়ে যাওয়ার পর টাকা দিতে এসেছিল কিন্তু নেয়নি টিটো। বাদলদা হেসে বলেছিল, 'বা। গুড। মনে রাখব।'

মনে নিশ্চয়ই রেখেছিল নইলে এবার দেখামাত্র তাকে চিনতে পারল কি করে? এই ফ্ল্যাটে তাকে জায়গা দিত না নিশ্চয়ই। এসব সত্যি কথা। কিন্তু আজ এগারোটায় যেতে তার মন ঠিক চাইছে না। কেবলই মনে হচ্ছে ডালমে বহুৎ কালা হ্যায়।

সিগারেট শেষ করে টিটো উঠল। পাশের ঘরে অন্ধকারেই চলে এল সে। প্রায় প্যাঁচার মত ক্ষমতা হয়ে যাচ্ছে বে! মনে মনে হাসল সে। তারপর সেই সেলারটার সামনে পৌঁছে তালাটাকে মোড়াতে লাগল। হারামির জান। অন্ধকারেই পাশের র‍্যাক থেকে একটা পেপার ওয়েট তুলে একটু জোরে আঘাত করতেই তালা খুলে গেল। কাঁচ সরিয়ে একটা মদের বোতল বের করে নিয়ে সোজা রান্নাঘরে। অন্ধকার এখন চোখ সওয়া। খানিকটা কায়দা লাগল বোতল খুলতে। একটা গ্লাসে কিছুটা ঢেলে বেসিনের কল থেকে জল ভরে নিয়ে চুমুক মারল আলতো করে। বাঃ।

মদ সে নিয়মিত খায় না। আটমাস আগে কখনই খেতো না। দুদুদা তাকে মাল খাওয়া শেখায়। কিন্তু তিন বা চার পেগ। দুদুদা বলেছে, 'ভাই টিটো, মদ খাবে। এতে তোমার নার্ভ গরম হবে। কিন্তু কখনই মদকে তোমায় খেতে দেবে না। তাহলে তুমি গয়া হয়ে গেলে।'

আজ তিন খাওয়া যাবে না। সামনে কাজ। এই মদটা শালা অদ্ভুত। এতকাল যে সব দিশি খেয়েছে তার থেকে বহুগুণ আলাদা। বেশ ভালো লাগছে। এখান থেকে লিফটে নামতে হবে। সোজা যেতে হবে বাড়ির পেছনে। তারপর ট্যাক্সি গ্লাভসটা কোথায়? মনে পড়ল টেবিলে পড়ে আছে। কিন্তু ধরা যাক, হালদারের মাথায় ভাল মত আঘাত করার পর পুলিশ তাকে ধরে ফেলল। তাহলে? আর যদি না সেসব কিছু হয়, সে যদি ঠিকঠাক বেরিয়েও আসে তাহলে কি এখানে পৌঁছতে পারবে? এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবে? বাদলদা তো তাকে চাবি দিয়ে যায়নি। এই ফ্ল্যাটের দরজা টেনে দিলেই তো বন্ধ হয়ে যায়। চাবি চাওয়ার কথা তখন মাথায় আসেনি। বাদলদার তো নিজে থেকেই সেটা বলা উচিত তার মানে বাদলদা চায় না সে এখানে আর ফিরে আসুক? আর এই কারণেই তাকে মাল্লু দিয়ে গিয়েছে। এখানে না ফিরে এলে বাদলদার কোন রিস্ক থাকবে না। কেউ বাদলদার সঙ্গে তাকে জড়াতেও পারবে না। ব্যাস। বাদলদার পোয়াবারো। কে জানে, হয়তো বাদলদাই তাকে ফাঁসিয়ে দেবে। না, কখনই এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ধুর বনতে সে রাজি নয়। কিন্তু কি করা যায়? বাদলদা তো তার কাছে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত চাইবে কি বলবে সে?

গ্লাস শেষ করে দ্বিতীয়বার মদ নিল সে। ইতিমধ্যে সে ঠিক করে ফেলেছে এই ফ্ল্যাট থেকে একেবারে নিরাপদ না হয়ে বেরুবে না। কিন্তু কি কৈফিয়ৎ দেবে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই জ্বেলে মোমবাতি ধরাল সে। টেলিফোনটার নিচ থেকে ডাইরেক্টরিটা বের করে হালদার খুঁজতে লাগল। এই তো, হরিপদ হালদার। ঠিকানাটাও ঠিক আছে। এখানেই গিয়েছিল সে। দ্রুত টেলিফোন নম্বরে চোখ রাখল। তারপর রিসিভার তুলে ডায়াল করতে লাগল সে।

রিঙ হচ্ছে ওপাশে। টিটো টানটান হয়ে দাঁড়াল। দুবার, তিনবার। রিসিভার তুলল কেউ। পুরুষ কণ্ঠ, 'হ্যালো? কত নম্বর চাইছেন?'

নাম্বার যাচাই না করে টিটো জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস হালদার আছেন?'

'না। আপনি কে বলছেন?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল টিটো। কে বলছি জানালে তো হয়ে গেল। তার মনে পড়ল হালদারের বাড়ির সামনে মিটিং করতে গিয়েছে বাদলদা। হালদারের স্ত্রী নিশ্চয়ই এখন সেখানে। গ্লাস শেষ করে সে আবার ভরল। না। বেশি খাওয়া ঠিক নয়। যদি তাকে সত্যি সত্যি বেরুতে হয়, তাহলে বিপাকে পড়তে হবে

আর একটা সিগারেট ধরাল টিটো। শালা, 'লোভই সর্বনাশের মূল'। কি দরকার ছিল একটা আনসান লোকের কথায় রাজি হয়ে। জীবনে কখনই সে খুন করেনি। টাকার লোভে রাজি হয়ে গেল কেন? বাদলদা অবশ্য অস্বীকার করছে। বলেছে কাউকে তার কাছে পাঠায়নি। কিন্তু কথাটা মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না তার। পেছন থেকে সুতো নাড়ছে বাদলদাই। নইলে এই টাকাগুলো আজ বের হলো কি করে?

এগুলো তার কাছে অনেক টাকা। টাকাটা লাগবে বাবার। ভদ্রলোকের পেটে একটি চমৎকার টিউমার হয়েছে। ওষুধে কাজ হচ্ছে না। অপারেশন করতেই হবে। হাসপাতালে করলেও খরচ আছে। শেষ পর্যন্ত কাতর গলায় তার কাছেই প্রার্থনা করেছেন টাকার জন্যে।

চুপচাপ সিগারেটে টান দিচ্ছিল টিটো। বাবা। এটি তার দু'নম্বর বাবা। প্রথমজন মানে যাঁর ঔরসে তার জন্ম তিনি ছবি হয়ে গিয়েছেন তার চার বছর বয়সে। ভাল করে মুখটাই মনে পড়ে না। ছবি হয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ের পর মা তাঁর কোন ছবি রাখেননি। তার এই দ্বিতীয় বাবাটি একটু দু'নম্বরী। ব্যবসা করত। প্রায়ই আসামে যেত। মাঝে মাঝে ভাল টাকা খরচ করত। এক নম্বর বাপের বন্ধু ছিল দুই নম্বর বাপ। দ্বিতীয় বার বিয়ে করে মায়ের আর সন্তান হয়নি। দারুণ দেখতে ছিল, এখনও ফিগার চমৎকার। মা চাকরি করত। অফিস থেকে গাড়ি আসত নিয়ে যেত। খুব সাজতো। বিলিতি সেন্ট ছাড়া মাখতে পারত না। তার যখন দশ বছর বয়স তখন মায়ের সঙ্গে দু-নম্বর বাবার ঝামেলা আরম্ভ হল। কেন জানি না দু-নম্বর বাবার সঙ্গে তার বেশ ভাব ছিল। মায়ের কাছে চাইলে যা পাওয়া যেত না দু-নম্বর বাবা তা একেবারে দিয়ে দিত। লোকটা তাকে যেন ভালও বাসত। এগার বছর বয়সে মা আলাদা হয়ে যায়। অফিস থেকে ফ্ল্যাট দিয়েছিল মাকে। সেই ফ্ল্যাটে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তার দু-নম্বর বাবা একাই থাকত কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেত যেটা মা একদম পছন্দ করত না। যেহেতু তার বয়স এগার তাই একাই স্কুলে যেত। সেখান থেকে প্রায়ই দু-নম্বর বাবার বাড়িতে হাজির হত। প্রথম প্রথম মা এই নিয়ে বকাবকি করলেও শেষের দিকে আর গা করত না। তখন মায়ের তিন নম্বর স্বামী বাড়িতে আসা যাওয়া করছে। একদিন মা তাকে বলেই ফেলল, 'দ্যাখো টিটো, তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ। তোমাকে বলা দরকার। তুমি জানো আমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। সারাজীবন তো আর আমি একলা থাকতে

পারব না। কিছুদিন বাদে তোমার জগৎ আলাদা হয়ে যাবে। তাই আমি আবার বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চমৎকার মিল। এই ব্যাপারে তোমার কোন বক্তব্য আছে?'

মায়ের মুখের ওপর কথা বলার সাহস তার তখনই ছিল না। সে নীরবে মাথা নেড়েছিল। মা খুশি হয়েছিল, 'গুড। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে থাকতে পার। চাইলে হোস্টেলে যেতে পার। আমি কোন জোর করব না। চয়েস ইজ ইওরস।'

সে কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিল, 'আমি বাবার কাছে থাকব।'

'মানে? মা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বুঝতে পেরে বলেছিল তিনি তোমাকে রাখতে রাজি আছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাকে তো প্রায়ই ওখানে গিয়ে থাকতে বলে।'

'হুম্‌। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, উনি তোমার নিজের বাবা নন।'

'আমি জানি।'

'ও। তাছাড়া ওঁর ব্যবহার, কথাবার্তা, জীবনযাপন তোমাকে ভাল ক্যারিয়ার গড়তে খুব একটা সাহায্য করবে না। ওঁর কাছে থাকা মানে অভিভাবকহীন হয়ে থাকা।'

সে জবাব দেয়নি কিছু।

মা বেশ হতাশ স্বরে বলেছিল, 'ঠিক আছে। যা ভাল মনে করেছ তাই করবে ওঁকে বলবে তোমার পেছনে যা খরচ হবে সেটা আমিই দেব। হোস্টেলে রাখলেও তো দিতে হত।' সেই মুহূর্তে মাকে খুব দুঃখিত মনে হয়েছিল। পরে ভেবে দেখেছে এরকম সিদ্ধান্তে মায়ের উপকার হয়েছিল। একটা এগার বছরের ছেলে সমেত স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাততে যে কোন পুরুষের একটু অস্বস্তি হবেই। তা সেই স্ত্রী যতই সুন্দরী হোক না কেন। মাকে সে এক ধরনের মুক্তি দিয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর মা ঠিকঠাক মাসের পয়লা তারিখে টাকা পাঠাত। তখন তার দুই নম্বরী বাবার ব্যবসা খুব মন্দা। ভাল আয় হচ্ছে না ওই টাকা খুব উপকারে লাগত।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল টিটো। এইটে পেলে ভদ্রলোকের অপারেশনটা হয়ে যাবে। আর এই জন্যেই প্রস্তাবটায় রাজি হয়েছিল। অর্ডারি কাজ করে মাসে দু-পাঁচশো রোজগার হয়ে যেত। তাতে নিজের খরচাই ঠিকঠাক চলত না। অনেক রকম প্রস্তাব আসছিল তার কাছে। হাওড়া থেকে

এক খেপে ড্রাগের বাক্স ভবানীপুরে পৌঁছে দিতে পারলেই দুশো টাকা। কিংবা সেই মাল দার্জিলিং মেলে করে শিলিগুড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারলে পাঁচশো। কিন্তু রাজি হয়নি টিটো। ড্রাগ-বিরোধী বিজ্ঞাপনগুলো তাকে খুব স্পর্শ করত। কারো প্রেমিকাকে কেউ জ্বালাতন করছে, শ'খানেক নিয়ে সেই শালাকে ঝেড়ে এসো সামান্য। ভাড়াটেকে তুলে দিতে চাইছে বাড়িওয়ালা, একটু রোয়াব দেখিয়ে শ'খানেক হাতিয়ে নেওয়া। কেলো হয়ে গিয়েছিল লাস্ট ইলেকশনে। হাতকাটা বৃন্দাই কাজটা জোগাড় করে দিয়েছিল। তিনটে পোলিং বুথে পেটো ঝাড়তে হবে। রিভলভার দেখিয়ে পাবলিক ভাগাতে হবে। ঠিকঠাক করেছিল সে আরও কয়েকজনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে। ক্যান্ডিডেট হেভি ভোটে জিতেছিল কিন্তু খবরের কাগজে তাদের পেছন দিকের ছবি ছাপা হয়ে গিয়েছিল। তখন তার চুল ছিল অমিতাভ বচ্চনের মত। কাগজ দেখেই নাসিরুদ্দিনের মত কাটিয়ে ফেলেছিল। বাপ শালা সব জানে। এক নম্বরের ফান্টুস। মুখে লম্বা লম্বা কথা। পেটভর্তি মাল খায়। পকেটে টাকা না থাকলেই তার কাছে হাত পাতে। নেই বললে উপদেশ দেয় মায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনতে। আর তাই করতে গিয়ে একদিন হেভি খিচেন হয়ে গেল মায়ের সঙ্গে। এখন তার ওই বাড়িতে ঢোকা বন্ধ। বাদলদার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে মা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে তার কথা পড়েছে। মা তখনই বলেছিল, 'তুমি আমার কুসন্তান।' এখন কি বলবে কে জানে।

আবার হালদারের বাড়ির নম্বর ঘোরালো টিটো। রিঙ হচ্ছে। নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হল। টিটোর গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে নিজেকে শক্ত রেখে জানতে চাইল নম্বরটা ঠিক কি না। ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ। কাকে চাইছেন?'

'মিসেস হালদার আছেন?'

'কথা বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'আপনি আমাকে চিনবেন না।' নিজের কানেই নিজের গলা অচেনা ঠেকল।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার স্বামী হাসপাতালে আট নম্বর কেবিনে আছেন?'

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার?'

'আজ রাত্রে তাকে খুনের একটা চেষ্টা হবে। রাত এগারটার সময় গেলে দেখতে পাবেন যে-পুলিশটির ডিউটিতে থাকার কথা, সে ঘুমতে চলে গিয়েছে।'

'কি বলছেন আপনি? কে আপনি?'

'উত্তেজিত হবেন না। এখন পর্যন্ত উনি ঠিক আছেন। আপনি দয়া করে এক কাজ করুন। সোজা হাসপাতালে গিয়ে বলুন আজকের রাতটা স্বামীর পাশে থাকতে চান। যে করেই হোক অনুমতি আদায় করুন। আর যাওয়ার আগে বাদল রায়কে এই ব্যাপারটা জানিয়ে জান। বুঝতে পারছেন?'

'বাদল রায়কে?' ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছেন বোঝা যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার টেলিফোনের কথা আপনি কাউকে জানাতে পারবেন না। এমন কি বাদল রায়কেও না। জানালে আপনার স্বামীকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।' কথাগুলো দ্রুত শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল টিটো। এরই মধ্যে জব্বর ঘেমে গিয়েছে সে। হাতের চেটোয় কপাল মুছে গ্লাসের মদ শেষ করল। এখন রাত ন'টা। বাদলদার কথামত বেরুতে হবে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি আছে। এই টাকা দু'নম্বর বাপের জন্যে খরচ করতে হবে তাকে বেরুতেই হবে হাসপাতালে যাক বা না যাক। নইলে টাকা ফেরত নেবে বাদলদা। আর একবার বেরুলে আর এখানে ফেরা যাবে না। দরজা খোলার চাবি নেই তার কাছে। তাহলে কোথায় যাওয়া যায়? কিছুই ভাবতে পারছিল না টিটো। ডিভানে গা এলিয়ে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করেছিল। শালা! এর নাম জীবন?

হঠাৎ ঝনঝন শব্দ হতে ধড়মড়িয়ে উঠল সে। টেলিফোন বাজছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে ছিল। মাত্র এক ঘণ্টা। কার টেলিফোন?

এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। পুলিশ করতে পারে না, এমন কাজ নেই। সে যখন হালদারের বাড়িতে টেলিফোন করেছিল তখন ট্যাপ করতে পারে। এতক্ষণে নম্বর জেনে এখানে ফোন করছে দেখতে যে সে আছে কি না। টেলিফোনটা নেড়িকুত্তার মত ডাকছে এখন। নার্ভে লাগছে। শেষ পর্যন্ত রিসিভারটা তুলল টিটো। একটাও শব্দ ব্যয় না করে ওটা কানে দিল, 'হেলো হেলো? এতক্ষণ কি করছিলে? আমি বাদলদা।'

বুকের ওপর থেকে একটা চাপ যেন ধড়াম করে নেমে গেল। বাদলদা। সে গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'ঘুমোচ্ছিলাম।'

'আ। শোন। আজ রাত্রের ওই প্ল্যানটা বাতিল করে দিয়েছি। তোমাকে এখন কোথাও যেতে হবে না। একটা ব্যাপার ঘটেছে, কি করে ঘটল বুঝতে পারছি না।'

'কি ব্যাপার?'

'টেলিফোনে বলা যাবে না। টেক ইট ইজি। যাও, ঘুমিয়ে পড়।'

'আমি যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম, বাদলদা। কিন্তু আপনি একটা ভুল করেছেন।'

'কি?'

'আমাকে ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে যাননি। ফিরে এসে ভিতরে ঢুকতাম কি করে?'

একটু নীরবতা। তারপর হাসি, 'তুমি একটি গাধা। আমিই থাকতাম তখন ওখানে। তুমি এলে দরজা খুলে দিতাম।'

'বাঃ। এটা ভাবিনি। ও বাদলদা। একটা অন্যায় করেছি।'

'অন্যায়? কি? আলো জ্বেলেছ?'

'না। আপনার মালের স্টক থেকে একটা বোতল বের করেছি।'

'কি? চিৎকারটা খুব জোরে ভেসে এল।'

'রাগ করবেন না। অ্যাকশন করার আগে না খেলে নার্ভ ঠিক হয় না।'

'ওগুলো সব বিলিতি জিনিস। তোমার হজম করার কথা নয়। খুব অন্যায় করেছ। দ্বিতীয়বার ওখানে হাত দিতে যেও না।'

'ঠিক আছে। আমার ভি সি পি-র কথা মনে রাখবেন।'

লাইন কেটে দিল বাদলদা। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে হো হো করে হাসল টিটো। শালা। টিকরমবাজ। হজম হবে না! তোর থুতু তোকেই গেলাবো বে। মিসেস হালদার ফোন করতেই নার্ভাস হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই কথা রেখেছেন। বাদলদাকে কিছু বলেননি। কিন্তু বাদলদা তাকে সতর্ক করে দিল কেন? সে গেলে ধরা পড়তই আর সেটা জেনে কেন প্ল্যান বাতিল করল? ওই যে ফ্ল্যাটে ফিরে এলে দরজা খুলে দেবার বাতেলাটা বুঝতে তো বাকি নেই। তিনপেগ মদ খাওয়া সত্ত্বেও টিটো অনুমান করল, হালদারকে সরাবার জন্যে বাদলদা এখনই তাকে ধরিয়ে দিতে চাইছে না। থাক, একটা রাত তো আরাম করে ঘুমানো যাবে। সে চতুর্থ পেগ গ্লাসে ঢালল। বিলিতি মদে সহজে নেশা হয় না। শালা বদহজমের ভয় দেখাচ্ছিল।

জানলায় এল টিটো। কলকাতায় এখন ভাল রাত। আলোগুলো টিমটিম করছে। পাঁচতলা বাড়ির কোন কোন ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। সেই দুঃখী মেয়েটা আর জানলায় নেই। শ্রীদেবীর ফ্ল্যাট অন্ধকার। তার মানে এখনও ফেরেনি।

ঘুম ভাঙল খুব সকালে। শরীর বেশ ফুরফুরে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে

কিচেনে ঢুকল টিটো। গ্যাসে জল গরম করে চা ভেজালো। এগুলো করতে
বেশ লাগছিল তার। জীবনে কখনও তো এই কাজগুলো করেনি। কিন্তু করতে
বেশ মজা লাগছে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে জানলায় এল। তার খেয়াল
ছিল না যে জানলায় দাঁড়ানো নিষেধ। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সে বাইরে
তাকাতেই পাঁচতলা ফ্ল্যাটগুলো দেখতে পেল। তিনতলার এক ভদ্রলোক গেঞ্জি
গায়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন জানলায় দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখ নিচে
নামতেই তিনি টিটোকে দেখতে পেলেন। মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। হয়তো
এই ফ্ল্যাটে এর আগে কখনও কাউকে তিনি দ্যাখেননি। টিটোর মনে হল সরে
যাবে। কিন্তু লোকটা যখন দেখতেই পেয়েছেন তখন আর সরে লাভ কি। সে
খুব অলসভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। লোকটা এবার নিচের দিকে
তাকাচ্ছেন।

ওঁকে নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। টিটো শ্রীদেবীর ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল।
জানলাগুলো বন্ধ। গতরাত্রে খোলা ছিল। বেরুবার সময় জানলা বন্ধ করে
যায়নি শ্রীদেবী। তার মানে রাত দশটার পরে ফিরে জানলা বন্ধ করেছে।

হঠাৎ সরে আসতে গিয়েও পারল না টিটো। শ্রীদেবীর জানলা খুলছে। পুরো
খোলার পরে জানলায় দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা দুটো হাত ভেঙে হাই তুললেন।
অর্থাৎ ঘুমের রেশ এখন যায়নি। তারপর সামনের দিকে তাকাতেই তিনি নির্ঘাত
টিটোকে দেখতে পেলেন। টিটো দেখল শ্রীদেবীর চোখে বিস্ময়। মুখ ফিরিয়ে
ঘরের ভেতর যাওয়ার সময় আর একবার তাকালেন শ্রীদেবী। কি একটা গান
আছে যেন এমন বর্ণনা দিয়ে—কিছুতেই মনে করতে পারল না টিটো। রবীন্দ্রনাথের
গান। মা খুব ভাল গাইত গানগুলো। তার অবশ্য হিন্দি বেশি পছন্দ। চমৎকার
নাচা যায়। বাংলাগানের সঙ্গে নাচতে চাইলে ঘুম পেয়ে যাবে। চায়ের কাপ
রাখতে কিচেনে ঢুকল টিটো। মাংস আছে। রুটিও। আর একটা প্যাকেটে চাল
আর আলু এনে দিয়েছে বাদলদা। আজ ভাত করতে কি রকম হয়। ভাত আর
মাংস। তার দু'নম্বরী বাপটা ভাল রাঁধে। বাপের বান্ধবীরা তাদের বাড়িতে
অনুষ্ঠান হলে রান্নার জন্য ডেকে নিয়ে যেত। আজ একটু চেষ্টা করতে হবে।

ঘরে ফিরে তার খবরের কাগজের কথা মনে পড়ল। কাগজে তার খবর
ছাপা হয়েছে। ছবিও। আজকের কাগজে কি লিখেছে? একটা কাগজ পেলে
হত। সে রিসিভার তুলল। ডায়াল করতেই বাদলদার গলা।

'বাদলদা। আজকের কাগজটা চাই।'

'কেন? কি হবে? আজকের কাগজে তোমার সম্পর্কে কিস্যু লেখেনি।'

'কিছুই না?'

'না।'

'আপনি কখন আসছেন?'

'কেন?'

'বাঃ। ভি সি পি। আর একটু চিনি আনবেন। এক চামচও নেই।'

ওপাশের লাইন কেটে গেল। বাদলদার শালা নিজেরই এখন হজম করতে অসুবিধে হচ্ছে। একেবারে দিশি জিনিস অনেকের সহ্য হয় না।

অনেকক্ষণ রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল টিটো। তারপর আবার নম্বর ঘোরাল। চারবার রিঙ হল। তারপর সেই সুন্দর কায়দা করা উচ্চারণ, 'হেলো!'

ঢোঁক গিলল টিটো। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'মা!'

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। সেটা যেন শেষ হয় না। তারপর শক্ত গলা, 'কি চাও?'

'কিছু না মা। তোমার গলা শুনতে খুব ইচ্ছে করছিল।'

'বাঃ। এসব সেন্টিমেন্ট তোমার আছে নাকি?' ব্যঙ্গ ছিটকে উঠল।

টিটো রিসিভার ধরেই রইল। কিছু বলতে পারছিল না।

'আর কিছু বলবে?'

'না।'

'তাহলে রাখছি।'

'মা, তুমি আমার সম্পর্কে কিছু জানো?'

'আমি কিছুই জানতে চাই না।'

'মা, আমার কিছু বলার ছিল।'

'আমি তোমার মুখে বারংবার মা শুনতে চাই না।'

'আমি কিছু করিনি মা।'

'তাই নাকি?'

'লোকটা ভয় পেয়ে কাণ্ডটা না ঘটালে মাথায় লাগত না।'

'আমি রাখছি। তুমি আর আমাকে ফোন করবে না।'

'মা, আমি বাবার অপারেশনের জন্যে কাজটা করেছি।'

'অপারেশনের জন্যে?'

'হ্যাঁ। বাবার পেটে টিউমার হয়েছে। লোকটাকে টাইট দিলে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে শুনে এগিয়েছিলাম। টাকাটা অপারেশনের জন্যে লাগত।'

'এসব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। বাই।'

লাইন কেটে দিলেন ভদ্রমহিলা। এত শীতল কণ্ঠ, এত অবজ্ঞা তবু টিটোর বেশ ভাল লাগছিল। সে তার মনের কথা কাউকে বলতে পেরেছে, এইটুকুই তো লাভ। শিস দিল টিটো। তারপর সিগারেট ধরিয়ে জানলায় এল। ওপাশের জানলায় শ্রীদেবী। সোজাসুজি চোখাচোখি। টিটো হাসল। শ্রীদেবী এক ঝটকায় সরে গেল জানলা থেকে। টিটো নিজেকে বলল, কাজটা ভাল হচ্ছে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা মন বলল, সে খারাপ কি করেছে? শুধু হেসেছে। হাসি দেখে যদি কারো সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিছু বলার নেই।

দশটার সময় টিটো রান্নায় ব্যস্ত তখন বাদলদা এলেন।

এসে চিনির প্যাকেট দিয়ে বললেন, 'ভি সি পি হবে না। ওটা আনলে টিভি আনতে হবে। আমি এখানে থাকি না, দারোয়ান সন্দেহ করবে কার জন্যে এনেছি।'

'এখানে এসে তো আপনিও দেখতে পারেন।'

'এত ঘন ঘন আমি এখানে আসি না।'

'এমনি এমনি এত বড় ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন?'

'দিয়েছি। তোমার আপত্তি আছে?'

'আমার আপত্তি কেন থাকবে?'

'দেন স্টপ ইট। মিসেস হালদার কাল হঠাৎ অ্যালার্ট হলেন কেন?'

'আমি কি করে বলব?'

'আমার সঙ্গে খেলছ না তো?'

'বাদলদা আপনি কি যা তা বলছেন?'

বাদলদা অন্যমনস্কভাবে জানলার সামনে এগিয়ে গেলেন, 'ভদ্রমহিলা হঠাৎ টেলিফোনে বললেন, আজ রাত্রে স্বামীর কাছে থাকব। আমার ভয় করছে। অথচ তার একঘণ্টা আগেও আমরা এক মঞ্চে বসে মিটিং করেছি। শী ওয়াজ টোটালি ডিফারেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম। হালদারের অপারেশন হবে আজ।'

'আপনার বিদেশি ডাক্তার এসে গিয়েছেন?'

'সেটা তোমার জেনে কোন লাভ নেই।' বলতে বলতে বাদলদা বাইরে তাকিয়ে হঠাৎই হাত নাড়লেন। চিৎকার করে বললেন, 'ভাল?' ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠের একটি ধ্বনি ভেসে এল। স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বাদলদা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তুমি এই জানলায় আসো না তো?

মাথা নেড়ে 'না' বলল টিটো।

'তাহলে জানলাটা খুলে রেখেছ কেন?'

'বাতাসের জন্যে। ভ্যাপসা হয়ে যাবে।'

'এখানে প্রতিবেশীরা আমাকে চেনে। সম্মান করে, বুঝতে পারছ? সেলারের ালা খুললে কি করে? ভেঙেছ নাকি?'

'ভাঙতে চাইনি। ভেঙে গেছে।'

বাদলদা অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর জোরে জোরে হেঁটে গেলেন াশের ঘরে। একটু বাদে ফিরে এসে তালাটা দেখিয়ে বললেন, 'এটাকে চেষ্টা রে ভেঙেছ তুমি। টিটো, আমি বোতলগুলো গুনে রেখে গেলাম। আর যদি ত বাড়াও আমি তোমাকে ছাড়বো না। কাল রাত পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। ারপর তোমাকে আমি জঙ্গলে পাঠাব। সেখানে পুলিশ তোমার ছায়া মাড়াতে ারবে না।'

'জঙ্গলে?'

'হ্যাঁ। টাকাগুলো দাও।'

'আপনি তো আমাকে কাজ করার জন্য টাকা দিয়েছেন।'

বাদলদা তাকালেন। একটু ভাবলেন। সেই অবকাশে টিটো বলল, 'এই ্যাটের চাবিটা দিন। সুযোগ বুঝে আমি বেরুবো কাজটা করতে।'

'অন্যকোন মতলব নেই তো?'

'কি আশ্চর্য! আপনি এত সন্দেহ করেন কেন?'

বাদলদা পকেট থেকে দুটো চাবি বের করে একটা খুলে নিয়ে টেবিলের পর রাখলেন, 'তোমাকে শেল্টার দিয়ে খুব ভুগতে হচ্ছে। বিকেলে ফোন রব। তুমি কখনো আমাকে ফোন করবে না। আমার স্ত্রী সন্দেহ করতে আরম্ভ রেছে।' বাদলদা বড় বড় পা ফেলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেলেন। টিটো খপ রে চাবিটা তুলে নিল। একটা বড় বোকামি করল বাদলদা। সে আবার কিচেনে কে গেল।

াল ফুটছে। সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিটো। এখন তার পরনে একটা খাটো ান্ট। এটা একসময় জগিং-এর জন্য ব্যবহার করত। হালদারের ব্যাপারটা ার পর সে খুব অল্পই সময় পেয়েছিল জামাকাপড় গুছিয়ে নিতে। তাড়াহুড়োয় জামা আনা হয়নি। টিটোর শরীরে এখনও মেদ জমেনি। কাঁধ পেট বুক হিপ

যেন খোদাই করা। ফলে খালি গায়ে খাটো প্যান্টে তাকে বেশ টাটকা দেখাচ্ছি
যদিও ঘাম ঝরছিল অনর্গল। সে সতর্ক ছিল কারণ কতক্ষণে চাল নরম ভ
হয়ে যায় তা তার অজানা। মাঝে মাঝেই চামচ দিয়ে ভাত তুলে সে দেখছি
কতটা নরম হয়েছে। হঠাৎ কানে বেল বাজার শব্দ এল।

টিটোর কপালে ভাঁজ পড়ল। কেউ কলিং বেল টিপছে। এরকম হবার ক
নয়। কারণ পৃথিবীসুদ্ধু লোক জানে বাদলদা এখানে থাকে না। একটু আ
বাদলদা বেরিয়ে গিয়েছে। তা দারোয়ান দেখেছে। তাহলে? এই সময় দ্বিতীয়ব
বেল বাজল। এবার একটু জোরে। একটু সময় নিয়ে।

গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে সে নিঃশব্দে বাইরের ঘরে চলে এল। দরজার ফুটো
চোখ রাখলে দেখা যায় বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরত্ব রেখে টি
ফুটো দিয়ে দেখল। শাড়ি দেখা যাচ্ছে। শাড়ি কেন? এই সময় তৃতীয়বার বে
বাজল। যিনি এসেছেন তিনি একটু অধৈর্য হয়ে সরে দাঁড়াতে তাঁর মুখ দেখ
পেল টিটো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এল। শ্রীদেবী। শ্রীদে
এই ফ্ল্যাটে কেন? টিটো ভুলে গেল সে কি পোশাক পরে আছে। ল
ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

শ্রীদেবী এখন তার সামনে। ভদ্রমহিলার চোখেমুখে বিস্ময়। তার তখ
নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতন হল টিটো। কিন্তু এখন কি করতে পারে সে
তারপরেই চট করে ঘুরে সে ছুটে গেল ভেতর দরজা খুলে রেখে।

ভেতরে গিয়ে চটপট প্যান্ট আর রঙিন গেঞ্জি পরে চুলটা ঠিক করে নি
সে। তারপর ধীর পায়ে বাইরের ঘরে এসে দেখল শ্রীদেবী তখনও দরজ
দাঁড়িয়ে আছেন কিছুটা হতভম্ভ হয়ে। টিটো গিয়ে দাঁড়াতেই শ্রীদেবী জিজ্ঞ
করলেন, 'ক্ষমা করবেন, মিস্টার রায় কি আছেন?'

'মিস্টার রায় মানে বাদলদা?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি?'

'আমি পাশের বাড়িতে থাকি।'

'ভেতরে আসুন।'

শ্রীদেবী যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় পা বাড়ালেন। বাইরের ঘরে বসার জা
নেই। টিটো তাঁকে পথ দেখিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে এল। সেখানে এসে শ্রী
জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার রায় নেই?'

'উনি একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছেন।' টিটো হাসার চেষ্টা করল।

'ও। কথাটা তো দরজা খুলেই আমাকে বলতে পারতেন।'

'আসলে আপনাকে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'অবাক? আমাকে দেখে? কেন?'

'মানে কাল বিকেলে আপনাকে প্রথম দেখলাম সামনের বাড়ির জানলায়। াত্রে কখন ফিরেছেন জানি না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজ সকালে আবার দখলাম। সেই আপনি হঠাৎ এখানে। বুঝতেই পারছেন, অবাক হব না কেন? গড়গড় করে বলে গেল টিটো। এই সময় তার একদম খেয়াল ছিল না াপরিচিত কারো সামনে গেলে এখন কি বিপদ হতে পারে। তার ভাল াগাছিল।

শ্রীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে কে পাঠিয়েছে াপনাকে?'

টিটো হতভম্ব। ভদ্রমহিলার মুখ তার কথাগুলো শোনার পর থেকেই বেশ মথমে হয়ে উঠেছিল। এখন প্রশ্নে রাগ স্পষ্ট হল।

'আমি গোয়েন্দাগিরি করতে যাব কেন? আমি ওসব করি না।'

'তাহলে এখান থেকে ওই জায়গায় চোখ রেখে বসে আছেন কেন?'

টিটো মুখ ফেরাল। তারপর বলল, 'সত্যি কথাটা বলি তাহলে। কাল বকেলে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল আমি শ্রীদেবীকে দেখছি। এত মিল আপনার ঙ্গে—?'

'শ্রীদেবীটা কে?'

'আরে! ফিল্মস্টার। বোম্বেতে থাকে। ফিল্ম দেখেছেন ওর? দারুণ। হ্যাঁ, । বলছিলাম, আপনার সঙ্গে বহু মিল আছে। ওরা তো অনেক সময় কলকাতার ্যটিং করতে হলে এইরকম ফ্ল্যাটে চুপচাপ থাকে। বিকেলে আপনি গাড়ি করে লে গেলেন। এই এখান থেকেই দেখলাম। সকালে দেখে বুঝলাম, না, একটু শ হয়েছে।'

শ্রীদেবীর ঠোঁটে হাসি চলকে উঠল, 'এরপর থেকে আর তাকাবেন না তা?'

'আপনি যদি নিষেধ করেন তাহলে জানলায় যাব না।'

'জানলায় যেতে নিষেধ করছি না। আমার দিকে না তাকালেই হল।'

'অসম্ভব। আপনি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখুন, আপসেই চোখ যাবে।'

'আশ্চর্য! জানলায় দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আপনার?'

'আছে। রান্না করি। এই আর কি!'

'মিস্টার রায় আপনার কে হন?'

'আমি বাদলদা বলে ডাকি। আত্মীয় হন না।'

'আমি এসেছিলাম আপনার নামে ওঁর কাছে কমপ্লেন করতে।'

হাসল টিটো. 'ভাগ্যিস উনি নেই। নইলে এখান থেকে আমাকে কেটে পড়তে হত। অবশ্য আপনি ওঁকে টেলিফোনেও বলতে পারেন। তবে সত্যি কথা বলবেন। আমি শুধু তাকিয়েছি। ওঁর মত হাত নাড়িনি।'

'মানে? উনি তো হাত নাড়তেই পারেন। আমাকে বছর তিনেক ধরে চেনেন। আমি যে স্টুডিওর সঙ্গে অ্যাটাচ্ড ছিলাম তার মালিক ওঁর বন্ধু।'

'স্টুডিও? আপনি কি সিনেমা করেন?'

'না। মডেলিং। ঠিক আছে—।' শ্রীদেবী যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

টিটো বলে উঠল, 'আপনি যখন দয়া করে এলেন. যে কারণেই এসে থাকুন না কেন, একটু চা না খেয়ে গেলে আমার কিন্তু খারাপ লাগবে।'

'চা? ঠাণ্ডা কিছু দিতে পারেন।'

'অসম্ভব। পারব না।'

'মানে?'

'কিস্যু নেই এখানে। বাদলদা একেবারে মরুভূমি করে রেখেছেন। শুধু চা করে দিতে পারি। কোল্ড ড্রিঙ্কস নেই, কফি নেই, আর যেটা আছে তা বলা যাবে না।'

'কি আছে?' শ্রীদেবীর যেন এবার মজা লাগল।

'না। থাক ভদ্রমহিলাদের সামনে বলা উচিত নয়। আপনি বসুন, পাঁচ মিনিট।'

'আপনি কিন্তু খামোখা কষ্ট করছেন।'

দূর। কষ্ট কি? একা জিভ মুখে নিয়ে বসে থাকতে হত।' টিটো চটপট চলে এল কিচেনে। চায়ের জল চাপাল। এবং তখনই খবরের কাগজের কথা মনে পড়ল। দূর থেকে তাকে দেখে সন্দেহ করে শ্রীদেবী খবরের কাগজে দেখা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে এখানে আসেনি তো? বেরিয়ে গিয়েই পুলিশকে জানাবে হয়তো। টিটোর মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। দরজাটা খোলার কি দরকার ছিল?

'আপনি শিভাস রিগ্যাল খান?' এপাশের ঘর থেকে শ্রীদেবীর গলা ভেসে এল। যাচ্চলে! তার ঘরে চলে এসেছেন ভদ্রমহিলা।

সে জবাব দিল, 'ওই আর কি!'

'মাতাল দেখলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে।' গলা শোনা গেল।

'আমি জীবনে মাতাল হইনি।'

'এম্মা। এখানে এত টাকা ফেলে রেখেছেন?'

'এখানে তো আর কেউ নেই। চুরি হবে না।' চায়ের কাপদুটো নিয়ে সে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল, 'নিন, কেমন হয়েছে কে জানে।'

'আমি দিনে এক কাপ চা খাই। সকালে। আজ নিয়ম ভাঙলাম।' শ্রীদেবী চায়ের কাপ নিয়ে চেয়ারে বসলেন। অগত্যা ডিভানে বসল টিটো। চুমুক দিয়ে বলল, 'না, খারাপ হয়নি। দেখুন তো।'

শ্রীদেবী ঠোঁটে ছোঁয়ালেন, 'ভালই তো।'

'এখানে মুশকিল হল খবরের কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কেন? দারোয়ানকে বলে দিলেই হকার পাঠিয়ে দেবে।'

'ও। আপনি কোন্ কাগজ পড়েন?'

'আমি? একদম কাগজ পড়ি না। ওই তো, নেতাদের একই কথা রোজ, আর খুনজখমের খবর। বিরক্ত লাগে।'

সঙ্গে সঙ্গে কনকনানিটা দূর হয়ে গেল। আরও ভাল লাগল চা। টিটো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শ্রীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিলেন? মানে, পার্মানেন্টলি থাকবেন?'

'না, না। দু-একদিনের জন্যে আছি এখানে। এভাবে থাকা যায়?'

'এভাবে মানে? একা একা?' শ্রীদেবী হাসলেন, 'হাঁপিয়ে উঠেছেন?'

'দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারেন না?'

'আমার কোন বন্ধু নেই। সব শালা টিকরমবাজ।'

'কি বাজ?'

টিটো লজ্জা পেল। শব্দটা বলা ঠিক হয়নি। সে বলল, 'ওই, মতলবে থাকে।'

'আপনি কি করেন?'

'আমি? বলার মত কিছু না। ছোটোখাটো বিজনেস।' টিটো হঠাৎ নিজের জন্যে দুঃখিত হল। 'স্কুল লিভিং-এ ভাল নম্বর ছিল কিন্তু আর পড়া হয়নি।'

'আপনি ইংলিস-মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ছিলেন? পড়লেন না কেন?'

'বাবা ছিল না। মা আবার বিয়ে করল।'

'আচ্ছা!'

'আর আমি গার্জেনহীন হয়ে মাস্তানি করতে লাগলাম। কিছুটা সত্যির সঙ্গে কিছু মিথ্যে মিশিয়ে কথাগুলো বলল টিটো।

'আপনি মাস্তান?' হাসিমুখে তাকালেন শ্রীদেবী।

'ওই আর কী? কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য চায়, আমি সাহায্য করি।'

'এটাই আপনার বিজনেস নাকি?'

'না-না।'

'জানা রইল। আমি বিপদে পড়লে আপনার সাহায্য চাইব। আজ চলি। দুপুরে অনেকক্ষণ কাজ আছে।' শ্রীদেবী দরজার দিকে পা বাড়ালেন চায়ের কাপ টেবিলে রেখে। টিটো তাঁকে অনুসরণ করল। দরজার কাছে পৌঁছে শ্রীদেবী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ওই যা! আপনার নামটাই আমার জানা হল না।'

'সবাই আমাকে টিটো বলে।'

'তাই?'

'আপনার নামটা—!'

'কেন? শ্রীদেবী।'' শব্দ করে হেসে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন শ্রীদেবী। একটু বোকার মত দাঁড়িয়েছিল টিটো। তারপর সচেতন হতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। নাম বলল না বহুৎ ঘোড়েল মাল। গভীর জলে খেলে। বাদলদার সঙ্গে যখন আলাপ আছে তখন আর দেখতে হবে না। নিশ্চয়ই বাদলদাকে জানাতে এখানে এসেছিল। আর সেটা শুনে রঙ নেবে বাদলদা। তার চেয়ে আগেভাগে সে যদি জানিয়ে দেয় তাহলে ভাল হবে। ডায়াল করল টিটো। বাদলদার বউ ধরল। ন্যাকাপনা। শালি কায়দা করে 'হেলো' বলছে। টিটো জিজ্ঞাসা করল, 'বাদলবাবু আছেন?'

'না। আপনি কে বলছেন?'

'খবরের কাগজ থেকে বলছি। জরুরী দরকার ছিল।'

'ও! আপনি ওঁকে অফিসে পাবেন।'

'নম্বরটা—।'

ভদ্রমহিলা এবার বিগলিত হয়ে নাম্বারটা দিলেন। লাইন কেটে আবার ডায়াল করল টিটো। মালের অফিসে কোনদিন যায়নি সে। টেলিফোন বাজছে। একটি মেয়ের গলা। ইংরেজিতে কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল। টিটো বাদলদাকে

ইল। তারপরেই বাদলদার গলা 'হেলো।'
'একটা ঘটনা ঘটেছে।' টিটো বলল।
'তুমি? এই নাম্বার কি করে পেলে?'
'পেয়ে গেলাম।'
'ও গড! বল কি বলছ। সাবধানে বলবে।'
'এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন আপনার খোঁজে।'
'ভদ্রমহিলা? কে?'
'নাম বললেন না।'
'তুমি দরজা খুলেছিলে কেন?'
'অন্যমনস্ক ছিলাম। ভাবনা ছাড়া তো কিছুই করার নেই এখানে। আপনি
া অত বলা সত্ত্বেও ভি সি পি এনে দিলেন না। খোলার পর মনে হল ঠিক
রিনি।'
'তুমি আমাকে না ডুবিয়ে ছাড়বে না। কেমন দেখতে?'
'সুন্দরী। বেশ সুন্দরী।'
'কি বলল?' বাদলদার গলার স্বর কাঁপছে। তার মানে শালা এখানে মেয়ে
য়ে এসেছে এর আগে। টিটো অনুমান করল।
'জিজ্ঞাসা করল মিস্টার রায় আছেন কি না?'
'মিস্টার রায়?' বাদলদার গলায় যেন স্বস্তি ফিরে এল, 'তারপর?'
'উনি ভেতরে এলেন। বসলেন। চা খেলেন।'
'আশ্চর্য! তুমি যাকে চেনো না তাকে ঘরে ঢুকিয়ে চা খাওয়ালে?'
'চিনি না ঠিক না। দেখেছি। উনি আমার সামনের পাঁচতলা ফ্ল্যাটে থাকেন।
াপনি ওঁকে দেখে হাত নেড়েছেন বললেন।'
'ও। তমা। কিন্তু খুব অন্যায় করেছ তুমি দরজা খুলে দিয়ে। কি বলল সে?'
'আপনাব কথাই বলছিলেন। অনেকদিনের জানাশোনা।'
'শোন। তুমি এসব ব্যাপারে নাক গলাবে না। সী ই'জ এ ডেঞ্জারাস লেডি।
কা থাকে, মডেলিং করে। বুঝতে পারছ? তোমাকে চিনতে পারেনি তো?
'না। বলেছে প্রয়োজন হলে আমার সাহায্য নেবে।'
'তার মানে? তোমার কাজকর্মের গল্প ওর কাছে করেছ নাকি?
'না, না। এমনি।'
'টেলিফোনটা রেখে দাও।'

রেখে দিল টিটো। তার খুব মজা লাগছিল। বাদলদা আর রোয়াব নিতে
পারবে না তার ওপর। শ্রীদেবীকে ফোন করতে হবে না, বাদলদা নিজেই তাকে
ফোন করবে। জানতে চাইবে কি ব্যাপার। তমা। সুন্দর নাম তো শ্রীদেবীর।
বেশ চমকানো নাম। টিটো জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। ভাল রোদ এখন। শ্রীদেবীর
জানলায় কেউ নেই, কিন্তু নিচের তলার সেই মেয়েটা একই ভঙ্গিতে আবার
বসে আছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা। কি দুঃখ ওর? এই বয়সে অত দুঃখ কেন?
মানুষের জীবন খুব অদ্ভুত। বিড় বিড় করে, চায়ের কাপ ধুতে চলে গেল টিটো।

দুপুর গড়িয়ে গেল কিন্তু নতুন কিছু ঘটল না, ভাত খেয়ে লম্বা ঘুম দিল টিটো।
বিকেলে ঘুম ভাঙল বেলের আওয়াজে। নিঃশব্দে দরজার গর্তে চোখ রেখে
দেখল কেউ একজন দাঁড়িয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। জানান না দিয়ে চুপচাপ
সরে এল সে। নীল শার্ট পরা লোক। বাদলদা এখানে থাকে না জেনেও কেউ
এসেছে কেন? হয়তো লোকটা ফ্ল্যাট ভুল করতে পারে। দ্বিতীয় বারের পরে
আর বেল বাজেনি। সিগারেট ধরিয়ে টিটো ঠিক করল, আজ রাত্রে বের হবে।
এমন হতে পারে, পুরো ব্যাপারটাই নকসা। হয়তো খবরের কাগজে তার নাম
বা ছবি ছাপা হয়নি। মায়ের সঙ্গে যখন কথা বলেছিল তখন তো মা বলত
কথাগুলো। বলেনি। তাকে ভয় দেখিয়ে বাদলদা হয়তো এখানে আটকে রেখেছে
কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

যদি যেতে হয়, বাবার কাছে যাবে। তার দু'নম্বরী বাবা। কিন্তু লোকটা তাকে
এক সময় ভালবাসত। আজ গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবে। পরে বাদলদাকে না
হয় একটা কিছু কৈফিয়ত দেবে। অবশ্য বাবার ওখানে যাওয়ার একটা ঝুঁকি
আছে। পুলিশ যদি তাকে পেতে পারে বলে ওখানে নজর রাখে? কি করা যায়?
সে ঠিক করল, একটু রাত বাড়ুক।

জানলায় এল টিটো। এখন প্রায় সন্ধ্যে। জানলায় শ্রীদেবী। পরনে হাউসকোট।
তাকে দেখামাত্র হাত নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত শূন্যে দোলাল টিটো।
শ্রীদেবী হাসলেন। এত দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে হাসিটা। নিশ্চয়ই দাঁতের
মাজনের মডেলিং করে। শ্রীদেবী একটা হাত কানে দিলেন। বুঝতে পারল না
টিটো। দ্বিতীয়বার একই ভঙ্গি করলেন শ্রীদেবী। এবার মাথায় এল শ্রীদেবী
টেলিফোনের কথা বলছেন। তার মানে বাদলদা ওঁকে টেলিফোন করেছে।
একি? তাকে ইশারায় ডাকছে শ্রীদেবী। যেতে বলছে ওখানে। টিটো হাত তুলে

অপেক্ষা.করতে বলল। শ্রীদেবী হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

চেয়ারে বসে টিটো ভাবল, যাওয়া উচিত হবে কি না? এই সন্ধ্যেবেলায় তাকে যে-ই দেখবে সেই চিনে ফেলবে। আবার বেশি রাত্রে যাওয়া ঠিক হবে না। কি করা যায়? শ্রীদেবী তাকে খুব টানছিল। ওঁর ফোন নম্বর জানলে না হয় না বলে দিত। সে আবার জানলায় গেল। দেখতে পেলে হাত নেড়ে না বলে দেবে। কিন্তু শ্রীদেবীকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাদলদাকে টেলিফোন করলে কেমন হয়? বলবে তমার টেলিফোন নম্বরটা দিন। নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

সন্ধ্যেবেলায় চা খাওয়া হয়নি। বানাতে ইচ্ছে হল না। শার্ট প্যান্ট গলিয়ে নিল টিটো। দেখা যাক না। বাইরের দরজার গর্তে চোখ রেখে দেখল প্যাসেজে কেউ নেই। সন্তর্পণে দরজা খুলে একবার দেখে নিল পকেটে বাদলদার দেওয়া টাকাটা আছে কি না। শ্রীদেবী চলে যাওয়ার পর সে পকেটে রেখেছিল।

প্যাসেজে কেউ নেই। লিফটে নামা ঠিক হবে না। এখন লিফটম্যান থাকবে। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল সে। রুমাল বের করে মুঠোয় নিয়ে গালে চাপল। যেন গালে খুব ব্যথা হয়েছে। নিচের তলার দু'তিনজন লোক পাশ দিয়ে চলে গেল। তার দিকে চেয়েও দেখল না। গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে সে গেটের দিকে তাকাতেই দারোয়ানকে দেখতে পেল। আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দারোয়ান একপাশে সরে গেল। সেই ফাঁকে উল্টো দিক দিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল টিটো। গেটের বাইরে রাস্তায় এসে পেছন ফিরে তাকাতে মন শান্ত হল। দারোয়ানটা সন্দেহ করলে বেরিয়ে আসত, আসেনি।

এ পাড়াটা বড়লোকদের। রাস্তায় লোকজন নেই। দোকানপাটও মোড়ের দিকে। সে মুখে রুমাল চেপে হন হন করে হেঁটে এল পাঁচতলা বাড়ির গেটের সামনে। ভেতরটা বেশ জমজমাট। কয়েকটা বাচ্চা হৈ চৈ করে খেলছে। দু'তিনজন মহিলা লনে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। দারোয়ান গোছের কাউকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। টিটো, খুব ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি চিনতে পারে তাহলে তুমি ভোগে গেলে। নিজের সঙ্গে কথা বলল সে। আর তখনই দুপ্ করে আলো নিভে গেল। জ্যোতিবাবু চলে গেলেন।

এক মুহূর্ত ব্যয় না করে সে গেটের ভেতরে চলে এল। আলো নেভার সময় যেমন তাদের পাড়ায় একটা হতাশার আওয়াজ ওঠে এখানেও তার ব্যতিক্রম

হল না। গরিব আর বড়লোকরা কিছু কিছু ব্যাপারে একই রকম আচরণ করে। টিটো সদর দরজায় চলে এল অনেকটা আন্দাজেই। দারোয়ানদের কেউ হয়তো আর একজনকে জেনারেটার চালাতে বলছে তাড়াতাড়ি। অন্ধকারে কোন কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। আচমকা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সদর দরজায় কয়েকজন অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই সময় কেউ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ভিড়ের সঙ্গে মিশে থেকে সে দেখল দু'তিনজন পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে জেনারেটারের জন্যে অপেক্ষা না করে। কেউ একজন হিন্দিতে রসিকতা করল, 'সরকারি ব্যায়াম ভাই, করে নাও।' টিটো ওদের অনুসরণ করল। অন্ধকারে সিঁড়ির আন্দাজ একবার হয়ে গেলে ওপরে উঠতে অসুবিধা হয় না। সে যখন দোতলা ছাড়িয়েছে তখনই জেনারেটার চালু হল। রুমাল বের করতে গিয়ে সামলে নিল টিটো। জেনারেটার বিদ্যুৎ দিচ্ছে লিফট এবং কমন প্যাসেজকে। ঘরে ঘরে ইতিমধ্যে নিজস্ব আলো জ্বলে উঠেছে। সম্ভবত লোড টানতে অসুবিধে হচ্ছে বলে বাইরের আলো বেশ নেতানো। এই আলোয় খুব ঠাওর না করলে ছবি দেখে তাকে চিনতে পারা সম্ভব নয়। সে খুব ধীরে সুস্থে ওঠার চেষ্টা করল। একেবারে ওপরে উঠে এসে সে জিরোবার জন্যে দাঁড়াল। কোন দরজাটা শ্রীদেবীর? নামধাম লেখা নেই যে দরজায়, সেটির দিকে এগোল সে। কারণ বাকি তিনটি ফ্ল্যাটের দরজায় অপরিচিত নাম দেখা যাচ্ছে। বাদলদা বলেছে, তমা! তমা কি তাও সে জানে না। বেল টিপল টিটো। একটু অস্বস্তি যে হচ্ছে না, তা নয়।

দরজা খুলল না। টিটোর খেয়াল হল বেলের আওয়াজ সে শুনতে পায়নি। এই লোডশেডিং-এ বেল বাজার কথা নয়। সে দরজায় শব্দ করল। দ্বিতীয়বারে দরজা সামান্য খুলল। দুটো পাল্লা চেন দিয়ে আটকানো। একজন মোটা মহিলা তার ফাঁকে উঁকি মারলেন। টিটো কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করল, 'তমা আছেন?'

ভদ্রমহিলা বাঁ হাত তুলে পাশের দরজাটা দেখিয়ে নিজেরটা বন্ধ করে দিলেন। টিটো তাকাল। দরজার ওপর লেখা এস কে ভার্মা। তার মানে এটি শ্রীদেবীর নিজের ফ্ল্যাট নয়। টিটো ভার্মার ফ্ল্যাটের দরজায় শব্দ করল। দ্বিতীয়বার আওয়াজ এল, 'কে ওখানে? কৌন হ্যায়?' দরজা একই কায়দায় ঈষৎ ফাঁক।

'আমি টিটো।'

একটু চুপচাপ। যে জিজ্ঞাসা করেছিল সে বোধহয় অনুমতি আনতে গেল।

|কটু বাদে ফিরে এসে দরজা খুলল সে, 'বসুন, মেমসাহেব এখনই আসছেন।'

ইনভার্টারের সাহায্যে আলো-পাখার কাজ হচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্র বেশ মাটা মোটা, পুরনো। টিটো সোফায় বসে উসখুশ করছিল। এই সময় তমা রে এলেন। একেবারে সিনেমার নায়িকার মত সাজ। একেবারে উল্টোদিকের সাফায় এসে বসে তমা প্রশ্ন করলেন, 'বাদলবাবুকে ফোন করা হয়েছিল? াফাই গাইতে?'

'না। ঠিক তা নয়।' টিটো মনে মনে বাদলের মুণ্ডুপাত করল।

'আপনার সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক কি?'

'আমি বাদলদা বলি।'

'সম্পর্কটা কি? বাইরের লোক মতলব ছাড়া ওর সঙ্গে সঙ্গত করে না।'

সঙ্গত শব্দটা শুনে তমার মুখের দিকে তাকাল টিটো। ব্যাপারটা কি? সে প করে আছে দেখে তমা আবার বললেন, 'বাদল নিজের ফ্ল্যাটে কাউকে রাখে া। ওই ফ্ল্যাটের খবর ওর বউ পর্যন্ত জানে না। কি উপকার করেছেন ওর?'

এবার টিটো হাসল, 'বাদলদা নিশ্চয়ই কিছু বলেছেন।'

'তা বলেছে। সেসব যে সত্যি নয়, তা আমি জানি।'

'কি বলেছেন?'

'আপনি কি একটা পলিটিক্যাল ঝামেলায় ফেঁসে আছেন তাই কিছুদিন ওখানে থাকতে দিতে হচ্ছে। আপনার সঙ্গ আমি যেন এড়িয়ে চলি। খুব দ্রলোক আপনি।'

'বাঃ। তাহলে আপনি আমাকে ডাকলেন কেন?'

'বাদলের কথা পুরো বিশ্বাস করিনি, তাই।'

টিটো পকেটে হাত দিল, 'এখানে সিগারেট খেতে পারি?'

'পারেন। তবে আপনার সিগারেট নয়।' টেবিলের নিচের র‍্যাক থেকে কটা বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন তমা, 'নিন।'

'কি ব্যাপার?' টিটো অবাক।

'আপনার সিগারেটের টুকরো ফেলে দিতে ভুলে যেতে পারি।'

'থাকলে কি হয়েছে?'

'এই ফ্ল্যাট যাঁর তিনি পছন্দ করবেন না। এখানে বাইরের লোকের আসা যেধ আছে। আপনি যেমন দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে অন্যায় করেছেন।'

সিগারেট ধরাতে ধরাতে টিটো বলল, 'বাদলদা একথাও বলেছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাকে আসতে বললেন কেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমার একজন বিশ্বাসী মানুষ চাই।'

'কি জন্যে?'

'সেটা এখন বলব না।'

'দেখুন, আমাকে দিয়ে কিছু করাতে হলে মাল ছাড়তে হবে।' টিটো ইচ্ছে করে নিজের ভাষায় কথাগুলো বলল।

'নিশ্চয়ই। মাগনা আপনাকে খাটাবো কেন? আচ্ছা, আপনি কি কাউকে খুনটুন করেছেন? বাদলের কোন শত্রুকে?' হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন তমা

চমকে উঠল টিটো। শালি তো বহুৎ হারামি। গন্ধ পায় নাকি? সে কাঁধ ঝাঁকালো। তমা বললেন, 'দেখুন, আমি একা থাকি। দারুণ ভাবে থাকি মাঝমধ্যে মডেলিং করেছি বটে কিন্তু তা থেকে পেট ভরত না। আমি জীবনটাকে দেখেছি। আমার কাছে চেপে গিয়ে কোন লাভ হবে না আপনার। যখন স্টুডিওতে অ্যাটাচড্ ছিলাম, ভাল মেয়ে ছিলাম, তখন বাদল আমাকে ... বুঝতেই পারছেন। ওর জ্বালায় পাড়ায় খুব বদনাম হয়ে যায় আমার। ভবানীপুরের মধ্যবিত্ত এলাকার বাবামায়ের সঙ্গে থাকতাম। তখন কত বলেছি একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিতে কিন্তু উনি তখন গৌরাঙ্গ সেজে বলেছেন কোথায় ফ্ল্যাট পাব আমি? আমার পয়সা কোথায়? এই ভার্মার সঙ্গে বাদলই আমাকে আলাপ করিয়ে দেয়। আজ সেই লুকোনো ফ্ল্যাটে আপনাকে যখন রাখতে হচ্ছে তখন ডালমে বহুৎ কালা হ্যায় জনাব।' তমা হেসে উঠলেন।

এই সময় আনন্দের আওয়াজ, আনন্দের আওয়াজ ছড়িয়ে আলো ফিরে এল। তমা গলা তুলে বললেন, 'লছমি, ইনভার্টার অফ করে দাও।' আর তখনই সজোরে বেল বেজে উঠল। কপালে ভাঁজ ফেলে তমা এগিয়ে গিয়ে দরজার গর্তে চোখ রাখলেন। তারপর নিঃশব্দে প্রায় লাফিয়েই চলে এলেন কাছে। একটা আঙুল ঠোঁটে চেপে টিটোর হাত অন্য হাতে ধরে টেনে নিয়ে আসতে লাগলেন ভেতরের ঘরে। একেবারে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এসে দ্রুত নি ফেলতে ফেলতে বললেন, 'ভার্মা এসেছে। ও যেন জানতে না পারে আপনি এখানে আছেন। ও এই ঘরে এমনিতে আসে না। যদি আসে ওয়ার্ডরোবটায় ঢুকে যাবেন। প্লিজ।' এইবার দ্বিতীয় দফায় বেল বাজল।

টিটোর পা কাঁপছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অন্য দরজা নেই?'

'না।'

'কিন্তু লছমি?'

'ও আমার লোক।' প্রায় ছিটকে চলে গেলেন তমা।

ঘর অন্ধকার। হঠাৎ টিটোর খেয়াল হল সিগারেটটা তার হাতেই ধরা আছে। চটপট নিভিয়ে ফেলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিল সে। ওদিকে দরজা খুলেছেন তমা কারণ পুরুষকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে নিচে উঁকি মারতেই একটা কার্নিশ দেখতে পেল টিটো। বেশি নিচে নয়। প্রয়োজন বুঝলে নেমে পড়তে পারবে। বাইরের ঘরে কথাবার্তা চলছে। কিন্তু পুরুষের গলা একটা নয়। হাসছে আর একজন। খুব কৌতূহল হল। পা টিপে টিটো চলে গেল বাইরের ঘরে ঢোকার দরজার পাশে। তমার পাশে একজন বসে আছে। ষাট বছর তো বয়স হবেই। উল্টোদিকের লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সেই লোকটা বলল, 'ভার্মাসাহেব খুব লাকি লোক, আপনার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। হেঁ হেঁ।

তমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন?'

তমার পাশের লোকটাই ভার্মা, বলল, 'স্কচ দাও। আমাদের জরুরী কথা আছে। সেন বাইরে বসতে চাইছিল আমিই নিয়ে এলাম।'

তমা হেসে উঠে গেলেন। সেন নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এর সামনে বলবেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো ভার্মা, 'ডানাকাটা চিড়িয়া উড়তে পারে না সেনসাহেব।'

সেনসাহেব বলল, 'তাহলে তো কোন প্রব্লেম নেই। বলুন কি করতে হবে?'

'একটু চোখ বন্ধ করে থাকুন।'

'আপনার ব্যাপার হলে আমি তো অন্ধ।'

'সে আমি জানি। কিন্তু আমি অন্য ব্যাপার বলছি। আপনাকে লোকে এখনও তরুণতুর্কি নেতা বলে। বয়স যে বেড়ে গেছে সেই খেয়াল তো কারো নেই।' ভার্মা গম্ভীর গলায় বলল।

সেনসাহেব হাসল, 'ওইটে আমার অ্যাডভান্টেজ। তবে তার জন্যে এখনও মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে ঢিল ছুঁড়তে হয়। খবরের কাগজের নিউজ হয়ে না থাকতে পারলে শেষ হয়ে যাব।'

'তা হোন কিন্তু আপনার বেশ বদনাম হয়ে যাচ্ছে। এটা পাবলিক জানুক তা আমি চাই না।'

'কি রকম বদনাম? রগচটা? আই মিন রাগী?'

'না। আপনার কাছে দশজন ব্যবসায়ী আসে একটু তাদের হয়ে তদ্বির ক
দিতে। আপনি প্রত্যেকের কাছে দিল্লি যাওয়ার জন্যে আপ-ডাউন প্লেনের ভা
নেন। কাজ করেন দু-একজনের।'

'আশ্চর্য! দিল্লি কি আমার হুকুমের চাকর যে বললেই কাজ হয়ে যাবে ?

'সেটা ঠিক কথা। কিন্তু দিল্লি যেতে তো দশটা টিকিট লাগে না।'

'ভার্মাসাহেব, এসব একদম আমার পার্সোন্যাল ব্যাপার।'

'আমার সঙ্গে কাজ করতে হলে এটাও আমাকে দেখতে হবে। পার্টি
আপনার পজিশন খারাপ হলে আমি আপনার সঙ্গে থাকব কেন? নিন, স্কা
খান।' হাত বাড়াল ভার্মা। তমা এসে দাঁড়িয়েছে লছমিকে নিয়ে। লছমি
নামিয়ে দিয়ে গেল। তাতে দুটো গ্লাস, জলের বোতল, হুইস্কি আর কাজুর বাটি

সেন একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ভার্মা নিজেই হুইস্কি ঢালল দুটো গ্লাসে
একটা সেনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'কবে থেকে স্ট্রাইক ডাকছেন?'

'যেদিন বলবেন?'

'সামনের সোমবার?'

'হতে পারে। তার আগে আপনার লোককে বলবেন খারাপ ব্যবহার করতে

'দূর। খারাপ ব্যবহার করলে স্ট্রাইক হয় না। মারপিট হয়। আপনার ইউনিয়নে
একটা লোকের নাম করুন যাকে খুন করতে পারলে স্ট্রাইক না ডেকে উপা
থাকবে না। বেশ জবরদস্ত একজন। অন্তত দিন সাতেক স্ট্রাইক চলে, সে
দেখবেন।'

'ব্যানার্জি। অসিত ব্যানার্জি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। ওর
আমার সঙ্গে ইদানীং বনছে না।' সেন চুমুক দিল।

'কোথায় থাকে?'

'ডায়মন্ডহারবার রোডে। সেভেন এ বাই ফাইভ ডায়মন্ডহারবার রোড
ঠিকানাটা মনে আছে কারণ গতকাল ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

'গুড। কালই খুন হয়ে যাবে। পরশু সোমবার, সেদিন থেকে স্ট্রাইক।'

'আমি কি পাচ্ছি?'

'দু'লাখ।' ভার্মা নিচু গলায় বললেন।

'ইম্প্সিব্ল্। এর আগের বার অনেক কমে কাজ করে দিয়েছিলাম। এবা
অ্যামাউন্টটা বাড়াতে হবে। সামনেই ইলেকশন আসছে, প্রচুর খরচ।' সেন মা

াড়তে লাগলেন।

ঠোঁট কামড়ালেন ভার্মা সাহেব, 'ঠিক আছে। সাতদিনে আমার ঘরে কোটি াকা আসবে না। তবু ওটা আড়াই করলাম। আর বার্গেন করবেন না। কারণ ুন করাতেও ভাল খরচ আছে। আপনি জানেন ব্যানার্জিকে যে খুন করবে াকেও সরাতে হবে।'

'কাকে ভার দিচ্ছেন?'

'সেটা আপনাকে জানাবো না।'

'আমার লোক আছে, অনেক কমে হয়ে যাবে।'

'মাপ করবেন। এই ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

এই সময় তমার গলা শুনতে পেল টিটো, 'খুব সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে াকি?'

ভার্মা সাহেব বললেন, 'তোমার কাছে কিছুই লুকোনো নেই ডার্লিং। সেনসাহেব ইলেকশনে দাঁড়াবেন, সেই ব্যাপারে কথা বলছি।'

'বাদলবাবু তো এবার কনটেস্ট করছেন, তাই না?' তমার গলা।

'বাদল? চেনেন নাকি ওকে?' সেনসাহেবের গলা অন্যরকম লাগল।

ভার্মা সাহেব বলে উঠলেন, 'না না। একদিন আমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।'

'শুয়োরের বাচ্চা। আমার বিরোধী গ্রুপ। সবসময় আমাকে ফাঁসাতে চায়।'

'উনি তো আপনাদের পার্টির লোক, তাই না?'

'হ্যাঁ। এবার নমিনেশন পেতো না। দিল্লিকে ম্যানেজ করেছে।'

ভার্মা সাহেব বললেন, 'ও তমা, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। সেনসাহেব, আমাকে এক মিনিট ক্ষমা করবেন।' ওঁকে উঠতে দেখে টিটো চট করে দরজা ছেড়ে ঘরে চলে এল। কোথায় লুকোনো যায়? ওয়াড্রোবের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে টেনে দিল। ভার্মার গলা এখন একেবারে সামনে, তবে স্বর খুব ', 'তুমি বাদলের নাম এর কাছে করলে কেন? এক পার্টি হলেও আদায় । বাদলের স্মৃতি তুমি কি এখনও ভুলতে পারছ না?'

'দূর! কবে ভুলে গিয়েছি।' তমা হাসলেন। 'বাদল হালদার বলে একটা খুন করাতে চেয়েছিল। ওর অ্যাম্বিশন খুব বেড়ে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে াগাযোগ করে?'

'একদম না।'

'তোমাকে আমি সব দিয়েছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বেইমানি করবে না।' সামনের সোমবার কাঠমাণ্ডু যাব। তৈরি থেকো।'

'কেন? হঠাৎ?'

'এখানে স্ট্রাইক চলবে। সাপ্লাই বন্ধ থাকবে। তখন আমার এখানে থাকা ঠিক নয়। লেবার মিনিস্টার ডেকে পাঠাবে আমাকে। চল, ওঘরে চল।'

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। কিন্তু টিটো ওয়াড্রোব থেকে বের হল না। তমা ভার্মা সাহেবের রক্ষিতা। ভার্মা সাহেবের সঙ্গে বাদলদার খিচ আছে। তমা কি দুই গাছের ফল খাচ্ছে? কে জানে। কিন্তু ভার্মা আর সেন বহুৎ হারামি লোক। ফালতু একটা মানুষকে খুন করবে। লোকটার নাম অসিত ব্যানার্জি। লোকটা মরার আগে জানবেও না কেন খুন হল।

ঘণ্টা ছয়েক বাদে ভার্মারা বিদায় নিলে তমা চলে এল এই ঘরে। টিটো বলল, 'এবার আমি যাব। আর পারছি না।'

'সরি।' তমা মুখ নামাল, 'বুঝতেই পারছেন আমাকে কেন সব সহ্য করতে হচ্ছে!'

'পারছি। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করে এই জীবন মেনে নিয়েছেন।'

'ইচ্ছে করে।' তমা হাসল, 'বাইরে থেকে তাই মনে হবে। আমার বাড়ির লোকজন এখন রাজার হালে থাকে ভার্মার টাকায়। মডেলিং করে আমি যদি তাদের ডাল ভাতের ব্যবস্থা করি তাহলে ওরা আমাকে গালাগাল দেবে আজ।'

'প্রথম থেকেই যদি ডাল ভাত খাওয়াতেন তাহলে দিত না।'

'তাই? তাহলে বাদলদার কথায় হালদারকে আপনি খুন করতে গেলেন কেন? আমি যদি রক্ষিতা হই আপনি ভাড়াটে গুণ্ডা। আমি করছি নিজের মানুষদের ভাল রাখতে, আপনি কেন করছেন?' ফুঁসে উঠল তমা।

'টাকার দরকার ছিল। আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী প্রচণ্ড অসুস্থ। মানুষটার অপারেশনের জন্যে টাকা দরকার। লোকটাকে আমি বাবা ব

'আপনার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মানে?'

'তিনি তিনটে বিয়ে করেছেন। প্রথম পক্ষের সন্তান আমি।'

'যিনি আপনার নিজের বাবা নন তাঁর জন্যে এই ঝুঁকি নিলেন?'

'নিজের-পরের বুঝি না, লোকটা আমায় ভালবাসত, তাই করেছি।'

'কেউ ভালবাসলে তার জন্যে আপনি সব কাজ করতে পারেন?'

'আপনি কিন্তু বেলাইনে কথা বলছেন।'

তমাকে একটু উদাস দেখাল। তারপর বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কোথাও যেন মিল আছে। আপনার বাবা টাকা পেয়েছেন?'

'না। পৌঁছে দিতে পারিনি। সেই ঘটনার পরই চোরের মত লুকিয়ে আছি। শুনেছি আমার ছবি বেরিয়েছে কাগজে, পুলিশ আমাকে খুঁজছে।' টিটো বলল।

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'কেন? আপনি টাকাটা পৌঁছে দেবেন?'

'যদি দিই? বিশ্বাস হচ্ছে না? কত টাকা?'

'পাঁচ হাজার।'

'বেশ। ঠিকানাটা দিন। কাল সকালে পেয়ে যাবেন উনি। টাকা পেয়েছেন, এই কথাটা কাগজে লিখে দিলে সেটা দেখে না হয় আপনি আমাকে দেবেন।'

'এত ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন?'

'একটা ভাল কাজ করছি, এই আনন্দে।'

'বেশ। মনে হয় কাল দুপুর পর্যন্ত ওই ফ্ল্যাটেই থাকব। চলে আসবেন। আমি এখন চলি।' টিটো বাইরের ঘরে চলে এসে ঘুরে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, মনে পড়ল, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন?'

তমা হাসল, 'এমনি।' তারপর একটা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিল। ঠিকানাটা দ্রুত লিখে দিয়ে টিটো আর দাঁড়াল না। মহিলাটিকে সে বুঝতে পারছে না। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল নিচে। কে দেখছে, কে দেখছে তার কেয়ার করল না। ধীরে সুস্থে গেট দিয়ে বেরিয়ে সে একটা ট্যাক্সি খুঁজতে পেয়ে তাতে উঠে বসল, 'ডায়মন্ডহারবার রোড।'

'এত রাত্রে ওদিকে যাবো না দাদা।' ট্যাক্সিওয়ালা আপত্তি করল।

'যাব আর আসব। পাঁচ মিনিট থাকব ওখানে।'

'তাহলে ঠিক আছে।' ট্যাক্সি চালু হল।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল টিটো। দু'পাশে কলকাতা ছুটে যাচ্ছে। যেন অনেকদিন সে শহরটাকে দ্যাখেনি। তমা কাল বাবার কাছে টাকাটা পৌঁছে দিলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। প্রশ্নট্রশ্ন করবেন অনেক। হয়তো ডাঁট দেখাতে এক্স ওয়াইফকে ফোন করে ছেলের প্রশংসা করবেন। কিন্তু তমা কাজটা করছে কেন? এই কলকাতায় কেউ ধান্দাবাজি ছাড়া অন্য কিছু করে না।

উত্তরটা পাচ্ছিল না টিটো। মাঝেরহাট ব্রিজ পার হয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা

করল, 'কোনখানে যাবেন দাদা?'

'সেভেন এ বাই ফাইভে।'

নাম্বার খুঁজে খুঁজে যখন বাড়িটার সামনে টিটো পৌঁছল তখন এ নিশুতি রাত। শুধু একটা সিগারেটের দোকান খোলা। ভাড়াটে বা দোকানদারের কাছে সে জেনে এসেছে অসিত ব্যানার্জি থাকে তিনতলা গেটে তালা চাবি নেই। তিনতলায় উঠে বেল বাজাল টিটো। দ্বিতীয়বারে স পাওয়া গেল। দরজা খুললেন এক বৃদ্ধ, 'কি ব্যাপার? এত রাত্রে কি দরকার

'অসিতবাবু আছেন?'

'ঘুমচ্ছে। ইউনিয়নের ব্যাপার হলে কাল সকালে আসবেন।'

'তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে।'

'আশ্চর্য! একটা লোককে এরা ঘুমতেও দেবে না।' বৃদ্ধ আবার দর ভেজিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। টিটো মাথা নাড়ল, কাল চিরকালের জ ঘুমতে হবে যে।

'কে?' দরজা খুলল খালি গা লুঙ্গি পরা মধ্যবয়সী মানুষ। পেছনে সদ্য থেকে ওঠা এক রোগা মহিলা।

'অসিত ব্যানার্জি?'

'আমি। আপনাকে চিনলাম না?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না। ভেতরে এসে কথা বলতে চাই।'

'কি ব্যাপার বলুন তো? কোথায় দেখেছি আপনাকে?'

'জানি না। জরুরী কথা আছে।'

'আসুন।' বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিল অসিত। ধুপ করে বসে পড়ল টি তার একটায়। কিভাবে শুরু করা যায়? সে রুমালে মুখ মুছল। তারপর ব 'অসিতবাবু, আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আপনার খুব বিপদ। আগামীব আপনাকে খুন করার একটা প্ল্যান করা হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার গলা থেকে আর্তনাদ ছিটকে বের হল। অ বলল, 'মানে? আপনি কে? কে খুন করবে আমাকে?'

আপনাকে খুন করলে কার লাভ হবে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' অসিত হতভম্ভ।

'আপনি খুন হলে স্ট্রাইক ডাকা হবে?'

'জানি না।'

'হ্যাঁ, হবে। আপনি কোথায় কাজ করেন, কোন ইউনিয়ন তা আমি জানি না। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় স্থির হয়েছে আপনাকে খুন করে অন্তত সাতদিন স্ট্রাইক চালানো হবে। ইউনিয়নে আপনার ইনফ্লুয়েন্স আছে।'

'আপনি কে?' অসিতের গলা এবার সন্দিগ্ধ।'

'আমি এই প্ল্যানটা জানতে পেরেছি।'

'আমাকে খবরটা দিতে এসেছেন কেন?'

মনে হল দেওয়া উচিত তাই।'

'আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন।'

'আমাকে থানায় নিয়ে গেলে আপনি বাঁচবেন? ওরা তো খুন করবেই।'

'এই ওরা কারা?'

'সেনসাহেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খারাপ?'

'সেন? সেন আপনাকে পাঠিয়েছে?'

'একদম না। আমার সঙ্গে ওর আলাপ নেই।'

'সেন আমাকে খুন করাবে?'

'না। তবে তিনি আপনার নাম সাজেস্ট করেছেন।'

অসিত এবার ভদ্রমহিলার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ইউনিয়নের অন্য সবাইকে খবর দেওয়া দরকার।'

'এই ভুলটা আপনি একদম করবেন না। খবর দেবেন অন্য কাউকে দিয়ে। আপনি পারলে আজ রাত্রেই এ বাড়ি ছেড়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যান। দিন সাতেক থাকুন ওখানে। এর মধ্যে ইউনিয়নকে কারো মাধ্যমে সব জানান। আপনাদের কোম্পানিতে স্ট্রাইক হলে ভার্মা সাহেবের প্রচুর লাভ হবে। সেটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন। আচ্ছা, আজ আমি আসছি।' টিটো উঠে দাঁড়াতেই মহিলা দৌড়ে কাছে এলেন, 'ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তাহলে আপনি যে উপকার করলেন তা আমি কোনদিন ভুলব না। আপনার নামটা জানতে পারি?'

'দিদি, নাম জেনে কিছু লাভ নেই। ওঁকে বাঁচান।' টিটো হনহনিয়ে নেমে এল নিচে। শুনসান চারধার, ট্যাক্সিতে উঠতেই সেটা চলতে শুরু করল।

বড় রাস্তায় ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সে বাকি পথ হেঁটে এল। তমাদের গেট পার হয়ে বাদলদার ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে এগোতেই মনে পড়ল দারোয়ানদের

কথা। সে পাঁচিল ডিঙোল। পেছনের এই প্যাসেজটা দিয়ে লিফটের কাছে পৌঁছানো যায়। টিটো নিঃশব্দে চলে এল। লিফট চালু করে সোজা বাদলদার ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল সে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে। বাদলদা। হারামিটা নিশ্চয়ই এর আগেও তাকে খুঁজেছে। সে রিসিভার তুলল কিন্তু সাড়া দিল না।

বাদলদার গলা, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'ঘুমচ্ছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। এর আগে বার বার ফোন বেজে গেছে।'

'শুনতে পাইনি।'

'মালের বোতলে হাত দাওনি তো?'

'কালকেরটাই শেষ হয়নি।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'বললাম তো, ঘুমচ্ছিলাম।' টিটো হাসল, 'কোথায় নিয়ে যাবেন যেন বলেছিলেন।'

'যাব। তবে তার আগে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ? সেই হালদারের ব্যাপার?'

'না। দরকার হবে না ওটা। আজ অপারেশন হয়েছে। বেঁচে যাবে হালদার। তবে ওর ব্রেন আর কখনই কাজ করবে না। কোনদিন মুখ খুলতে পারবে না।'

'এটা কি আপনি করলেন?'

যা বলছি তাই শোন। তুমি কাল সারাদিন উল্টোদিকে সেই মেয়েটার ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মেয়েটা তোমাকে ইশারা করা মাত্র বেরিয়ে যাবে। কাউকে কেয়ার করবে না। অবশ্য বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় অ্যালার্ট থাকবে, যাতে কেউ না বুঝতে পারে আমার ফ্ল্যাট থেকে বের হচ্ছ। সোজা মেয়েটার ফ্ল্যাটে পৌঁছে বেল টিপবে। দরজা খুলে দিলে একটা মাঝবয়সী লোককে ঘরে দেখতে পেলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। লোকটাকে এমন ভাবে মারবে যাতে ঠ্যাঙ ভেঙে যায় এবং ওই বাড়ি থেকে হেঁটে না বের হতে পারে। কাজটা হয়ে যাওয়ামাত্র ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে যাবে শিয়ালদা স্টেশনে।'

'শিয়ালদা গেলে আমাকে অনেকে চিনে ফেলবে। তাছাড়া কখন মেয়েটা ইশারা করবে তা তো জানি না।'

'যখনই করুক, দেখামাত্র আমাকে ফোন করবে। আমি বলে দেব কোথায়

যেতে হবে।'

'শুনলাম। মেয়েটার সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'তাতে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। গুড নাইট।' লাইন কেটে দিল বাদলদা।

টিটো জানলায় গেল। তমার ফ্ল্যাট অন্ধকার। ব্যাপারটা কি? ভার্মা চলে যাওয়ার পর তমার সঙ্গে বাদলদার যোগাযোগ হয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু কে আসছে কাল ওই ফ্ল্যাটে? কাকে মারতে হবে? ঠ্যাঙ ভাঙার কথা বলল মানে লোকটা ওই ফ্ল্যাটেই পড়ে থাকুক বাদলদা চাইছে। কি হবে তাতে?

মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না টিটো। সে মদের বোতল খুলল। বিলিতি মদ। আঃ, অমৃত। পরপর তিন পাত্র খেয়ে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মোমবাতি জ্বেলে টেলিফোনের মোটা বইটা নিয়ে বসল। ভার্মা। ভার্মার পাতা বের করে দরজার গায়ে লেখা নামটাকে খুঁজল। অনেকগুলো রয়েছে। হ্যাঁ এই তো পাশের রাস্তা। এই রাস্তায় দ্বিতীয় ভার্মা নেই। সে নাম্বার ঘোরালো। তৎক্ষণাৎ টেলিফোন বাজতে লাগল ওদিকে। একটু বাদেই রিসিভার তোলার শব্দ, 'হ্যালো।' তমার গলা।

'আমি টিটো বলছি।'

'সরি। রঙ নাম্বার।' লাইনটা কেটে গেল।

ব্যাপারটা কি হল? 'না একটুও ভুল হয়নি। গলাটা নিশ্চয়ই তমার। তাহলে রঙ নাম্বার বলল কেন? শুনতে ভুল করেছে?' চতুর্থ পেগ গ্লাসে ঢালল টিটো তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। আবার ডায়াল করতে রিঙ হল। তমার গলা. 'হেলো।'

'রঙ নাম্বার বললেন কেন? চিনতে পারছেন না?'

'আপনাকে তখনই তো বললাম রঙ নাম্বার। কেন বিরক্ত করছেন।' তম রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই একটি পুরুষকণ্ঠ কানে এল টিটোর। জড়ানে গলা।

'শালা!' হুইস্কিতে চুমুক দিল টিটো। ঘরে বাবু আছে। পুরো দু-নম্বরী মেয়েছেলে। ভার্মাকে কাটিয়ে দিয়ে আর একজনকে ঢুকিয়েছে। আবার বলছে কেন বিরক্ত করছেন? ছেনালি । শালা হাজারবার বিরক্ত করব। নেশ অক্টোপাশের মত শুঁড় বাড়াচ্ছে। আজ পেটে কিছু নেই। বিদেশি মদে তাই রাগ বেশ জমছিল।

ওপাশে রিঙ হচ্ছে। রিসিভার উঠল, 'দাঁড়াও। আমি ধরছি। আমি না হলে এদের টাইট করতে পারবে না।' জড়ানো গলায় কেউ কথাগুলো বলে চেঁচিয়ে উঠল, 'হেলো! কত নম্বর চাই?'

'তুই কে বে?' হাসল টিটো।

'মানে? কে বলছ?'

'তোর বাপ।'

'এ কে মাইরি? আমার বাপ বলছে। আমার বাপ তো মরে গেছে, তাই না তমা?'

তমার গলা শোনা গেল. 'রেখে দিন না।'

'দাঁড়াও না। ইন্টারেস্টিং। বাপের নাম কি?'

'খগেন!'

'খগেন? কি চাই ভাই?'

'আপনি কে?'

'আমি এই ফ্ল্যাটের মালিক? তোমার কি চাই?'

এতক্ষণে ভার্মার গলা চিনতে পারলো টিটো। হেসে বলল, 'সেন।'

'সেন! অ্যাঁ। সেনসাহেব? আমার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলছেন? আমার টাকায় ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমায় বুদ্ধু বানাচ্ছেন?'

'ও আপনি? কি করে বুঝব যে আবার ফিরে গেছেন।'

'তাই বলুন। কি ব্যাপার? তমার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ভাগ্যবান লোক আপনি।'

'না না, আপত্তি কেন হবে? অ্যাই তমা, সেনসাহেব।'

এবার তমার গলা পাওয়া গেল, 'হেলো।'

টিটো ঠোঁট কামড়ালো। তারপর বলল, 'আপনি মাইরি বাজারের মেয়ের চেয়ে বহুৎগুণ খারাপ। ফালতু ভাল সাজার ন্যাকামি করেন কেন? অ্যাঁ?' রিসিভার রেখে দিল সে।

সকাল হতেই বিশ্রী স্বাদ এবং সেইসঙ্গে রগের কাছটায় ঈষৎ যন্ত্রণা নিয়ে চোখ মেলল টিটো। দু-একবার দিশি মদ খেয়ে তার এই অবস্থা হয়েছে। মনে পড়ল, রাত্রে কিছুই খাওয়া হয়নি। খালি পেটে মদ খেলে এমন তো হবেই। এই ফ্ল্যাটে কোন ওষুধ নেই। বিশ্রী লাগছিল টিটোর। এরকম জীবন ভদ্রলোকের হয়?

কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষ কেমন ভদ্রলোকের জীবন যাপন করে। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে বাজার যায়। কাগজ পড়ে। স্নান খাওয়া সেরে দশটার সময় অফিসে বের হয়। ট্রামবাসে ঝগড়াঝাটি করে দেরিতে অফিসে পৌঁছে যানবাহনের কৈফিয়ত দেয়। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ি ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে টিভির সামনে বসে রাত্রের খাবার না খাওয়া পর্যন্ত। এইভাবে দিন চলে যায়। দিনের পর দিন। সে কেন এরকম ভদ্রলোক হল না? সে জানে এর জন্যে দায়ী প্রথমে মা পরে দ্বিতীয় বাবা। ছেলেবেলায় ঝি-এর কাছে থাকতে হত। মা-বাবা রোজ পার্টি করতে যেত। শেষ পর্যন্ত মা একাই। খুব রাগ হত তখন। আর পাঁচটা বাবা-মায়ের সঙ্গে তার মা এবং ওই বাবার কোন মিল ছিল না। মা আলাদা হয়ে চলে গেলে সেই রাগে বাবার কাছেই থেকে গিয়েছিল। আর এই বাবাটা তখন খুব মাল খেত। সে কি করছে তা দেখার প্রয়োজনই মনে করত না। তবে একটা কথা ঠিক, মেয়েছেলের দোষ ছিল না বাবার। মায়ের এই পক্ষে কোন বাচ্চাও হয়নি। শেষের দিকে তার সামনেই যখন ঝগড়া হত তখন মা বাবাকে নপুংশক বলেছিল।

টিটো রান্নাঘরে ঢুকে জল বসিয়ে দিল গ্যাসে। বাবা বলত ইংলন্ড আমেরিকায় নাকি প্রত্যেকে নিজের কাজ করে। রান্না থেকে বাসনমাজা পর্যন্ত। নো সার্ভেন্ট। সে যেন এখন আমেরিকায় আছে, থোড়। বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হবার পর সে আয়নায় নিজেকে দেখল। দাড়ি আরও বেড়েছে। একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। আর একটু বড় হলে কেউ চিনতেই পারবে না। বাঁচা যায়।

সে চা বানিয়ে জানলায় এল। তখনই গতরাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। তমার জানলা এখন বন্ধ। বাদলদা বলেছে সারাদিন ওয়াচ করতে। তমা ইশারা করলেই বাদলদাকে টেলিফোন করতে হবে। খিস্তি দিলো মনে মনে টিটো। ওসব ধান্ধায় আর সে নেই। ওই গায়ে পড়ে মারপিট করা তার দ্বারা হবে না। তমার কথা মনে আসতেই এক ধরনের জ্বালা এল মনে। তার সঙ্গে কত ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা, অথচ ভার্মাকে নিয়ে রাত কাটিয়েছে। ভার্মা ওকে বলেছে বেইমানি না করতে কিন্তু শোনেনি তমা। বেইমানি না করলে কি করে ওই ইনস্ট্রাকশন দিল? নিশ্চয়ই রেগুলার যোগাযোগ আছে।

একটা কাজ পেলে হত। অসিত ব্যানার্জির খবরটা। দূর! কি আনসান ভাবছে সে। অসিত ছবি হয়ে গেলে সেটা কালকের কাগজে ছাপা হবে। অসিত কি তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনবে! অসিতের স্ত্রীর মুখ মনে পড়ে গেল। প্রচণ্ড

ভয় পেয়ে গিয়েছেন ভদ্রমহিলা। ওঁর জন্যেই ইচ্ছে না থাকলেও অসিতকে বাড়ি ছাড়তে হবে। যদি ছাড়ে তো লোকটা বেঁচে গেল। অর্থাৎ আর একটা লোককে বাঁচাল সে। একটা কেন, হালদারকেও তো বাঁচিয়েছে সে। দুটো মানুষ, দুটো ফ্যামিলিব উপকার করেছে। জীবনে যত পাপই করুক এই দুটো ভাল কাজের কি কোন দাম পাবে না?

সেনসাহেব, বাদলদা, ভার্মারা হল মুখোশ পরা মানুষ। পাবলিক এদের মুখের চেহারা কোনদিন চিনবে না। তাদের ঝুল দিয়ে মাল কামিয়ে যাবে এরা। টিটোর ইচ্ছে করছিল এইরকম সব ক'টা লোককে খুন করে। ওরা মরলে পাঁচ পাবলিকের উপকার হবে।

ঠিক আটটার সময় বেল বাজল। বেলের শব্দটা কানে আসলেই বুকের খাঁচার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। কে এল? যে-ই আসুক সে নেই। দরজা খোলার প্রশ্নও নেই। দ্বিতীয়বার বেল বাজতে সে নিঃশব্দে কি-হোলের কাছে পৌঁছে গেল।

বাইরে শাড়ি। মুখ দেখা যাচ্ছে না। তমা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। মেয়েটা এখন বের হল কি করে? ভার্মা চলে গেছে এর মধ্যে? খুলবে না বলে চলে আসছিল সে এই সময় তৃতীয়বার বেল বাজল। টিটোর এবার মনে হল কাল রাতে যা টেলিফোনে বলেছে, তা সামনাসামনিও বলা দরকার। সে দরজা খুলে দেখল তমা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। কথা বলার আগেই তমা ঘরে ঢুকল. ঢুকে জোর করেই দরজা বন্ধ করে দিল।

'কি ব্যাপার?' টিটো এক পা পিছিয়ে গেল।

'আপনার বাবার কাছে গিয়েছিলাম।'

অবাক হয়ে গেল টিটো, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ, ফ্ল্যাটের দরজা তালা বন্ধ।'

'সে কি! সকালে বাবা কোথাও যায় না।'

'আপনার মায়ের বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

'কেন?'

'শুনুন, আপনাদের বাড়ির নিচে একটা পানের দোকান আছে। দোকানদারের নাম গোবিন্দ। সে বলল, আপনার বাবা খুব অসুস্থ ছিল। কাল সন্ধ্যেবেলায় আপনার মা এসে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে তাঁকে নিয়ে গেছেন। কোন হাসপাতাল গোবিন্দ বলতে পারল না।' গোবিন্দর নাম শুনে টিটোর বিশ্বাস

কথাটা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা নিয়ে গেছে আমি বিশ্বাস করি না। 'দু'জনের খুব খারাপ সম্পর্ক।'

'জানি না। গোবিন্দ তো আপনার মাকে চেনে। একটা ফোন করে দেখুন না।' তমার কথা শেষ হতেই টিটো সোজা চলে এল ফোনের কাছে। নাম্বার ঘোরাতেই এক ভদ্রলোকের গলা, 'হেল্লো!' টিটো গম্ভীর গলায় বলল, 'মিসেস গাঙ্গুলি আছেন?'

'আপনি কে বলছেন তা জানতে পারি কি।'

'ওঁর অফিস থেকে বলছি।' নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল টিটো।

মিনিট দুয়েক বাদে মায়ের গলা পাওয়া গেল 'হেলো।'

'মা, আমি। তুমি কি বাবাকে হসপিটালাইজ করেছ?'

'হ্যাঁ। ইটস অলরেডি লেট। অপারেশন করাটা জরুরী।'

'তুমি যে ডিসিসন চেঞ্জ করলে?'

'কোন চেঞ্জ করিনি। তোমার সঙ্গে কথা বলার পর কৌতূহল হয়েছিল শুধু। মানুষ একটা পোষা কুকুরের জন্যেও কত কিছু করে।'

'কোন্ হাসপাতালে আছে?'

'পি জি-তে। এই কাজটা তোমার করা উচিত ছিল। রাখছি।' টেলিফোন নামিয়ে টিটো দেখল তমা তার দিকে তাকিয়ে আছে, একদৃষ্টিতে। সে অস্বস্তি এড়াতে এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে একটা মুখে দিল। 'কি বললেন? আমার কথা কি মিথ্যে মনে হচ্ছে?' তমার গলায় ঈষৎ ব্যঙ্গ। সিগারেট ধরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে টিটো জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ আপনার এত দয়া?'

'দয়া কেন হবে? চুক্তি মতন কাজ করেছি।' হাসল তমা।

'চুক্তি?'

'বাঃ। গতকাল ভার্মা আমার ফ্ল্যাটে আসার আগে কথা হয়েছিল আমি আপনার বাবার কাছে যাব। তাই গিয়েছিলাম। কোন্ হাসপাতালে আছে?'

'পি-জি-তে।'

'যাবেন দেখতে?'

'দেখুন, আপনি আর গায়ে পড়ে প্রশ্ন করবেন না।'

'কি হল? হঠাৎ রেগে গেছেন?'

'হঠাৎ?' ঘুরে দাঁড়াল টিটো, 'কাল সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে কত ভাবের কথা? সেন আর ভার্মা এসে ওই ফ্ল্যাটে ষড়যন্ত্র করল কিন্তু কিছু বললেন না। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বেরিয়েছিলাম। অথচ রাত্রে ফোন করতে ভার্মাকে আবার পাওয়া গেল আপনার বিছানায়। তারও সঙ্গে ভাবের কথা বলছিলেন। দেখুন মশাই, আপনাকে দু'নম্বরী বললে কম বলা হবে, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

ঠোঁট কামড়াল তমা, 'আর কিছু বলার আছে?'

'আছে। আপনি ঠিক বুঝে নিয়েছেন আমি কোন্ কারণে ফেঁসে গেছি বলে এখানে আছি। ওই হারামি বাদলদা তার কারণ। আপনাকে ভার্মা বলেছে বেইমানি না করতে, বাদলদার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে। কিন্তু আপনি রেখেছেন। আমরা আপনার ফ্ল্যাট থেকে চলে আসবার পর আপনি লোকটাকে টেলিফোন করে সব জানিয়েছেন। বলুন আপনি, জানান নি?'

'এই তথ্য পেলেন কোত্থেকে?'

'অস্বীকার করুন।' এগিয়ে এল টিটো।

তমা নড়ল না, 'তাহলে আপনি যে আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন সেকথাও বাদলকে বলেছি। সেটা জানতে পারেন নি?'

একটু থমকাল টিটো। না, এটা তমা বাদলদাকে বলেনি। বললে নিশ্চয়ই তখন বাদলদা তাকে ঝাড়ত। কেন বলেনি? তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তমা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যখন আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন তখন কি জানতেন না আমার চরিত্র কি রকম? আপনি অন্ধ? তাহলে গিয়েছিলেন কেন সব জেনেশুনে?'

'গিয়েছিলাম, তার কারণ আমি খারাপ কাজ করলেও মনে মনে খারাপ হয়ে যায়নি। আমি ভেবেছিলাম আপনিও সেইরকম।' টিটো চেয়ারে বসে পড়ল।

'অদ্ভুত! বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে কেউ সততা আশা করে?'

'আজেবাজে কথা বলবেন না।' চেঁচিয়ে উঠল টিটো।

'ঠিকই তো। আপনি আমাকে কাল ফোনে আর এখনও ওই সব বলেন নি? আপনি মাইরি বাজারের মেয়ের চেয়েও বহুৎ খারাপ, বলেন নি?' হাঁপাতে লাগল তমা।

মাথা নাড়ল টিটো, 'হ্যাঁ বলেছি। বলুন, কোথায় আমি ভুল বলেছি!'

'না। ঠিকই বলেছেন। আমারই ভুল হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমরা দু'জনেই
াংরায় ভাসছি অথচ ভাসতে চাইনি। হয়তো দু'জনে এক হলে কিছু একটা
রা যাবে। চলি'— তমা পা বাড়াতেই টিটো চেঁচালো, 'আপনি এখানে এসেছেন
জের ইচ্ছেয় কিন্তু যাওয়াটা আমার হাতে। দাঁড়ান।'

'কেন? আরও অপমান করার ইচ্ছে আছে নাকি?' তমা মুখ ফেরাল না।

টিটো একটু ভাবল। সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। তারপর উঠে কাছে গিয়ে বলল,
র! আমরা তখন থেকে শুধু ফাইট করে যাচ্ছি। আপনার ওপর আমার হেভি
াগ হয়েছে। আপনার কাজকর্মগুলো কেন অমন করলেন সেটা বোঝান, রাগ
লে যাবে সত্যি কথা বললে। আসুন।'

'কি বোঝাতে হবে?'

'আপনি বাদলদাকে টেলিফোন করেছিলেন?'

'না। বাদল আমাকে করেছিল।'

'কেন?'

'জিজ্ঞাসা করেছিল ভার্মা সেনকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল কি না?'

'ও কি করে জানতে পারল?'

'ওর লোক সেনের ওপর নজর রাখে আবার সেনের লোক ওর ওপর।'

'ওরা তো এক পার্টি করে।'

'তা হোক। আমি মিথ্যে কথা বলিনি' তখন বাদল আমাকে সেনের টেলিফোন
ম্বর দিল। বলল লোকটার নাকি খুব ইনফ্লুয়েন্স দিল্লিতে। ওকে বললে আমি
দিল্লিতে প্রচুর মডেলিং-এর কাজ পাব। তবে পাবলিক প্লেসে সেন এইসব কথা
লবে না। আমি যদি ফোন করে আমার ফ্ল্যাটে একটা অ্যাপয়েন্ট করি আজ
পুরে, তাহলে আমার উপকার হবে। আমি অত বোকা নই মশাই। সেনকে
আমার ফ্ল্যাটে আনার ব্যাপারে বাদলের অন্য কোন মতলব আছে। কারণ ফোন
করে আপনাকে ইসারা করতে বলেছে।'

'বাদলদার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

'বলেছি তো, লোকটা একসময় আমার উপকার করেছিল। ভার্মার সঙ্গে
আলাপ ও-ই করিয়ে দেয়। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে মুখের ওপর ওকে না
বলতে পারি না।'

'ভার্মা কাল রাত্রে আবার এসেছিল কেন? ফুর্তি করতে?'

'ফুর্তি করার শারীরিক ক্ষমতা লোকটার নেই।'

ঢোঁক গিলল টিটো, 'তাহলে? টেলিফোনে ওর জড়ানো গলা পেয়েছি।'

'ও আমার ফ্ল্যাটে ফিরে এসে চুপচাপ মদ খাচ্ছিল।'

'কেন?'

'আজ নাকি কেউ খুন হবে তার ব্যবস্থা করে এসে নেশা করছিল।'

'তারপর?'

'বেহেড মাতাল হয়ে তিনটের সময় ফিরে গেল ড্রাইভারের কাঁধে ভর দিয়ে। গাড়িতে ওর সিকিউরিটি থাকে। যে লোকটার টাকায় আমি বেঁচে আছি তাকে কি বলে আসতে নিষেধ করব? তার ওপর লোকটা অন্যভাবে আমাকে বিরক্ত করে না। আপনি বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ভার্মা আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করেনি। নিজেই বলেছে ও অক্ষম। এমন লোক পাশে থাকা তো আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাপার।'

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। ভার্মাকে দেখে মোটেই অথর্ব বলে মনে হয় না। কিন্তু তমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে। জীবনে তো অনেকরকম অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে থাকে। এই যে সে এখানে বন্দী হয়ে আছে সে'টা কদিন আগে চিন্তা করতে পারত? সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি জানেন ওরা কাকে খুন করার প্ল্যান করেছিল?'

'শুনেছি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'জেনেছি। লোকটা ভার্মা বা সেনসাহেবের কোন ক্ষতি করেনি। একদম বিনা দোষে ও খুন হয়ে যেত আজ। আর এসব আপনার ফ্ল্যাটে ঠিক হয়েছে।'

'আমার নয়, ভার্মার ফ্ল্যাট। কিন্তু খুন হয়ে যেত মানে?' তমা চোখ ছোট করল।

থতমত হয়ে গেল টিটো। উত্তেজনার বশে মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে গেল? সে কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে বলল, 'খুন যে হবেই এমন কথা কে বলতে পারে। লোকটাকে মারার কোন সুযোগ হয়তো আজ খুনীরা পাবে না।'

তমা ধীরে ধীরে ডিভানটায় গিয়ে বসল। তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যেও টিটোর মুখের ওপর থেকে সরছিল না। সে শান্ত গলায় বলল, 'ভার্মার খুনীরা কখনও বিফল হয় না। যদি সেই লোকটি কলকাতায় থাকে তাহলে তাকে মরতে হবেই। লোকটা আর কলকাতায় নেই না?' একটু থেমে তমা বলল, 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করে বলতে পারেন।'

'কি করে আপনাকে বিশ্বাস করব? আপনার কথার সঙ্গে চালচলন মিলছে না।'

'ঠিকই, আমাকে বিশ্বাস করা খুব শক্ত। মাঝেমাঝে আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না। যাক, আপনাকে ধন্যবাদ, আমাকে কাঠমাণ্ডুতে যেতে হচ্ছে

টিটোর মনে পড়ল। সোমবারে ভার্মা তমাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠমাণ্ডু চলে যাবে লে ঠিক করেছিল। স্ট্রাইক না হলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। সে বলল, 'ধন্যবাদ দচ্ছেন কেন? নেপালে গেলে আপনি প্রচুর গিফট্ পেতেন ভার্মার কাছ থেকে।'

হঠাৎ তমা চোখ তুলল, 'সেই গিফট্গুলো নিয়ে আমি কি করব? তাছাড়া একটি মানুষের জীবনের দাম কি সেই গিফটের চেয়ে কোটিগুণ বেশি নয়?'

'আপনি সত্যি কথাগুলো মন থেকে বলছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন।'

'আপনি জানেন নিশ্চয়ই আজ দুপুরে আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার কি করার কথা? শুনেছি আমি চলে আসার পরে সাংবাদিকরা যাবে আপনার ফ্ল্যাটে। কাল সারা দুনিয়া জেনে যাবে ঘটনাটা।'

'আমি রাজি হইনি। আপনাকে তো বললাম সেনকে টেলিফোন করিনি। সাংবাদিকরা আমাকে জড়াবে। ভার্মা তাড়িয়ে দেবে ফ্ল্যাট থেকে।'

টিটো মাথা নাড়ল, 'এমনও হতে পারে আমি যখন আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকব তখন মারপিটের পর আমাকে ধরার জন্যে লোক রেখে দেবে বাইরে বাদলদা।'

'অসম্ভব কিছু নয় ওর পক্ষে।'

'আপনি বাদলদাকে কি কৈফিয়েত দেবেন?'

'সেনের লাইন পাইনি।'

'দাঁড়ান।' টিটো টেলিফোনের কাছে পৌঁছে ডায়াল করল, 'ও আপনি। এখনও আপনার সেই মহিলা কোনরকম ইশারা করেন নি। কি করব?'

'তাকিয়ে থাকবে।'

'দূর। এক নাগাড়ে তাকানো যায় নাকি। তার চেয়ে আপনি ওকে আমার টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বলুন প্রয়োজনমত ফোন করতে।' টিটো হাসল।

'আমাকে জ্ঞান দিও না কি করতে হবে। যা হোক, তুমি বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত ওয়াচ করবে।'

'কাজটা শেষ করে কোথায় যাব?' টিটো জিজ্ঞাসা করল।

'ইশারা পেলে, ফোন করো, বলে দেব।' লাইন কেটে গেল। টিটো চোখে ইশারায় তমাকে ডাকল, 'আপনি বাদলকে ফোন করুন।'

'এত গায়ে গায়ে?'

'তাতে কি? আপনি তো আমার সঙ্গে থাকেন না।'

'যদি ফোন নামিয়েই রিঙ ব্যাক করে আমার ফ্ল্যাটে?'

'এখন বলুন বাইরে থেকে করছেন।'

তমা হাসল, 'এখনই যাচাই করছেন?' সে ডায়াল করল, আমি তমা। ন কি করব বলো? আমার বাড়ি থেকে লাইনটা পাচ্ছিই না। আধঘণ্টা ধরে ডায়া করেছি। শেষ পর্যন্ত পাড়ার দোকান থেকে চেষ্টা করেছি। তাও পাচ্ছি না। কি না, অসম্ভব। আমি অন্য এক্সচেঞ্জে যেতে পারব না। আর এসব আমার ভা লাগছে না বাদলবাবু। মানে তো বুঝতেই পারছেন। আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ব আজীবন অ্যাডভ্যানটেজ নিয়ে যেতে পারেন না। আমি বাড়ি থেকে আর কয়েকবার চেষ্টা করব। যদি লাইন পাই তো ভাল, নইলে ওখানেই শে রাখছি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে তমা বলল, 'বিশ্বাস হল।'

'যদি এটাও অ্যাকটিং না হয়, তো ঠিক আছে।'

'উঃ, আপনি একটা—! আমি চলি।'

'দাঁড়ান। আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।'

'বলুন।'

'তার আগে বলুন ভার্মা কখন আসবে আপনার কাছে?'

'বিকেলের আগে তো নয়ই। যেদিন আসে না সেদিন গাড়ি পাঠিয়ে নি যায়। আজ নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত থাকবে।'

'ঠিক আছে। আপনার কাজের লোকটিকে ছুটি দিয়ে দিন আজ।'

'তারপর?'

'ঠিক বারোটার সময় সেনকে টেলিফোন করে দুটোর সময় আপনার ফ্ল্যা আসতে বলুন। আর এই ব্যাপারটা বাদলদাকে জানাতে হবে না।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'বাদলদা যেটা চেয়েছে সেটা হবে। কিন্তু বাদলদা জানতে পারবে ন বাদলদা বলেছিল আপনি ইশারা করা মাত্র আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে সেনকে এম ভাবে মারতে হবে যাতে সে আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। সেটাই করতে হবে

'কিন্তু কেন?'

'এই লোকটার সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। প্রতিটি দিন ওরা নাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে যাচ্ছে। আপনার অমত আছে?'

'তারপর?'

'আমরা ভার্মার জন্য অপেক্ষা করব?'

'আমার ফ্ল্যাটে আপনি ভার্মাকে মারবেন?'

'মেরে ফেলব বলিনি।'

'বেশ। তারপর আমি কোথায় যাব?'

'ভার্মা দেখবে আপনি হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন।'

'ও। তারপর?'

'তারপর আপনি বাদল রায়কে ডাকবেন।

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু ভুল থেকে গেল প্ল্যানে। সেন আমার ফ্ল্যাটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাদল সেটা জেনে যাবে। সেনের সঙ্গে ওর লোক ঘোরে।'

' অ। ঠিক আছে। সেনকে যে সময় আসতে বলবেন, ধরুন দুটোর সময় বললেন, দুটো বাজতে দশ মিনিট আগে বাদলদাকে ফোন করবেন। বাদলদা রওনা হয়ে গেলে ওর লোক আর কোথায় খবর দেবে ওকে?'

'কিন্তু আপনি ওকে এত বোকা ভাবছেন কেন? বাদলকে টেলিফোন সে আমার ফ্ল্যাটে আসবে না। ভাববে ভার্মার কোন ফাঁদ।'

টিটো মাথা নাড়ল। একটু ভেবে বলল, 'সেনকে আপনি এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতে পারবেন। পাশাপাশি তো। বলবেন আপনার বান্ধবীর ফ্ল্যাট, ভার্মাকে এড়াতে আপনি এই ব্যবস্থাটা করলেন। হয়তো বিশ্বাস করবে।'

'হয়তো। কিন্তু বাদল?'

'ওকে আমি এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসব।'

'বেশ। তাহলে ভার্মা?'

'ভার্মাকে নিজের ফ্ল্যাটেই সন্ধ্যের সময় ডাকবেন।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে এতে আমাদের উপকার হবে?'

'না। কিন্তু লোকগুলোর শাস্তি হবে। এটা হওয়া দরকার।'

'আমি এটা ভাবিনি।'

'কি ভেবেছিলেন?'

'আমি এই চেনা জগৎ ছেড়ে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

'যেখানেই যান এরা সুস্থ থাকলে ঠিক আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তাছাড় আপনার আত্মীয়রা যাঁরা আপনার ওপর নির্ভর করে আছেন?'

'এখন আর কেউ আমার ওপর নির্ভর করতে চায় না, সবাই ব্যবহার করে ভাল আছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। ক্রমশ ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছি। আমি জানি একটু অবাধ্য হলে, আমাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে ভার্মা আমাকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। তাই কোথাও গিয়ে যদি বাঁচতে পারতাম?'

'আপনার কেন মনে হল, আমি সাহায্য করতে পারি?'

'মনে হচ্ছিল। কারণ আপনিও ব্যবহৃত হচ্ছেন। যাক, ছেড়ে দিন। যা হবার তা হবে। আপনি বাবাকে দেখতে হসপিটালে যাবেন না?' তমা টিটোর পাশাপাশি বাইরের ঘরে এল। টিটো বলল, 'গেলে ভাল লাগত। কিন্তু আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। বাবার ওখানেও পুলিশ নজর রাখতে পারে।'

'তাহলে এখন যাচ্ছি!'

'আসুন!'

দরজা খুলতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তমা। তারপর ডান হাত বাড়িয়ে দিল

টিটো একটু অবাক হয়েই হাতে হাত মেলাল। দুই তিন সেকেন্ড। হাত সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল তমা। দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে শুয়ে পড়তেই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই বাদলদার গলা, 'শোন, ওয়াচ করতে হবে না। তুমি সন্ধ্যাবেলায় তৈরি থেকো। আজ তোমাকে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'সময়মত বলব।' লাইন কেটে গেল।

আবার শুয়ে পড়ল টিটো। হঠাৎ খুব অবসন্ন মনে হচ্ছিল নিজেকে। চোখ বন্ধ করতেই তমার মুখ মনে পড়ল। প্রথম দিন যেভাবে সে আকর্ষণ বোধ করেছিল এখন সেটা নেই। বরং সেটা বদলে গিয়ে বন্ধুর মত মনে হচ্ছে ওকে। এখন আর শ্রীদেবী বলে ভুলেও ভাবতে পারছে না। মেয়েটার মধ্যে একটা দুঃখী মানুষ আছে। সেই মানুষটার খবর তমা দিয়ে গিয়েছে তাকে। আর তাই কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে তার।

টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল টিটোর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিজের

াতস্থ করতে গিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল। জানলার ওপাশের আকাশ মঘলা। সে রিসিভার তুলতেই শুনল, 'আমি তমা। কি করছিলেন?'

'ঘুমচ্ছিলাম। নম্বর কোথায় পেলেন?'

'বাঃ। তখন বাদলকে ফোন করতে গিয়ে দেখলাম রিসিভারে। শুনুন, আর ানিট পাঁচেকের মধ্যে সেন এসে যাবে এই ফ্ল্যাটে। মিনিট পনেরর মধ্যে াপনার ওখানে পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু একটা দারুণ ভুল হয়ে গিয়েছে। াপনার ওই ফ্ল্যাটের চাবি আমি নিয়ে আসিনি। তাহলে দরজা খুলব কি করে?' মার গলা এবার চিন্তিত শোনাল। গাল কামড়ালো টিটো। তারপর বলল, আপনারা লিফটে উঠবেন তো? এই তলায় নেমেই দেখবেন কাগজে মোড়া বস্থায় চাবিটা পড়ে আছে। ফলস দিয়ে মাটিতে বসে তুলে নেবেন। আপনি াগে সেনকে নামতে দেবেন।'

'ঠিক আছে। রাখছি।'

টেলিফোন রেখে টিটো চাবিটাকে একটা কাগজে এমনভাবে মুড়ে ফেলল াতে কেউ চট করে বুঝতে না পারে। সে তমার ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল। জানলা ন্ধ। এখান থেকে তমাদের পার্কিং প্লেস দেখা যায়।। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে াকার পর একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি থেকে সেনকে নামতে দেখল। সে নিজেই ালিয়ে এসেছে। সেন ঢুকে গেল ভেতরে। এখন তমার হাতযশ। যদি রাজি রাতে না পারে তাহলে তাকেই যেতে হবে ওখানে। মিনিট পাঁচেক বাদে সে জনকে দেখতে পেল। হেসে কথা বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। সে টপট রিসিভার তুলে বাদলদার নম্বর ঘোরালো। বাদলদার গলা পেতেই টিটো ড়ানো গলায় বলল, 'আবে বাদলদা আমি কতক্ষণ বসে থাকব?'

'কি?' বাদলদা হিমসিম করে উঠল, 'তুমি এই দিনদুপুরে মদ খেয়েছ?'

'বেশ করেছি। আগেরটা শেষ হয়েছিল বলে আর একটা ভেঙেছি। সেই ময়েটা তো সিগন্যালই দিচ্ছে না। নাম্বারটা দাও, ফোন করি। দারুণ জিনিস।'

'টিটো। চুপ করে বসে থাকো। আমি আসছি।' লাইন কেটে গেল। হাসল টো। মাতালের অ্যাকটিং তাহলে ভাল হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ফিল্মে ান্স নিলে হত। সে চটপট প্যান্ট শার্ট পরে কাগজে মোড়া চাবি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল দরজা খুলে। না, পাশের ফ্ল্যাটদুটোর দরজা বন্ধ। লিফট্ ওপরে উঠছে। সে লিফটের সামনে কাগজটাকে ফেলে দিয়ে আবার ঘরে ঢুকে দরজা ন্ধ করা মাত্র লিফট ওপরে উঠে গেল। না ওই লিফটে ওরা উঠতে পারেনি।

রান্নাঘরে একটা লোহার রড ছিল। সেটার গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে ভা
করে বেঁধে নিল টিটো। তারপর আবার বাইরের ঘরের দরজায় ফিরে গেল
কি-হোলে চোখ রাখতেই সে দেখল লিফটের দরজা খুলছে। প্রথমে সেন নামল
পরে তমা। দরজা বন্ধ হতেই তমা উফ্ বলে মাটিতে বসে পড়ল। ওর শাড়ি
নিচে চাবিটা। সেনকে কেমন চোর-চোর দেখাচ্ছে। শালা হারামি। সেন ঘু
বলল, 'কি হয়েছে?'

তমা উঠতে উঠতে বলল, ' বেকায়দায় পা পড়েছিল।'

'ও। এখানে কেউ থাকে না?'

'না। আমার বান্ধবী কোলকাতার বাইরে গেছে। চাবি আমার কাছে।'

চটপট সরে এল টিটো শোওয়ার ঘরে। রুমাল বের করে মুখে বাঁধল। দরজ
বন্ধ হবার শব্দ হল। সেনের গলা পাওয়া গেল, 'কোন ভয় নেই তো?'

'না। আপনি নিশ্চিত থাকুন।' তমা হাসল।

'কালকে আপনাকে দেখার পর এত তাড়াতাড়ি ফোন পাব ভাবতে পারিনি
আমি তুমিই বলি কি দরকার বলছিলে যেন?'

'আমি মডেলিং করি। দিল্লিতে তো আপনার খুব হোল্ড।'

'ও, এই ব্যাপার। সিওর। হয়ে যাবে। কোথায় বসবে বল। এঘরে তো গ
করার মত কোন ফার্নিচার নেই। কোথায় নিয়ে এলে?' সেন হাসল।

'দাঁড়ান দেখে আসি।' তমা বলল। টিটো চুপচাপ দরজার পাশে দাঁড়ি
ছিল। তমা নিশ্চয়ই তার ঘরে গিয়েছে। একটু বাদেই তমাকে এই ঘরেই দেখ
পেল সে। চোখের ইশারা করা মাত্র তমা গলা তুলে বলল, 'এখানে আসুন
আলো জ্বালা যাবে না কিন্তু। কেউ তো থাকে না।'

'আলো জ্বালার আর কি দরকার? অন্ধকারই ভাল।' সেনের গলা এগি
আসছিল। টিটো সেনের পাশ থেকে শরীরটাকে প্রথম দেখল। তমার সাম
দাঁড়িয়ে যেই সেন দুটো হাত বাড়াল সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের লোহার রড নে
এল সেনের ঘাড়ে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেও পারল না সেন। কাটা কলাগাছে
মত ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপরে । তমার গলা থেকে অস্ফুট শব্দ ছিট
বের হল, 'মরে যায়নি তো।'

টিটো মাথা নেড়ে 'না' বলল। তারপর শরীরটাকে উল্টে দিয়ে মালাইচাকি
ওপর সজোরে আঘাত করতেই শরীরটা কেঁপে উঠল। সেন সাহেবের মু
থেকে আর্তনাদ ছিটকে এল। তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। দ্বিতী

মালাইচাকির ওপর আক্রমণ করার সময় তমা সরে গেল সামনে থেকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল। এবার সেনসাহেবের গোড়ালি ভাঙল টিটো। লোকটা আর এই জীবনে সাহায্য ছাড়া সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে এগিয়ে গেল তমার কাছে, 'আপনার কেন খারাপ লাগছে বুঝতেই পারছি কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন তো ওই লোকটা রাজনীতি করার সুযোগ নিয়ে কত মানুষের সর্বনাশ করেছে! জনসাধারণের কাছে নিজের এক ধরনের ছবি তুলে ধরে শুধু ভাঁওতা দিয়ে গেছে। দু'নম্বরী করে টাকা রোজগার ছাড়াও ও এখানে কেন এসেছিল তা আপনি জানেন। সেটা সাধারণ মানুষ জানুক তা আপনি চান না, বলুন?' টিটো হাঁপাতে লাগল।

'তবু, কি ভয়ঙ্কর।' ফিসফিস করে বলল তমা।

'এছাড়া উপায় ছিল না। লোকটাকে সারাজীবনের জন্যে পঙ্গু করে দেওয়া প্রয়োজন ছিল।'

'আপনি, আপনি পারলেন?' মুখ থেকে হাত সরিয়ে টিটোর দিকে তাকাল তমা। সেই চোখে বিস্ময়, কিছুটা ভয়-মেশানো ঘৃণা? টিটো মাথা নাড়ল, 'এখনও খুন করিনি কাউকে। আর এসব করে আমার কোন লাভ হচ্ছে না। তবে আমাকে যদি আপনার অসহ্য লাগে তাহলে পনের মিনিট বাদে চলে যাবেন।'

'এখন যাব না কেন?'

'আমাদের দু'জনেরই অসুবিধে হবে। আপনি যে সেনকে এখানে নিয়ে এসেছেন তা সেন ছাড়া কেউ জানে না। জ্ঞান ফিরলে সেন সেটা কাউকে জানাবে না। আর আপনার কোন ক্ষতি করার ক্ষমতাও এ জীবনে পাবে না। আপনি এখন আসুন আমার সঙ্গে।' প্রায় হুকুম করার গলায় কথাগুলো বলে তমাকে নিয়ে সে চলে এল রান্নাঘরে, 'এখানে আপনি পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনি যে আছেন কেউ জানতে না পারে।'

বিভ্রান্ত তমাকে সেখানে রেখে সে চলে এল শোয়ার ঘরে। সেনের আহত দুটো পা ধরে টানতে মনে হচ্ছিল খুলে আসবে। ঘরের এক কোণে শরীরটাকে রেখে দিতেই কানে খট্ আওয়াজটা পৌঁছালো। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে সে লোহার রডটা দরজার পাশে সরিয়ে রাখল। মাতালের ভঙ্গি করে কয়েক পা এগোতেই বাদলদা মুখোমুখি হল। বাদলদা একাই। সে বলল, 'ও, এসে গেছেন!'

তার জড়ানো গলা শুনে ঠাস করে মারল বাদলদা। গাল জ্বলে গেল টিটোর।

তবু সে অভিনয় করল, 'আপনি আমাকে মারলেন?'

'তোকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব কুত্তার বাচ্চা। আমারই বুকে শুয়ে আমা দাড়ি ওপড়াচ্ছিস! তোর মত পাতি মাস্তানকে এখানে আনাটাই ভুল হ গেছে।' বাদলদা গজ-গজ করতে করতে ভেতরের ঘরে ছুটল যেখানে মদে বোতলগুলো আছে। গালে হাত বোলাতে বোলাতে শোওয়ার ঘরের দরজা ঠেস দিয়ে দাঁড়াল টিটো। সেনের শরীরটাকে চট করে দেখতে পাবে ন বাদলদা। একটু বাদে যখন ফিরে এল বাদলদার তখন মুখ অন্যরকম, 'ক ব্যাপার, যে'কটা গুনে রেখেছিলাম সেকটাই আছে, জল মিশিয়েছ নাকি?'

এবার তুমিতে উঠে এল বাদলদা। টিটো স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ব্যাস হ গেল? অ্যাক্টিং বোঝেন না আবার নেতা হবার শখ হয়েছে কেন?'

বাদলদা চোখ ছোট করল, 'তুমি ঢপ দিয়েছিলে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করা সাহস পেলে কোত্থেকে? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'তার জন্যে তো একবার হাত চালিয়েছেন। একা একা বোর লাগে না আপনি টিভি পর্যন্ত এনে দেননি। অবশ্য আমি পাতি মাস্তান, আমার জন্যে কে করবেন?' গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল টিটো।

বাদলদা এবার হাসল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। তারপ একটু নরম গলায় বলল, 'এমন এক একটা কাণ্ড করো না!'

'আপনার সেই মেয়ে কোন সিগন্যাল দেয়নি।'

'দেবে না। শালি বহুৎ হারামি। অবশ্য সেন নিজেই ওকে ফোন কর পারে। এমন লম্পট চরিত্র তো আমাদের লাইনে বেশি নেই। ঠিক আছে তু যদি চাও আজ সন্ধ্যে সাতটার ক্যানিং লোকাল ধরে ক্যানিং চলে যেতে পা সেখানে বদর মিঞা নামের একটা লোক—গেটের বাইরে সাইকেল মেরামতি দোকান ওর। বদর তোমাকে পৌঁছে দেবে এমন একটা শেল্টারে যেখা পুলিশের ক্ষমতা নেই যাওয়ার।'

এই বদরকে আমি চিনব কি করে?

'লোকটার বাঁ হাত কাটা। প্রৌঢ়। এক হাতে সাইকেল চালায়। বাদলদা ঘ দাঁড়াল, 'অবশ্য ইচ্ছে হলে এখানেও ক'দিন থাকতে পার তুমি। তাতে আমা একটা কাজ হয়। ভার্মার লোক একজনকে খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। আজকালে মধ্যে না পেলে খুঁজে বের করব আমি। তারপর তোমার কাজ। সেটা অব খবর পাঠালে পরে এসেও তুমি করে যেতে পার।' বাদলদা উবু হয়ে কার্পেটে

পর ঝুঁকলেন. 'এখানে এটা কিসের দাগ। নতুন কার্পেট।'

টিটো আর দেরি করল না। দরজার পাশ থেকে লোহার রড তুলে সজোরে আঘাত করল বাদলদার ঘাড়ে। একটু বেকায়দায় পড়েছিল বলে বাদলদা মুখ ফেরাতে পারল। কিন্তু তার মধ্যেই দ্বিতীয় আঘাত পড়েছে মাথায়। শব্দ হল এবং পড়ে গেল বাদলদা। ঠিক যেভাবে সেনকে পঙ্গু করেছিল সেই একইভাবে টিটো হাত চালাল বাদলদার ওপরে। তারপরে নাকের তলায় হাত দিয়ে বুঝল প্রাণ যায়নি। এবার সেনের শরীর টেনে এনে রাখল বাদলদার পাশে। পকেট হাতড়ে দু'জনের কাছ থেকে মোট হাজার দেড়েক টাকা পাওয়া গেল। একটা বড় থলিতে নিজের যা ছিল সব ভরে নিল সে চটপট! সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, বাকি মদ ফেলে দিল কমোডে। ফ্ল্যাশ টেনে নিশ্চিত হল, কেউ বুঝতে পারবে না এখানে সে বাস করেছে। যে'কটি গ্লাস এবং ডিস সে ব্যবহার করেছে সে'কটি মুছে রেখে সে রড থেকে তোয়ালে খুলে ফেলে দিল শরীর দুটোর পাশে। ওতে কেউ তার হাতের ছাপ পাবে না। এবার সে তমাকে ডাকল, 'চলুন বেরুনো যাক।'

তমা পাথরের মত বেরিয়ে এল। তার দৃষ্টি পড়ল টিটোর ব্যাগের ওপর, 'আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

'হ্যাঁ। সন্ধ্যেবেলায় ভার্মার ব্যাপারটা আর করা হল না। আপনাকে চলে যেতে বলে সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে থাকতে পারতাম কিন্তু মনে হচ্ছে ঝুঁকি নেওয়া হবে তাতে।'

'কার গলা পাচ্ছিলাম? আপনাকে বকছিলেন।'

'বাদলদার।'

'চলে গেছে?'

'না। পাশের ঘরে সেনের পাশে শুয়ে আছে। জ্ঞান ফেরার পর সারা জীবন বিছানায় শুয়ে থাকবে।' টিটো হাসল।

তমার চোয়াল শক্ত হল, 'এসব আমার সহ্য হয় না।'

' কোন উপায় নেই ম্যাডাম। নিজের প্রাণ বাঁচাতে এছাড়া কিছু করা যেত না।'

'উনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, মারতে চাননি!'

'ওই আনন্দেই থাকুন। এখানে রেখেছিলেন হালদারকে মারার জন্যে। আমি হালদারের বউকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম ফোনে তাই প্ল্যান বদলালেন। আজ

সেনকে আপনার ফ্ল্যাটে আনিয়ে আমাকে দিয়ে ঠিক এই কাজটি করাতেন আর সেসব চুকে গেলে নিজের হাত পরিষ্কার করার জন্যে ঠিক সরিয়ে ফেলতেন আমাকে।' টিটোর হঠাৎ মনে পড়ল। সে শোয়ার ঘরের ভেতর ঢুকে তিনটে স্কচের বোতল ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরে এসে বলল, 'চলুন।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'জানি না।'

'তাহলে?'

'বাবার জন্যে যা রোজগার করেছিলাম তা সঙ্গে আছে। এখনও কি পেলাম। ক'দিন চলে যাবে। তবে যেতে হবে কলকাতার বাইরে কোথাও বাদলদা অবশ্য ক্যানিং-এ একটা লোককে ঠিক করে রেখেছে আজ আমা নিয়ে যেতে। কিন্তু সেই লোকটাকে দিয়ে খুন করাবে কিনা তা জানি না।'

'তাহলে সেখানে যাবেন না।'

তমা কি ভাবল। তারপর বলল, 'আমার বাবা অনেকদিন আগে একটা জ কিনেছিলেন খুব সস্তায়। সেখানে চাষবাস হয় না। দেখার লোকও ছিল না তাই এক মুসলমান মাঝিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম আম জাম কাঁঠা দিয়ে যেত লোকটা। এখন কিছুই দেয় না। বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলাম খদ্দের পাইনি। খুব ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম সেখানে। তবে লোকটাকে প দেখেছি। আমাদের অভাবের সংসার ছিল কিন্তু জমিটা সম্পর্কে হাল ছে দিয়েছি আমরা। হয়তো সেখানে গিয়ে এখনও থাকা যায়।'

টিটো অবাক হয়ে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার। নিজেদের জমি থাকতে আপনারা –'

তাকে থামাল তমা, 'আপনি না দেখলে বুঝবেন না। জমিটায় চাষবাস হ না। কিন্তু গাছগাছালি আছে এই পর্যন্ত। মনুষ্যবসতি নেই কাছে পিঠে। বা যে কেন অমন জায়গায় জমি কিনেছিলেন সেটাই বিস্ময়। বিক্রি কর চেয়েছিলাম, খদ্দের পাইনি।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'সুন্দরবনের কাছেই। বিদ্যেধরী নদী পেরিয়ে যেতে হয়।'

'ব্যাপারটা মন্দ লাগছে না। ক্যানিং-এ কি ফাঁদ পাতা আছে জানি না। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। আমার মত লোক অমন জায়গায় কেন পড়ে আছে নিয়ে গবেষণা করার মানুষের অভাব হবে না। শুনেছি গ্রামাঞ্চলের মানুষ

ান্যের ব্যাপারে খুব নাক গলায়। খবরটা পুলিশের কানে পৌঁছতে খুব দেরি বে না। তাছাড়া খাওয়াদাওয়ার সমস্যাও থাকছে।' টিটো চিন্তিত হল, 'দেখি ক করা যায়। চলুন।'

'চলুন মানে?'

'এই ফ্ল্যাট থেকে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যান। যাওয়ার আগে আমি খবরের াগজের অফিসগুলোতে টেলিফোন করব।'

'কাগজের অফিসে?'

টিটো হাসল, 'দুই পাবলিক ফিগার পঙ্গু হয়ে এখানে পড়ে আছে, এই খবরটা াগামীকাল প্রথম পাতায় ছাপা হবে। খবর না দিলে বেঁচে থাকার জন্যে যে চকিৎসার দরকার তাও ওদের ভাগ্যে জুটবে না।'

'আমি ওই ফ্ল্যাটে ফিরে যাব না।' তমা মাথা নাড়ল।

'বোকামি করবেন না। কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না।'

'কেউ বলতে পারে না। হয়তো ভার্মাই আমাকে সন্দেহ করবে।'

'ভার্মাকে কি অক্ষত রাখতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। লোকটা যাই করুক, আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে সে কখনও ্যবহার করতে চায়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য সঙ্গে নিয়ে গিয়ে লোভ দেখিয়েছে কন্তু ছেড়ে দেয়নি কারো হাতে। লোকটার ক্ষতি করা অকৃতজ্ঞতা হবে।' তমা করুণ গলায় বলল।

'কিন্তু লোকটা অসৎ। কাউকে খুন করে বে-আইনিভাবে নিজের ব্যবসা াড়াতে একটুও দ্বিধা করে না। আপনি এমন লোককে বাঁচাতে চাইছেন!' টিটো লল।

'এরকম লোকের সংখ্যা কলকাতায় প্রচুর। আপনি ক' জনকে শাস্তি দেবেন?'

'ঠিকই। কিন্তু একযাত্রায় পৃথক ফল হওয়া উচিত নয়।'

'আমি চিন্তা করতে পারছি না। প্লিজ।'

'আপনি যান।'

'আপনি আমার সঙ্গে চলুন। এখন ভার্মা আসবে না।'

টিটো একটু ভাবল। এই বাড়ি থেকে ব্যাগ হাতে একা বের হলে অনেকেই তাকাবে। কিন্তু সঙ্গে তমার মত সুন্দরী মহিলা থাকলে নজর ওর দিকেই যাবে। টেলিফোন না হয় তমার ফ্ল্যাট থেকে করা যাবে। ওরা দরজা বন্ধ করার আগে দেখে নিল, দুটি মানুষ তখনও চৈতন্যহীন। লিফটে নেমে এল না ওরা।

লিফটম্যান মনে রাখবে চেহারা। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নিচে নেমে সোজা গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় চলে এল। টিটো তমাকে বলল, 'আপনি আগে ঢুকুন। একসঙ্গে যাব না।'

তমা করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না তো।'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল টিটো।

মিনিট পাঁচেক বাদে ফ্ল্যাটের বেল টিপতে যেতে টিটো দেখল দরজা খোলাই এবং তমা দাঁড়িয়ে আছে। সে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ব্যাগ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মতলব কি বলুন তো?'

'কিসের মতলব?'

'আমাকে যেতে দিচ্ছেন না কেন?'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

'আমার সঙ্গে? সর্বনাশ।'

'কোন সর্বনাশ নয়। আমি সঙ্গে থাকলে আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু এসব ছেড়ে আপনি যাবেন?'

'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এই ক্রীতদাসীর জীবন—উঃ।'

'কিন্তু আপনি তো আমাকে ভাল করে চেনেন না। আমাকে সবাই গুণ্ডা বলে। দেখলেন তো একটু আগে দু'জনকে কি করলাম?'

'আপনিও তো আমাকে চেনেন না। আমিও তো খারাপ।'

'আমি যদি আপনার ক্ষতি করি?'

'আর কত ক্ষতি হবে আমার!

'ঠিক হ্যায়। তৈরি হয়ে নিন।'

তমাকে এবার উত্তেজিত দেখাল, কি নেব সঙ্গে?'

'যা নিজে বইতে পারেন।'

'দাঁড়ান। না, না বসুন।' তমা ছুটে চলে গেল ভেতরে। টিটো এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে।

টেলিফোনে হাত রাখতেই সেটা বেজে উঠল। তুলতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল টিটো। দ্রুত পা ফেলে তমা এসে রিসিভার তুলে হ্যালো বলল। টিটো দেখল তমা ঠোঁট কামড়াল। একটু সময় লাগল শুনতে তারপর বলল, 'আমি মন্দিরে গিয়েছিলাম সকালে। ফিরে এসে দোকানে গিয়েছিলাম সকালে। ওর বাড়িতে অসুবিধে থাকায় ছুটি নিয়েছে। হুঁ, হুঁ, ও। না সেনসাহেব কোন ফোন

করেনি। ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল তমা, 'ভার্মা সাহেব!'

'কি বলল?' টিটো কাছে এল।

'সকাল থেকে অনেকবার ফোন করেছে, পায়নি। রেগে গেছে খুব। এমনিতেও মেজাজ খুব খারাপ। সেনসাহেব যে লোকের নাম করেছিল তাঁকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সেন সাহেব নিজেও উধাও। কেউ বলতে পারছে না কোথায় গেছেন। অতএব কাঠমাণ্ডু যাওয়া হচ্ছে না। ' তমা জানাল।

টিটো হাসল, 'যাক। কাজ হয়েছে তাহলে।'

'অসিত ব্যানার্জিকে আপনি কখন খবর দিয়েছেন?'

'কাল রাত্রে।'

'আপনি মানুষটার একটা বড় উপকার করেছেন।'

' কেউ একথা স্বীকার করবে না। আমার অন্যায়ের বিচার করার সময় একথা কেউ ভাববেও না। যান, আর দেরি করবেন না।' টিটো তাড়া লাগাল।

একটা সুটকেসে যা যা ভরে নেওয়া সম্ভব, সব ভরে নিল তমা। সেটাকে তুলতে গিয়ে টিটো বলল, 'অসম্ভব। হাত ছিঁড়ে যাবে। আপনি সঙ্গে থাকলে ধরা পড়তে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

'আমাকে খুব বোঝা মনে হচ্ছে, না?'

'এটা তো বোঝাই।'

'তাহলে থাক। আমি যাব না।' তমা খাটে বসে পড়ল।

'কি হল আবার?'

'কিছু হয়নি। আপনি একাই চলে যান।'

টিটো ইতস্তত করল। সে শেষবারের জন্য অনুরোধ করল, 'আপনি যাবেন কি না ভেবে দেখুন।'

'আমি কারো বোঝা হতে চাই না।'

'কি আশ্চর্য! ঠিক আছে চললাম।'

'বেশ।'

ব্যাগ তুলে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বেল বেজে উঠল। টিটো থতমত হয়ে তমার দিকে তাকাল। তমা তাকে ইশারায় সরে আসতে বলে নিজের স্যুটকেস খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেল। দরজা খুলল তমা। একটি অচেনা লোক দাঁড়িয়ে তাকে দেখে নমস্কার করল সে,

'সেনসাহেব আছেন?'

'না তো?' তমা অবাক। এ আবার কে?

'নিচে ওঁর গাড়ি আছে।'

'তাতো জানি না। উনি একটু আগে এসেই বেরিয়ে গেছেন। আপনি কে?'

'আমি ওঁর ড্রাইভার।'

'এখানে এসেছেন তা আপনাকে কে বলল?'

'উনি এখানে এলেন। আমি বডিগার্ডের কাজও করি। এখানে পৌঁছে দিয়ে আমি খেতে গিয়েছিলাম। সাহেব বলেছেন একঘণ্টা বাদে খোঁজ নিতে।'

'ও। উনি খুব তাড়া আছে বলে বেরিয়ে গেলেন। আর আসবেন না।'

'তাহলে?'

'আপনি গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।'

'উনি আর ফিরবেন না তো?'

'না।' তমা দেখল লোকটি নিচে নেমে গেল। দরজা বন্ধ করে সে শোওয়ার ঘরে চলে এল, 'সর্বনাশ হয়েছে। সেন যে এখানে এসেছিল তা ওর ড্রাইভার জানে। পুলিশকে বলে দিতে পারে।'

'আপনি তো বললেন সেন এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।'

'বলেছি। কিন্তু দারোয়ানরা যদি বলে দেয় আমি সেনের সঙ্গে ছিলাম! ইস, আমি ভেবেছিলাম সেন একাই এসেছে।' তমা ছুটে গেল ভেতরের জানলায়। ঈষৎ ঝুঁকে বলল, 'ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'বাঁচা গেছে।' টিটো বলল, 'এবার চলি!'

'আশ্চর্য মানুষ তো! আমাকে এমন বিপদের মধ্যে রেখে আপনি চলে যাচ্ছেন? আপনি কি!' তমা চেঁচিয়ে উঠল।

'তাহলে আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হয়।' টিটো হাসল।

তমা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে খাটের তলা থেকে স্যুটকেস বের করতে যাচ্ছিল এই সময় আবার বেল বাজল। তমার চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। টিটো চাপা গলায় বলল, 'দেখুন, কে এসেছে।'

'পুলিশ হলে?'

'এত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসবে না।'

তমা দরজার দিকে এগিয়ে যেতে টিটো ঠিক করল জানলা দিয়ে বাইরের আলসেতে নেমে পড়বে। তমার সঙ্গে এঘরে ধরা পড়লে কোন যুক্তি টিকবে

না।

টিটো ব্যাগটা ওয়ার্ডরোবের ভেতর ঢুকিয়ে দিতেই ভার্মার গলা শুনতে পেল। সে শক্ত হয়ে গেল। না, ভুল হয়নি। চটপট ওয়ার্ডরোবের ভেতর ঢুকে গেল সে। দরজাটা বন্ধ করতেই সে তমার চিৎকার শুনতে পেল। যন্ত্রণা পেলে মানুষ ওভাবে চিৎকার করে।

ভার্মা এই ঘরে এল, 'তুমি বেইমানি করেছ আমার সঙ্গে।'

'আপনি এভাবে আমাকে মারলেন?' তমা চেঁচিয়ে উঠল।

'ডোন্ট শাউট। মারের এখনও অনেক বাকি। বেইমান।' ভার্মার গলা শান্ত।

'কি করেছি আমি?'

'বাদলকে তুমি অসিত ব্যানার্জির নাম বলেছ?'

'কে অসিত?'

'আহ। কাল রাত্রে সেনের মুখে শোননি অসিত ওই ইউনিয়নের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি, যাকে সরাতে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। লোক গিয়ে দেখতে পেল পাখি উড়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল কাল রাত্রে একজন ট্যাক্সি করে অসিতের কাছে গিয়েছিল। সে চলে যাওয়ার পর ভোর হতে না হতেই অসিত হাওয়া। লোকটা কে হতে পারে? নিশ্চয়ই বাদলের লোক। সেনকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে পাঠিয়েছে। আর বাদল জেনেছে তোমার কাছ থেকে। নইলে বারোটার মধ্যেই কি করে লোক পাঠাবে।'

'সেন নিজেও পাঠাতে পারে।'

'না। সেন আমার সঙ্গে ছিল পৌনে বারোটা পর্যন্ত।' ভার্মার কথা শেষ হওয়া মাত্র তমা চিৎকার করে উঠল, 'ওহো!' তারপরই কান্না।

ভার্মা হিসহিসে গলায় বলল, 'বেইমানি আমি সহ্য করি না। এখানে সেন এসেছিল? বল্ আমাকে। সেনের গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখলাম ঢোকার সময়।'

'হ্যাঁ। এসেছিল।'

'কেন? তোকে নিষেধ করিনি, আমাকে না জানিয়ে কাউকে এখানে ঢোকাবি না। সেন তোকে কত টাকা দেবে, বল্।'

'সত্যি বলছি, আমি কিছু নিইনি।'

'কোথায় সেন? দুপুর থেকে ওকে পাচ্ছি না কোথায় গেছে?'

'পাশের বাড়িতে'। ককিয়ে উঠল তমা।

'পাশের বাড়ি? সেখানে কি?'

'বাদল রায়ের খালি ফ্ল্যাট আছে সেখানে। আঃ ছাড়ুন।'

'চল আমার সঙ্গে। নিয়ে চল আমাকে। তোর মিথ্যেটা কতখানি আমি দেখব। বেইমানি আমি সহ্য করতে পারি না। চল।' ভার্মার গলা পাশের ঘরে চলে গেল। বাইরের দরজা বন্ধ হতেই বেরিয়ে এল টিটো ওয়ার্ডরোব থেকে আর কোন পথ নেই। তমা ধরা পড়বেই। এখন যদি সে পালিয়ে যায় বেঁচে যেতে পারে। ব্যাগ তুলতে গিয়ে খচ্ করে লাগল মনে। মেয়েটা তার জন্যেই ফেঁসে যাবে? সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বাইরের দরজার কি-হোল দিয়ে দেখে নিল কেউ নেই। দরজা খুলে সোজা নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে যতটা দ্রুত পারে।

নিচে এসে দেখল ভার্মা আর তমা কথা বলছে। তমা বোধহয় কিছু বোঝাতে চাইছে, ভার্মা শুনছে না। হয়তো তমা তার জন্য ইচ্ছে করেই সময় নষ্ট করছে সে দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। লিফটম্যান ফ্লোর জিজ্ঞাসা করলে ও একতলা নিচে নামাতে বলল।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে সে চাবিটা বের করল। ভাগ্যিস বেরুবার সময় চাবিটা সে নিয়ে বেরিয়েছিল! ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল না সে। বেল দিলে তাকেই খুলতে আসতে হবে এবং ভার্মার মুখোমুখি হতে হবে। দরজা খোলা থাকলে ভার্মা সন্দেহ করতে পারে কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। সে লোহার রডটাকে তুলে নিয়ে আবার তোয়ালে জড়াতেই বেল বাজল। চটপট শোওয়ার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে সেনকে নড়তে দেখল, আঃ সঙ্গে সঙ্গে সেনের মাথায় আঘাত করল সে আর একবার। লোকটা শান্ত হয়ে গেল। ভার্মার গলা শোনা গেল বাইরের ঘরে, 'সেনসাহেব এখানে আছেন নাকি?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভার্মার গলা, 'কি হল? আবার মিথ্যে।'

'আপনার গলা পেয়ে চুপ করে গেছে ওরা। ওই ঘরে দেখুন।'

টিটো ভার্মার শরীর দেখতে পেল, ঘরে ঢুকছে। এক পা ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল লোকটা 'আই বাপ। একি?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। টিটো আর অপেক্ষা করল না। ঠিক যেভাবে আগের দু'জনের ব্যবস্থা করেছিল, ঠিক সেইভাবে দ্রুত ভার্মার ওপর কাজ শেষ করল।

বাইরের ঘরে এসে টিটো দেখল তমা কাগজের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। সে

হেসে বলল, 'সরি! আপনার কৃতজ্ঞতার দাম দেওয়া হল না। চলুন।'

তমাকে নিয়ে একরকম জোর করেই বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তমা জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি হবে?'

'আর পেছনোর সময় নেই। সুযোগও নেই। আপনার ফ্ল্যাটে চলুন!'

ওরা দু'জনে একই সঙ্গে ফিরল। তমা চুপচাপ স্যুটকেস সামান্য খালি করল, যতটা সম্ভব। আলমারিতে যত টাকা ছিল হাত ব্যাগে নিয়ে নিল। টিটো তখন টেলিফোনে খবরের কাগজগুলোকে ধরছে। কাজ শেষ করে ভেতরের ঘরে এসে, সে বলল, 'তমা, এখন থেকে আমরা বন্ধু।'

তমা টিটোর হাত জড়িয়ে ধরে কেঁপে উঠল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।'

টিটো হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল। হাঁটুতে জোর নেই, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোন যুবতী মেয়ের হাত সে ধরেনি। মাস্তানি করুক কিংবা বেনিয়মী জীবন কাটাক, কখনও মেয়েদের সঙ্গ পেতে চায়নি। সেটা পাওয়ার জন্যে যে টাকা খরচ করতে হয় তাও তার পকেটে ছিল না। আজ তমার স্পর্শ তাকে বিচলিত করল।

তমা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'কিছু না। এবার যাওয়া যাক।' হাত ছাড়াল টিটো।

'কোথায় যাবে ঠিক করে নাও।'

'কলকাতা থেকে চলে যাওয়া উচিত। অনেক দূরে। সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওই বাড়ির দিকে আসতে শুরু করেছে।' এগিয়ে চলল টিটো।

দরজা বন্ধ করে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামল। নিজের স্যুটকেস বইতে তমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বড্ড ভারী। বাড়ির বাইরে আসামাত্র দারোয়ান ওদের দেখল। দেখে দ্রুত এগিয়ে এল, 'মেমসাব, মুঝে দিজিয়ে।' সে সম্ভবত এরকম দৃশ্যে কোনদিন তমাকে দ্যাখেনি। তমা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। তুমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। আমি দেশের বাড়িতে যাচ্ছি। ভার্মা সাহেবের গাড়ি পাঠানোর কথা ছিল, কেন যে এখনও গাড়ি এল না বুঝতে পারছি না।'

'ভার্মা সাহেবের গাড়ি তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ান হিন্দিতে জানিয়ে দিল, 'ড্রাইভারকে ডেকে দেব?'

'দাও।'

দারোয়ান ছুটে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যে ড্রাইভার গাড়িটাকে নিয়ে এল কাছে। তার আগেই তমা ফিসফিস করে বলল, 'উপায় নেই। এটা না

করলে ওরা সন্দেহ করত। পরে খুব খারাপ হত।'

গাড়িতে উঠে তমা বলল, 'হাওড়া স্টেশনে চল।'

সারা রাস্তা ওরা কোন কথা বলল না। গাড়ি থেকে নামার সময় ড্রাইভার বলল, 'আমি স্যুটকেস নিয়ে যাব মেমসাব?'

'না, না। তুমি যাও। সাহেবের অসুবিধে হবে।'

গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র টিটো বলল, 'দাঁড়াও। আমরা শিয়ালদায় যাব।

'কেন?'

'ড্রাইভার নিশ্চয়ই বলবে তুমি হাওড়া স্টেশনে এসেছ।'

'বলবে কেন?'

'পুলিশ যখন জানতে পারবে ভার্মা তোমার কাছে আসতেন তখন হয়তে জেরা করবে। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'কিন্তু শেয়ালদা থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'যেখানেই হোক। অন্তত কলকাতার বাইরে যাওয়া যাবে।'

শিয়ালদা স্টেশন থেকে দূর পাল্লার ট্রেন বেশি নেই। তাছাড়া যাব বলে স্টেশনে এসেই টিকিট পাওয়া যায় না আজকাল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল টিটো। তমা বলল, 'এক কাজ করবেন? শিলং যাবেন?'

'কিভাবে?'

'এয়ারপোর্ট চলুন।'

ট্যাক্সি নিয়ে যখন ওরা এয়ারপোর্টে পৌঁছাল তখন রোদ মরেনি। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের কোনও প্লেন শিলং-এ যায় না। বায়ুদূত সার্ভিস সকালের দিকে। গৌহাটি যাচ্ছে একটা প্লেন প্রচুর লেট করে। চেষ্টা চরিত্র করে দুটো পেয়ে গেল ওরা। চেক ইন করে প্লেনে উঠে বসা পর্যন্ত টিটো অস্বস্তিতে ছিল। কারো সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

প্লেনের সিটে বসে ও খবরের কাগজ পেল। অনেকবার পড়া হয়ে গিয়েছে সে তন্নতন্ন করে খুঁজল। না তাকে নিয়ে কোন খবর নেই। একটু আরাম লাগল গতকাল কিংবা পরশুর কাগজে যদি তার কথা বা ছবি ছাপা হয়ে থাকে তাহলে লোকে নিশ্চয়ই এখনও মনে রাখতে পারে না। তমা বলল, 'ওরা এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে, না?'

'পাওয়া উচিত।' ফিসফিস স্বরে জবাব দিল টিটো।

'ওরা তোমাকে কিছুতেই সন্দেহ করতে পারবে না।'

'চুপ করো।'

'আমাকে করতে পারে! দু-দুবার দু'জনের সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছি।'

'আমার বাড়ি নয়। চুপ করো।'

তমা টিটোর হাত আঁকড়ে ধরল। প্লেন উড়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যের মুখে ওরা গৌহাটিতে পৌঁছে গেল। আজ শিলং যাওয়া ঠিক হবে না। পাহাড়ি রাস্তা। এসব কথা প্লেনেই দু'জনকে বলতে শুনেছিল ওরা। কিন্তু এয়ারপোর্টের বাইরে আসতেই ট্যাক্সিওয়ালা জানাল শিলং-এ যাওয়া মোটেই অসুবিধের নয়। অনেকেই যাচ্ছে। ওরা ট্যাক্সি নিল।

গৌহাটি শহরের বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র তমা টিটোর কাঁধের কাছে মুখ রেখে বলল, 'আমি ভাবতে পারিনি। কখনও এভাবে আসব।'

টিটো ইশারায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখাল। তমা বলল, 'ওসব বলছি না। ক'দিন আগেও, কাল রাত্রে জীবন অন্য রকম ছিল। এই সৌভাগ্যের কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। জানো, আমি যা করেছি ইচ্ছের বিরুদ্ধে করেছি।'

'আমিও তাই। কাল ভাবতে পারিনি আজ এভাবে তোমার সঙ্গে যাব।'

'তোমার ভাল লাগছে?' তমার প্রশ্নের জবাবে টিটো ওর হাত ধরল।

পথেই ঠাণ্ডা লাগছিল। গাড়ির কাঁচ তুলে দিয়েও রেহাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তমা শীতের কারণেই সরে এসেছে টিটোর কাছে। অন্ধকার গাড়িতে ওরা এখন বেশ ঘনিষ্ঠ। তমা জিজ্ঞাসা করল, 'শীত করছে?' টিটো জবাব দিল, 'একটু।'

'কাল সকালেই গরম জামা কিনতে হবে।'

শিলং পৌঁছল ওরা একটু রাতেই। ট্যাক্সি ড্রাইভার আসার পথে একগাদা হোটেলের খবর দিচ্ছিল। 'পাইনউডে অবশ্য খুব আরাম স্যার, বড় হোটেল তবে আপনি ড্রিমল্যান্ডে থাকলে অসুবিধে হবে না।' ওরা ড্রিমল্যান্ডে চলে এল। টিটো কিছু বলার আগেই ওরা একটা ডাবল বেডেড রুম দিয়ে দিল। খাতায় নামধাম লেখার সময় অম্লানবদনে এক বন্ধুর নাম ও অন্য ঠিকানা লিখে দিল সে। জানা গেল প্রতিদিনের ঘর ভাড়াই সাড়ে চারশো টাকা।

ঘরে ঢোকা পর্যন্ত কেউ কথা বলেনি। দরজা বন্ধ করে টিটো বলল, 'আজ প্রচুর খরচ হয়ে গেল। একগাদা টাকা আর প্লেনের টিকিট আর ট্যাক্সিতে দিলে, তারপর এত টাকার হোটেল!'

তমা হাসল, 'তুমি অত চিন্তা করছ কেন? আমি তো আছি।'

আশ্চর্য! এখানে এক পয়সা রোজগার নেই। কতদিন থাকতে হবে জানি না। টাকা ফুরিয়ে গেলে কি অবস্থা হবে ভাবতে পারছ।'

'পরে ভাবা যাবে।' তমা সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল পা ছড়িয়ে, 'আঃ।'

টিটো তমার দিকে তাকাল। এখন মোটেই আর শ্রীদেবীর মত মনে হচ্ছে না। কিন্তু তমা সুন্দরী এরকম একটা দারুণ ঘরে ওর সঙ্গে সারারাত থাকতে পারবে, ভাবা যায় না। তমা বলল, 'বাঁচা গেল, এখানে শীত নেই। আমি বাবা, খাওয়ার জন্যে আর বাইরে যাচ্ছি না।'

'কিন্তু খেতে তো হবে। প্লেনের খাবারে পেট ভরেনি।'

'টেলিফোন তুলে রুম সার্ভিসকে বলে দাও খাবার দিয়ে যেতে।'

'বেশি টাকা নেবে না?'

'নিক। আজকের রাতটাই শুধু।' পাশ ফিরল তমা, 'বাঃ, টিভিও আছে। এই, খুলে দাও না। প্লিজ।'

টিটো টিভি খুলে দিয়ে অপারেটরকে বলল রুম সার্ভিস দিতে। টেলিফোনের পাশেই মেনু কার্ড ছিল। তাই দেখে রাত্রের খাবারের অর্ডার দিয়ে দিল। মনে মনে বলল, 'একটা রাত নবাবি করে নাও টিটো মুখার্জি।'

টিভিতে সিরিয়াল হচ্ছিল। টিটো বাথরুমে ঢুকল ব্যাগ নিয়ে। তার জামাকাপড় ইতিমধ্যে বেশ নোংরা হয়ে গেছে। দুই প্রস্ত কেনা দরকার। এত টাকা ফালতু খরচ না করে ওদিকে মন দিলে ভাল হত। অন্যের পয়সায় মৌজ করে বদ অভ্যাস তৈরি করা হয়ে গেছে।

পোশাক পরিবর্তন করে বাথরুম থেকে বেরুতেই খবর আরম্ভ হল। ভারত পাকিস্তান সীমান্তে বিরোধ নিয়ে দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেছেন পাঞ্জাবে খলিস্থানীদের একটা বিরাট দল ধরা পড়েছে। চন্দ্রশেখর কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে ভাবছেন। কলকাতায় একটি দুঃসাহসিক ঘটনায় দু'জন রাজনৈতিক নেতা এবং একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রচণ্ড আহত হয়েছেন।

টিটো এবং তমা চোখাচোখি করল। এবার মূল খবরগুলো সবিস্তারে বলা হচ্ছে। টিটো সোফায় বসে পড়ল। নিঃশব্দে ওরা খবর শুনে গেল অথবা কিছুই শুনছিল না। এবার আসল খবরটি শুরু হতেই দু'জনে নড়েচড়ে বসল। তিনজন মানুষকে একই ফ্ল্যাটে গুরুতর জখম অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তিনজনই এখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দুই রাজনৈতিক নেতা একই দলের পরস্পরবিরোধী দুই উপদলে বিভক্ত। এঁরা কেন ওই

ব্যবসায়ীর সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন তা পুলিশ অনুসন্ধান করছে। কলকাতার অনেক নেতাই এই ঘৃণ্য আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ইতিমধ্যে যেটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে একজন রহস্যময়ী নারী জড়িত কিন্তু তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

খবর শেষ করতেই টিভি বন্ধ করে দিল টিটো। তমা বলল, 'হয়ে গেল পুলিশ এবার আমার পেছনে ধাওয়া করবে।'

'তুমি যে সেই রহস্যময়ী তা জানবে কি করে?' টিটো বিড়বিড় করল।

'পুলিশ ইচ্ছে করলে সব পারে।' তমা চুলে হাত বোলালো। তারপর বলল, 'বাদলদার ফ্ল্যাটের দারোয়ান আমাকে দু'বার দুটো লোকের সঙ্গে ঢুকতে দেখেছে। আমার ফ্ল্যাটের দারোয়ানও একই সাক্ষী দেবে। ভার্মার ড্রাইভারও বলবে আমাদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে। আর আমি কে তা বের করতে পুলিশের ক'দিন আর লাগবে বল?' তমা হাসল, যদি পুলিশ না পারে, তাহলে সুস্থ হয়ে ভার্মা আমাকে ছেড়ে দেবে না।'

'তুমি একটু নার্ভাস হয়ে গেছ। ভার্মারা কোনদিন সুস্থ হবে না। হলেও পুলিশকে তোমার কথা বলবে না। হাওড়া থেকে কেউ শিলং-এ আসে না। আমরা যে এখানে আছি সেকথা পুলিশ চিন্তাও করতে পারবে না। মাস ছয়েক শিলং-এ থাকতে পারেল সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত।' টিটো উঠল। হুইস্কির বোতল খুলে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে?

'দাও। সত্যি নার্ভাস লাগছে।' তমা হাত বাড়াল।

দু'জনে দুটো গ্লাস নিয়ে খানিকটা দূরত্ব নিয়েই বসেছিল। হঠাৎ তমা জিজ্ঞাসা করল, 'মাস ছয়েক চালাতে গেলে কোথায় থাকবে?'

'আর যাই হোক, হোটেলে নয়। দিন তিনেকের মধ্যে হোটেল ছাড়তে হবে আমাদের। তার আগে একটা বাড়ি ভাড়া করা দরকার।' টিটো বলল।

ওরা চুপচাপ যখন তিনটে গ্লাস শেষ করেছে তখন দরজায় শব্দ হল। তমা টিটোর দিকে তাকাল। টিটো বলল, 'রুম সার্ভিস মনে হচ্ছে।'

ওদের খাবার ঘরে দিয়ে চলে গেলে টিটো বলল, 'তুমি খেয়ে নাও।'

'তুমি খাবে না?'

'ঘুম পাবে না এখন। আর একটু খাই।' গ্লাস নাচাল সে।

'আমি একা ডিনার করবো না। আমাকেও দাও।'

'তুমি মাতাল হয়ে যাবে।'

'হই হব।'

' সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমাদের সতর্ক হয়ে চলতে হবে।'

'আমি এমন কিছু করব না যাতে বিপদ আসে।'

ওরা যখন পাঁচ পেগ শেষ করেছে তখন তমা বলল, 'টিভিতে যা বলল তাতে মনে হচ্ছে পুলিশ তোমার অস্তিত্ব টেরই পায়নি।'

টিটো তাকাল। নেশা তারও হয়েছে কিন্তু তমার গলা একদম জড়িয়ে গেছে হোটেলে পৌঁছেই তমা বাথরুমে ঢুকে শাড়ি পাল্টেছিল। পা ঢাকা ম্যাক্সি বের করে টলতে টলতে বলল, আমি চেঞ্জ করে আসি।'

'তুমি বোধহয় এখন পারবে না। খেয়ে শুয়ে পড়।'

'আলবাৎ পারব।' কাঁধ থেকে পড়ে যাওয়া আঁচল সামলালো তমা। তারপর বলল, 'আমি তোমার বন্ধু। ভাল উপদেশ দিচ্ছি। তুমি যদি চাও এখনই কেটে পড়তে পার। ভার্মাদের কেসে পুলিশ তোমাকে জড়াতে পারবে না।'

'আবার বলছি, নেশা হয়েছে তোমার। উল্টোপাল্টা বলছ।'

'বলছি?' সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল তমা।

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ম্যাক্সিটাকে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল তমা। তার আঁচল এখন বুকে নেই। কাটা কলাগাছের মত সোজা পড়ে গেল বিছানায়। পড়ে স্থির হয়ে গেল। টিটো বোতলটাকে দেখল। দশ পেগের বেশি দু'জনে খায়নি। তমাকে নিত্য মদ্যপান করতে হয়। পাঁচ পেগ ওর কাছে বেশি নয় তাই এতেই এমন আউট হয়ে যাবে কেন? অবশ্য মনে গোলমাল হলে অল্পেই অনেক সময় নেশা হয়ে যায়। ছয় নম্বর পেগটা নিয়ে আবার টিভি খুলল টিটো। ইংরেজি খবর হচ্ছে। বিশ্ব, হিন্দুস্থানের খবর শেষ করে যখন পাঠক কলকাতার খবরে এল তখন ওই নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও টিটোর মেরুদণ্ড কেঁপে উঠল। দুই রাজনৈতিক নেতা এবং একজন ব্যবসায়ীর ওপর জঘন্য আক্রমণের বর্ণনা দিয়ে পাঠক জানালেন আজ সন্ধ্যের একটু পরে একজন নেতা এবং ব্যবসায়ী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ফ্ল্যাটের মালিক বলে কথিত নেতাটি এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন।

টিটো বিছানার দিকে তাকাল। তমা এখন অচেতন। খবরটা ওর কানে পৌঁছয়নি। আগামী কয়েকদিনের খবরের কাগজ না পড়লে ও জানতেও পারবে না। ভার্মা মারা গেছে মানে মাথার ওপর থেকে একটা ধারালো খাঁড়া

মরে যাওয়া। বাদলদা মরে যাওয়ার আগে কিছুতেই মুখ খুলবে না। পুলিশের উৎসাহ আর কতদিন থাকবে। বাদলদা যদি ছবি হয়ে যেত তাহলে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তবু মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল টিটোর। টলতে টলতে টেবিলের কাছে গিয়ে সে খাবার খেতে বসল গ্লাস হাতে নিয়েই। অল্প খেয়েই মনে হল পেট ভরে গেছে। গ্লাস শেষ করে সে বিছানার দিকে তাকাল। তারপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল। ঘরের আলো জ্বলছিল, টিভিও বন্ধ হয়নি। কিন্তু আবার উঠে বন্ধ করতে একদম ইচ্ছা করছিল না তার।

হঠাৎ একটা অস্বস্তি হতেই চোখের পাতায় আলো লাগল তমার। সে চোখ খুলল। ছাদ, আলো, হোটেলের ঘর। সে একটু একটু করে উঠে বসে বুঝল এখনও নেশা ছেড়ে যায়নি। কবজির ঘড়িতে এখন রাত আড়াইটে।। টিভি থেকে অদ্ভুত আলো ঠিকরে বের হচ্ছে এবং টিটো কোথাও নেই। সে বিছানা থেকে কোনমতে নামতেই টিটোকে দেখতে পেল। বাঃ, একেবারে শিশুর মত ঘুমোচ্ছে লোকটা। কিন্তু কার্পেটে কেন? এরকম একটা শীতের রাত্রে হোটেলের চার দেওয়ালের মধ্যে তার মত একটি পূর্ণ যুবতীকে পেয়েও টিটো বিছানায় আসেনি কেন? তমা ভেবে পাচ্ছিল না। পুরুষ মানুষ তাকে দেখা মানেই সুযোগের অপেক্ষা করেছে কখন হাত বাড়াতে পারে। এরকম ঘর আর একটি পুরুষ মানে তার শরীরকে কিছুটা অত্যাচার সহ্য করতে হবে এমন একটা ধারণা মনের মধ্যে বসে গেছে। তাহলে টিটো আলাদা হবে কেন? টিটো কি পুরুষ নয়?

তমা নিজের ম্যাক্সিটাকে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল। টলতে টলতে সেটা তুলে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। এই ঠাণ্ডায় গরম জলের কল না খুলে ঠাণ্ডাতেই ঘাড় গলা মুখ ভেজাল। আঃ। বেশ আরাম লাগছে। টিটো কি তাকে ঘেন্না করছে? বন্ধু বলেছে ঠিক আছে, কিন্তু স্পর্শ করতে চাইছে না? মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার।

কলকাতার পুরুষগুলোকে চিনতে তার বাকি নেই। শরীর দেখে সবকিছু ভুলে যেতে ওদের এক মিনিটও লাগে না। টিটো বোধহয় বেশি মদ খেয়েছে তাই আর দাঁড়াতে পারেনি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আলো নেভাল তমা, টিভি বন্ধ করল। তারপর খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। সামনে শোওয়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে সে ডাকল, 'টিটো!' কোন সাড়া এল না। তৃতীয়বার ডাকার পর টিটো

আধাঘুমে বলল, 'উঁ।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?' তমা জিজ্ঞাসা করল।

'টিটো জবাব দিল না। খুব রাগ হয়ে গেল তমার। সে জোরে পা ছুঁড়তেই টিটোর থাইতে আঘাত লাগল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে কে?'

অন্ধকারে উত্তর শুনল, 'আমি তমা।'

'ও। কি হয়েছে?'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'জানি না।'

'কি জানো?'

'উঃ। কি হয়েছে বল?

'বললাম তো! ভালোবাসো কি না জানো না?'

'বাসতাম না। এখন মনে হচ্ছে বাসি।' টিটোর গলায় বিরক্তি।

অন্ধকারে শব্দ করে হাসল তমা, 'গুড। আমার সঙ্গে শোবে না?'

'না।'

'কেন?' গলা উপরে উঠল তমার।

'আমার, আমার অসুখ আছে।' টিটো শুয়ে পড়ল আবার।

হঠাৎ একেবারে পাথর হয়ে গেল তমা। সমস্ত শরীরে কি যেন কিলবিল করে উঠল। এই একটা ভয় তাকে প্রায়ই আক্রমণ করত। ঈশ্বর সবসময় তাকে রক্ষা করেছেন। আর যার সঙ্গে পালিয়ে এল খাঁচা ছেড়ে তারই--। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিছানার মাঝখানে চলে এল সে। যদি টিটো মত পরিবর্তন করে, যদি সে কার্পেট ছেড়ে বিছানায় চলে আসে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল সে কিছুক্ষণ। একটু একটু করে অনেকটা সময় চলে গেলে তমা আবিষ্কার করল নেশা কখন মিলিয়ে গেছে এবং তার ঘুম আসছে না। এখন সে কি করবে? একটা অসুস্থ মানুষের সঙ্গে সে চিরজীবন থাকতে পারবে না। যদি টিটো নিজে থেকে তাকে না জানাতো? হঠাৎ তার মনে একটা খটকা লাগল। যার অসুখ থাকে সে কি কখনো নিজে থেকে জানায়? অসম্ভব। ঘুমবার জন্যে তাকে এড়াতেই ওই কথাটা তাকে বানিয়ে বলল না তো? সন্দেহটা বড় হতেই অস্বস্তিটা চলে গেল। ঘুম এসে গেল আপনাআপনি।

সকালে ঘুম ভাঙল তমার টিটোর ডাকে। চোখ খুলতেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে টিটো বলল, 'ম্যাডাম, চা।'

সঙ্গে সঙ্গে অসুখ শব্দটি মনে এল। এই টিটো কি অসুস্থ? যাঃ। হতেই পারে না। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ তাকে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘুম থেকে তোলেনি। সে উঠে বসে কাপ নিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে টিটো বলল, 'ঘুমলে বটে। আজ থেকে তুমি আর অত ড্রিঙ্ক করবে না। কিন্তু বিছানায় পড়েছিলে শাড়ি পড়ে আর উঠে এলে ম্যাক্সি গায়ে। চেঞ্জ করলে কখন?'

'মনে নেই।'

'তাহলেই বোঝ কাণ্ডটা!'

'তুমি কার্পেটে ঘুমলে কেন?'

'কখন দেখলে?'

'না দেখলে জিজ্ঞাসা করব কেন?'

'এমনি। বেশ মোটা কার্পেট।'

'বিছানাটা যথেষ্ট বড়।'

'হয়তো খেয়াল ছিল না কথাটা।'

'না। তুমি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়েছ।'

'কোন মহিলা যখন অচেতন থাকেন তখন তাকে একাই ঘুমাতে দেওয়া উচিত। যাক, বাজে কথা না বলে তৈরি হও।'

'কোথায় যাবে?'

'জায়গাটা ঘুরে দেখি।'

'তুমি যাও। আমি ঘরেই থাকি।'

'কেন?' টিটো তাকাল, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'কেউ চিনে ফেলুক আমি চাই না।'

'কিন্তু হোটেল থেকে না বেরুলে ওরা সন্দেহ করবে।'

'তুমি এখন যাও। আমি সন্ধ্যের সময় বের হব।'

অগত্যা টিটো একাই বের হল। চমৎকার মিষ্টি রোদ উঠেছে। বাজারে গিয়ে সে দুটো সোয়েটার আর একটা মোটা চাদর কিনল। খোঁজ নিয়ে জানল দুপুরের আগে খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে সে লাসামিয়াতে চলে এসেছিল। অবস্থাপন্ন মানুষের বাস বলেই পাড়াটা বেশ নির্জন। একটা

ছোট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির গেটে চোখ পড়তেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। গেটের গায়ে 'টু লেট' বোর্ড ঝোলানো।

প্যাকেটগুলো হাতে নিয়েই সে গেট খুলল। পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাগান টিটো দেখল এক বৃদ্ধা মহিলা বারান্দায় বসে আছেন। সে নমস্কার করতেই বৃদ্ধা হাত জোড় করলেন। ভদ্রমহিলাকে বাঙালি বলেই মনে হল তার। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, গেটে যে নোটিশবোর্ড দেখলাম সেটা সম্পর্কে কার সঙ্গে কথা বলব?'

বৃদ্ধা বললেন একটু সিলেটি টানে, 'বলুন।'

'এই বাড়ি কি ভাড়া দেবেন?'

'হ্যাঁ। আপনি কি করেন?'

টিটো ইতস্তত করল। বৃদ্ধা তার দিকে তাকিয়ে। সে হাসল, 'বলতে একটু সঙ্কোচ হয়, আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, কিন্তু, এই সার্কেলের দায়িত্বে আছি। খুব বড় চাকরি নয়। হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছি। মুশকিলে পড়েছি।

'বাড়ি কোথায়?'

'শিলিগুড়িতে।'

'ও। শিলিগুড়িতে আমার এক ভাইপো থাকে। স্ত্রী সেখানে?'

'না না। ও আমার সঙ্গেই এসেছে। আমরা হোটেলে আছি।'

'সেকি? এইভাবে ব্যবস্থা না করে আসতে হয়?'

'কি বলব বলুন! আজকালকার মেয়ে, জেদী বড্ড।'

'উঁ। ভাড়া দেব ঠিক করেছি কয়েকদিন হল। একাই থাকতাম আমি। এখন কলকাতায় ছেলের কাছে চলে যাচ্ছি। তবে একটা ঘর তালা বন্ধ করে রেখে যাব। ইচ্ছে হলে এসে থাকব। হাজার টাকা দিতে হবে আর তিনমাসের অ্যাডভান্স। যখন প্রয়োজন হবে নোটিশ দিলে তিন মাসেই ছেড়ে দিতে হবে

'তা দেব। কিন্তু মাসীমা, তিন হাজার আমার পক্ষে খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে

'আমার ছেলে তাই বলতে বলেছে। সে-কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে যাওয়ার আগে ভাড়াটে পেলে খোঁজ খবর নিয়ে তাতে সই করিয়ে নিতে। তা তোমার অবস্থা যা, কত দিতে পারবে?'

'দু'হাজার।'

'ঠিক আছে, বিকেলে বউ নিয়ে এসো। দুপুরে ছেলের ফোন করার কথা আছে, কথা বলে রাখব।' বৃদ্ধা বললেন।

ফেরার পথে যেন উড়ছিল টিটো। এত তাড়াতাড়ি এভাবে কপাল খুলে যাবে সে কল্পনাই করেনি। বাজারের কাছে এসে দেখল খবরের কাগজ বিলি হচ্ছে। একটা কিনে নিয়ে হোটেলে ফিরল সে। হোটেলে ঢুকতেই রিসেপসনিস্ট বলল, 'স্যার, চেরাপুঞ্জি যাবেন?'

টিটো মাথা নাড়ল, 'না ভাই। আজ নয়।' সে নিজেদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সিঁড়ি ভেঙে। তিনবার দরজায় নক করার পর তমা খুলল। ওর চোখে কালো চশমা, 'ও, তুমি। আমি স্নান করতে ঢুকেছিলাম।'

দরজা বন্ধ করে টিটো বলল, 'বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি। এক হাজার ভাড়া, দু'হাজার অ্যাডভান্স। নির্জনে সুন্দর বাংলো।'

'গুড।' তমা বাথরুমে ঢুকে গেল কিন্তু দরজা বন্ধ করল না। সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করল, 'কবে থেকে পাওয়া যাবে?'

'দু-একদিনের মধ্যেই। এক বৃদ্ধা মহিলা থাকেন, কলকাতা চলে যাবেন। এই, তোমার জন্যে একটা চাদর এনেছি। দেখবে না?' টিটো চাদর তুলে ধরল।

বাথরুমের দরজায় বেরিয়ে এল তমা। এখন তার ম্যাক্সি খোলা। বিলিতি সিনেমায় সমুদ্রতটে বিকিনি পরা যেসব মেয়েদের টিটো দেখেছে তাদের একজন হয়ে তমা দাঁড়িয়ে আছে। তমা বলল, 'বাঃ দারুণ কালার।'

'নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে টিটো জিজ্ঞাসা করল, 'পছন্দ হয়েছে?'

'খুউব।' তমা ঘাড় কাত করে হাসল।

হঠাৎ টিটো বলে ফেলল, 'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তমা।'

'তাই?'

'সত্যি বলছি।'

'যাক, তুমি তবু বললে, নইলে জানতেই পারতাম না।' হেসে দরজা বন্ধ করে দিল তমা। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিল টিটো। এত অত্যাচার সহ্য করেও মেয়েটা কত সুন্দর। সে নিজেও তো ভাল নয়। কিন্তু কেউ তাকে খারাপ ভাবছে শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়।

টিটো খবরের কাগজ খুলল। প্রথম পাতার নিচের দিকে খবরটা ছাপা হয়েছে। ভার্মা এবং তার বন্ধু মরে গিয়েছে। বাদলদা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। সে কি খুব জোরে মেরেছিল? টিটো মনে করতে পারল না। পুলিশ জানতে পেরেছে ওই ফ্ল্যাটটির মালিক বাদলদাই। সমস্ত সময় ফ্ল্যাটটি তালাবন্ধ থাকত। ঠিক কি কারণে এরা ওখানে মিলিত হয়েছিল সেটা রহস্যময়। ব্যাস, খবর

এটুকুই। টিটো মুখ তুলে বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। তমা যদি জানতে পারে দু'জন মারা গিয়েছে তাহলে খুব নার্ভাস হয়ে পড়বে। সে তো মেরে ফেলবার জন্যে মারেনি। টিটো তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটাকে কার্পেটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল সমান করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসল সে। পুলিশ একমাত্র দারোয়ানদের কাছে জানতে পারে তমা ওই দু'জনকে বাদলদার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিল। তমাকে খুঁজতে পুলিশ নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে। কিন্তু তার সঙ্গে জড়াবে কি করে? কোন চান্স নেই। এই সময় তমা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। পরনে সাদা শাড়ি, সাদা জামা। চমৎকার দেখাচ্ছে এখন। সোজা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে বলল, 'কোন খবর পেলে?'

'নাঃ। নো নিউজ। খেতে যাবে?'

'ঘরে খাওয়া যায় না?'

'যায়। কিন্তু দিনের বেলায় কেউ খায় না।'

'যদি চেনা লোক কেউ থাকে?' তমা ইতস্তত করল।

টিটো এগিয়ে এসে তমার পিঠের আঁচলটা মাথায় তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল। একটি মিষ্টি বউ ছাড়া কিছুই ভাবা যাচ্ছিল না। মুখ ফিরিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখল তমা। তারপর বলল, 'জীবনে এমনটা তো কখনও ঘটেনি, ঘটবেও না।'

'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত হলে কি করে?'

'জানি মশাই জানি। যাক, স্নান করবে না?'

'একদম বিকেলে। চল, খিদে পেয়েছে।'

দু'জনে ডাইনিং রুমে বসে স্বচ্ছন্দে খেতে পারল। ঘরে যারা ছিল তাদের কেউ কেউ তমার দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল কিন্তু তার বেশি কিছু নয় ঘরে ফিরে তমাকে টিটো বলল, 'দেখলে তো, মিছিমিছি ভাবছিলে?'

তমা বলল, 'এটা হোটেল। আমার সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তারা হোটেলেই ঘোরে। বুঝলে? কখন বেরুবে?'

'যা বললে, সন্ধ্যের পরে।'

'নাঃ। বিকেলেই যাব।'' তমা বিছানায় শুয়ে পড়ল, 'শোবে না?'

'দূর। একটু আগে শুনে এসেছি এখানে তীর-খেলা হয়। তাই দেখতে যাব কপালে থাকলে কিছু টাকা আসতে পারে।'

'মানে?'

'বাজারে একটা জায়গায় বেটিং নিচ্ছিল। নম্বর বলতে হবে। সেই নম্বর যদি মিলে যায় তাহলে এক টাকায় পাঁচ দশ—এমন টাকা পাওয়া যায়।'

'কি ভাবে?'

'মাঠে একটা বোর্ডে কয়েকজন তীর ছুঁড়বে। যেসব তীর টার্গেটে লাগবে সেগুলো জড়ো করে গোনা হবে। সংখ্যাটাকে যোগ করে করে যেটা দাঁড়াবে সেই নম্বরটি আগাম যে বলবে সে-ই টাকা পাবে।'

'সাহসী হচ্ছ?'

হঠাৎ আবার গা এলিয়ে দিল তমা, ' না থাক। এই , তুমিও যেও না!'

'ঘরে বসে থাকব?'

'আমি একা থাকতে পারব না। উল্টোপাল্টা চিন্তা হয়।'

'অগত্যা—' টিটো বালিশ তুলে কার্পেটে ফেলল।

'তুমি নিচে শোবে নাকি?'

'আরাম কম হয় না।'

তমা উঠে বসল, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে ঠিক ভাল ভাবো না, না?'

কথাটার মানে বুঝলাম না।'

'দেশে গেলে আমার মা আমাকে ঠাকুরঘরে ঢুকতে দেন না যদিও আমারই টাকায় সংসার চলছিল। কেন জানো? আমি অন্তত গোটা দশেক লোকের সঙ্গে শুতে বাধ্য হয়েছি, সতীত্ব চলে গিয়েছে, তাই।'

'গল্পটা আমাকে শোনালে কেন?'

'তুমিও সেই একই চোখে আমাকে দেখছ।'

ধারণা কি করে হল?'

'বাজে বকো না। আমি আর যাই হোক, পুরুষ মানুষ চিনি। পুরো একটা রাত আমার শরীরটাকে হাতের কাছে পেয়ে ছুঁয়েও দেখবে না এমন পুরুষ আজ পর্যন্ত একটিও দেখিনি। আমার কৃপা পাওয়ার জন্যে ভার্মার চোখ এড়িয়ে কত বিখ্যাত লোক ছোঁক ছোঁক করেছে। তাদের চরিত্র আমি জানি। কিন্তু তোমার মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে আমার খুব খারাপ রোগ আছে। কাল রাত্রে নিজেকে বাঁচাতে তুমি বলেছিলে তোমারই অসুখ আছে।' এক নিঃশ্বাসে বলে গেল তমা।

কার্পেটে শুয়ে পড়ে টিটো বলল, 'ধর, আমি তোমাকে ছুঁতে গেলাম আর

তুমি চিৎকার করে বললে আমি লম্পট ইতর, সুযোগ পেয়ে—।'

'ঠিক আছে বাবা।' তমা বাধা দিল, 'আর কথা বলার দরকার নেই।'

টিটো চোখ বন্ধ করল। দুপুরে ঘরে ঢোকার পর তমার স্বল্পবেশে যে ফিগার দেখেছে তা মনে পড়ল। সত্যি লোভনীয়, সত্যি। জীবনে সে আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গে কিছু করেনি। কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল সে। সময় তো চলে যাচ্ছে না। দেখাই যাক না।

বৃদ্ধার বেশ পছন্দ হয়ে গেল তমাকে। নিজেই আলো জ্বেলে ঘর দেখালেন। বললেন, 'ভালই হয়েছে, এসেছ। আজ ছেলে টেলিফোনে বলল কালই আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বায়ুদূতের টিকিটও করে ফেলেছি। তোমাদের কবে থেকে বাড়িটা দরকার। মাসখানেক অপেক্ষা করলে ছেলে আসবে।'

তমা বলল, 'মাসীমা, তাহলে আমি মরে যাব। আমাকে হোটেলে রেখে ও এখানে ওখানে কাজে যায়। আমার আজই পেলে ভাল হয়।'

বৃদ্ধা বিব্রত হলেন। মুখের ওপরে না বলতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরকে পাঠালেন এক প্রতিবেশীর কাছে, ওঁর অবর্তমানে যিনি বাড়িটি দেখাশোনা করেন।

টিটো একটু নার্ভাস হল। যিনি আসছেন তিনি কি ধরনের লোক বোঝা যাচ্ছে না। আর যাই হোক, তাদের ছবি যদি কোথাও ছাপা না হয়ে থাকে তাহলে তেমন ভয় নেই। ভদ্রলোক এলেন। বছর ষাটেক বয়স। বৃদ্ধার কাছ থেকে সব শুনে একটু আধটু প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, 'আসলে এ বাড়িতে ফার্নিচার প্রচুর। ভাড়া যাকে দেওয়া হবে তার ওপর ভরসা যদি না করা যায় তাহলে, আপনার অফিস কোথায়?'

টিটো বলল, 'আমার অফিস কলকাতায়। যে বাড়ি ভাড়া নেব সেখান থেকেই কাজকর্ম চালাতে হবে।'

বৃদ্ধার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে চলে গেলে ঠিক হল আগামীকাল সকালেই ওরা চলে আসবে এই বাড়িতে।

দুপুরের ফ্লাইটে চলে গেলেন বৃদ্ধা কলকাতায়। টিটো তাঁকে বাজারের কাছ থেকে বায়ুদূতের বাসে তুলে দিয়ে এল। ফেরার পথে টুকটাক বাজার করে খবরের কাগজ কিনে নিল। কাল রাত্রেই ঠিক হয়েছিল আপাতত তারা হোটেলেই খাবে। শুধু চা কফি বাড়িতে। টিটো খাবার কিনে আনবে টিফিন ক্যারিয়ারে

করে। অনেককাল রান্নার অভ্যেস নেই তমার, তার সরঞ্জামও নেই। কিন্তু বৃদ্ধা তাদের বলেছেন চাকরটিকে রাখতে। এতে কাজকর্মের সুবিধে হবে। রান্না করবে ও। লোকটা ভাল। একদম ইচ্ছে না টিটোর কিন্তু মেনে নিতে হল। ওরা বুঝল, বৃদ্ধা আচমকা উটকো লোকের হাতে সবকিছু ছেড়ে যেতে চাইছেন না বলেই চাকরকে জুড়ে দিলেন। কিন্তু লোকটা ভাল। পুরনো রান্নাঘরেই সে আয়োজন করেছে।

বাড়িতে ফিরে দেখল বাইরের দরজা বন্ধ। পাশের রাস্তা দিয়ে ঢুকে সে শব্দ করতেই চাকরটা দরজা খুলে দিল। দিয়ে বলল, 'বউদিদি বেরিয়েছেন।'

অবাক হল টিটো, ' কোথায়?'

'কাল রাত্রে যে বাবু এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। ও বাড়ির মা এসে নিয়ে গেছেন।'

টিটো মনে মনে বলল, 'সর্বনাশ। মেলামেশা বাড়ানোটা উচিত হচ্ছে না। ও ভেতরের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ খুলল। প্রথম পাতায় তাদের কোনও খবর নেই। তৃতীয় পাতায় ছোট্ট করে বলা হয়েছে বাদলদার মাথায় অপারেশন হবে। বোম্বে হতে চিকিৎসক আসছেন। এখনও পুলিশ ওই ঘটনার কোন কিনারা করতে পারেনি। তবে মনে হচ্ছে দুই উপদলের নেতার সংঘর্ষে ব্যবসায়ী ভার্মা জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবং এই ব্যাপারে একটি স্ত্রীলোক জড়িত।

কাগজটাকে কি করা যায় ভাবতে গিয়ে টিটোর মনে পড়ল গতকাল সে একটা খবরের কাগজ কার্পেটের নিচে রেখে এসেছে। কোন কারণে কার্পেটি সরালে সেটা পাওয়া যাবে। অবশ্য কেন কাগজটা ওখানে রাখা হয়েছিল তা কি বুঝতে পারবে হোটেলের কর্মচারীরা? টিটো কাগজটাকে ভাঁজ করে এককোণে ফেলে রাখল এমনভাবে যাতে মনে হয় ওটা পুরনো কাগজ।

তমা ফিরল দুটোর একটু আগে। বলল, 'কিছুতেই ছাড়বেন না ভদ্রমহিলা খাইয়ে দেবেনই। ভাষা বুঝতে পারি না ভাল করে। সিলেটের লোক। বলে, তোমার বরকে ডেকে আনছি, এখানেই থাক। অনেক কষ্টে কাটালাম।'

টিটো দেখল তমার চেহারা বেশ স্বাভাবিক। সে বলল, 'যতটা পার এড়িয়ে চল প্রতিবেশীদের। কেউ বলতে পারে না কোথা থেকে কি হবে!'

কাঁধ নাচিয়ে ভেতরে চলে গেল তমা।

সেই রাত্রে তমা কাছে এল, 'শোন, আমার খুব ভাল লাগছে।'

'কি?'

'এই সংসার করা। আমাকে এর আগে কেউ বউদি বউমা বলে ডাকেনি।'

'ভালই তো!'

'আমরা এভাবে সারাজীবন থাকতে পারি না?'

'টাকা ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পারি।'

'তুমি একটা চাকরির চেষ্টা করো না!'

'আমার যা বিদ্যে কেউ কাজ দেবে না।'

'যে কোন কাজ?'

'দেখি।'

'আমি চেষ্টা করবো?'

'তুমি?' টিটো হাসল, 'তোমাকে কেউ না কেউ চিনে ফেলবে।'

'অন্য কোথাও যাওয়া যায় না?'

'কোথায় যাবে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও বাঙালি পাবে।'

'বিদেশে?'

'পাগল!'

'আমি জানি না, তোমাকে রোজগার করতেই হবে। দেখো, আমি তোমার খুব ভাল বউ হবো। খুব আনন্দে থাকব আমরা।'

'শুনতে খুব ভাল লাগছে।'

'না। একদিনেই আমার জীবনটা বদলে গেছে।' হঠাৎ দু'হাতে টিটোকে জড়িয়ে ধরল তমা, 'প্লিজ!'

নির্জন ঘরে আধা অন্ধকারে শিহরিত হল টিটো। সে তমাকে চুম্বন করল তারপর, অনেকক্ষণ চলে গেলে, দু'জনেই যখন পরিপূর্ণ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে চুপচাপ, তখন তমার হাত টিটোর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। হঠাৎ টিটোর মনে হল তমার কাছে কোন কথা লুকানো উচিত নয়। সে পাশ ফিরল, 'শোন, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।'

'খবরের কাগজে—।' ইতস্তত করল টিটো।

'না। কলকাতার কোন খবর আমি শুনব না।'

'উহুঁ শোন। খবরের কাগজে পড়লাম বাদলদার মাথায় অপারেশন হবে

াঁচার সম্ভাবনা কম। বোম্বে থেকে ডাক্তার আসছে।' টিটো অনুভব করল ৮মার আঁকড়ে রাখা হাতই হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। কোন শব্দ বের হল না ঃর মুখ থেকে। এমন কি ভার্মাদের কথাও জিজ্ঞাসা করল না।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'কিছু না।' তারপর একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব জোরে মেরেছিলে?'

'বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি খুন করতে চাইনি।'

'কিন্তু হঠাৎ তুমি কেন অত খেপে গেলে বলো তো?'

'লোকগুলো বদমাস। আমাদের দেশের মানুষের শত্রু। ওরা বেঁচে থাকলে মনেকের ক্ষতি হত তমা, এটা অস্বীকার করতে পার?'

'না। তাহলে তুমি মারবার জন্যেই মেরেছিলে।'

'ঠিক তা নয়।'

'হঠাৎ তমা উঠে বসল, 'ছেড়ে দাও। ওসব নিয়ে ভাবতে চাই না।'

'আচ্ছা, ধর, ওরা তিনজনেই যদি মারা যায়?'

'মারা যাবে?' অদ্ভুতভাবে স্বর বদলে গেল তমার।

'ধরো—!'

'আমার খারাপ লাগবে। খুব খারাপ।'

'ভার্মারি জন্যে?'

'হ্যাঁ। লোকটা আমার অনেক উপকার করেছে। আমি ওকে মানতে পারিনি সেটা অন্য ব্যাপার, আমি চলে এসেছি বলে কোন অন্যায়বোধ আমার নেই, কৈন্তু ও মরে যাক, তা আমি কখনও চাইব না।'

'তাহলে শোন, বাদলদা এখন প্রাণের জন্য লড়ছে কিন্তু বাকি দুজন বেঁচে নেই। সেই রাত্রেই মারা গিয়েছে।'

অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তমা। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল টিটো।

এই সংসার এখন আপাতচোখে আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মত স্বাভাবিক। টিটো রোজ কাজ খুঁজতে বের হয় এবং যথারীতি বিফল হয়ে ফিরে আসে। তমা রান্নাঘরে ঢুকছে একটু আধটু। ঘরদোর ঠিক রাখে। বই পড়ে। বৃদ্ধার আলমারিতে প্রচুর বই পেয়ে গেছে সে। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় অন্যের সংসারে তারা অভিনয় করতে এসেছে। সব জায়গায় বৃদ্ধার স্মৃতি

ছড়ানো। খুব প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া টিটোর সঙ্গে তমার আলাপ হয় না। রাত্রে একই ঘরে শুতে হয় চাকরটা আছে বলেই কিন্তু পাশাপাশি খাটে শুলেও দূরত্ব এক আকাশ হতে পারে এটা এতদিনে টের পেয়ে গেছে ওরা।

তিন মাস বাদে যখন টিটোর পকেট খালি, তমার কাছে হাত পাততে হবে তখন আচমকা একটা চাকরি পেয়ে গেল সে। তদারকির কাজ। রাস্তা সারাই থেকে জঙ্গলে কাঠ কাটা, হরেক রকম ব্যবসা আছে এমন এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহ পেল কপালজোরে। মাইনে পনেরশো টাকা। তমা শুনল, কিছু বলল না। এই টাকায় ভাড়া মিটিয়ে কোনমতে খাওয়া দাওয়া যায়। স্কচ দূরের কথা ভারতীয় মদ খাওয়া স্বপ্নের বাইরে। শরীরে দারিদ্রের ছাপ পড়ছিল। মাস ছয়েক পরে হঠাৎ এক রবিবারের সকালে টিটোর মনে হল তমার শরীরটা অন্যরকম। পেট বেশ বড় দেখাচ্ছে। তমাকে প্রশ্ন করতে সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার বাচ্চা হবে।'

হাঁ হয়ে গেল টিটো। 'আমাকে বলনি কেন?'

'বললে কি করতে?'

'বাঃ, এটা একটা দারুণ খবর!'

'কিন্তু মনে রেখো, আমাদের মাত্র এক রাত সম্পর্ক হয়েছিল। খবরটা শুনে তোমার সন্দেহ হচ্ছে না? এখানে আসার আগে যদি কিছু হয়ে থাকে?'

'নাও তো হতে পারে। এখানে আসার পর হয়নি তাই বা কে বলবে?'

তমা অবাক হয়ে তাকাল, 'আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝার কি আছে?'

'আমি তোমাকে বলতে পারিনি ভয়ে, যদি তুমি সন্দেহ কর, যদি তুমি অস্বীকার করো!' তমা কেঁদে ফেলল।

'এবারে আমাদের বিয়ে করা দরকার তমা!' টিটো এগিয়ে এসে তমার দুটো হাত ধরল। মাথা নাড়াল তমা, চোখে জল নিয়ে বলল, 'দূর!'

'তাহলে?' টিটো বুঝতে পারছিল না কি বলা উচিত।

'তুমি আমাকে কোনদিন ভালবাসতে পারবে না টিটো, আমিও তোমাকে মন থেকে কখনই মেনে নিতে পারব না টিটো, শুধু শুধু বন্ধনে জড়িয়ে লাভ কি?'

'কিন্তু যে আসছে তার কথা একবার ভাববে না?'

'নিশ্চয়ই ভাবব। আমার মত করে ভাবব। তবে এটাও ঠিক, যদি শিলঙে পড়ে থাকতাম, তাহলে ওকে এতটা বড় হতে দিতাম না।'
'তমা?' চিৎকার করে উঠল টিটো।
'চেঁচিও না। আমাকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে?'
'নিজের সন্তানকে তুমি খুন করতে চাইছ?'
'চাইছি না। যখন সময় ছিল পারলে করতাম। তাছাড়া সন্তান তো আমি গ জন্ম দিতে পারি না। ওর একজন বাবাও আছে। সে যদি তিনতিনটে খুন াতে পারে, আমি একটা পারব না?'
সঙ্গে সঙ্গে ওপরে হাত উঠল টিটোর। আঘাত করতে গিয়েও সামলে নিল ষ মুহূর্তে। তমা ফুঁসে উঠল, 'কি হল? থামলে কেন? মারো?'
টিটো সরে এসে চেয়োরে বসল। তমা বলল, 'এরপর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।'
'যাবে কোথায় এই অবস্থায়?'
'কলকাতায়।'
'না। মাত্র ছয় মাস হয়েছে। এখনও কিছু বলা যায় না।'
'আমি কেয়ার করি না।'
'আমি করি। আমার ছেলে তোমার পেটে আছে।'
'আবার বলছি এর কোন প্রমাণ নেই।'
'আর একবার বললে আমি কিন্তু তোমাকে খুন করব তমা।'
তমা ঘুরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে কাছে এল। টিটোর গায়ে সে হাত রাখল। রপর বলল, 'তুমি সত্যি বিশ্বাস করো?'
'হ্যাঁ। আমাদের দু'জনকেই দু'জনের দরকার তমা। এই ছয় মাসের পর আমি র মারপিট করতে কলকাতার রাস্তায় নামতে পারব না।'
'আমিও তো পুরনো জগতে ফিরে যেতে পারব না।'
'হ্যাঁ। তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ।'
'ও পাশের বাড়ির কাকিমা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছে ও কিন্তু ভাল আছে।'
'কিন্তু আমাদের রক্ত নিয়ে তো ও আসবে।'
'আমাদের মনও তো পাবে, তাই না?'
টিটো তমাকে জড়িয়ে ধরল। দুটো শরীরের মধ্যে একটি ছয় মাসের শরীর পৃথিবীর উদ্দেশে তার অব্যবহৃত জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ছিল।

মানুষলীলা

এখন রাগী মেঘেরা নিরুদ্দেশ। একটু আগে নিজের মুখে আগুন পুরে গোল
সূর্যটা পৃথিবীর নিচে নেমে গেলে গাছেরা যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তা
মাটির গন্ধ নেই। তবু পদ্মপাতা নধর কিশোরীর মতো নৃত্য শুরু করে দে
বিলের জলে। হাওয়ারা বয়ে যায়, কোথায় যায়? তখন নির্মেঘ শরীরে আকা
নীলের ফিনকি দেখে। সদ্য লাফিয়ে ওঠা ঘষা আধুলির মতো চাঁদকে তার অস
লাগে।

তাকে এ-দিগন্ত থেকে সে-দিগন্তে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টায় তৎপর হ
আকাশ। তার শরীর থেকে স্বেদ ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু, ঝরে পড়ে পৃথিবী
বুকে। আর সেই পতনের সময় শিশির হয়ে যায় তারা। আর সেই শিশিরে
স্বরে বাতাস কেঁপে ওঠে, ঘাসেরা উদ্বাহু হয়। পদ্মপাতা তাকে টেনে নেয় বুকে
নিয়েই দেখে শিশিরবিন্দু নিটোল মুক্তো হয়ে ট্র্যাপিজের খেলায় মেতেছে। সে
দুলুনি সামলে রাখা দায়। অনিবার্য পরিণতির কথা জেনেই নিচের বিলের জ
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে, দে দোল দোল, দে দোল দোল। আর সেই আহ্বা
পদ্মপাতার মায়া মাখা নিটোল শিশির ডুব দেয় বিলের শরীরে। তখন
অস্তিত্বে আকাশের গন্ধ নেই, পতনপথে ছড়িয়ে থাকা কাঙালেরা সব নীল শু
নিয়ে বিবর্ণ করে দিয়েছে তাকে। এখন সে গহিন বিল যার শরীরে লবণ মিশ
না কোনদিন।

এ বড় মজার খেলা। এই খেলার মজায় মজে থেকে যদি এক জীবন থে
অন্য জীবনে চলে যাওয়া যেত! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যায়নি কে বললে? এ
জীবনে সে কি অন্তত দুই জীবন বেঁচে থাকেনি! অবশ্য বেঁচে থাকা শব্দ দুটো
ঠিকঠাক মানে কি তাই এখন আর স্পষ্ট নয়। ওই যে আকাশে কেউ আচম
আলোর নখ দিয়ে একটা আঁচড় কাটল, চোখের সামনে রেখাটা বেঁচে উ
এবং তার পরই মিলিয়ে গেল, ওর কি মরণ হল? চোখ-কান বন্ধ করলে
সে এখন পাতার পতনশব্দ শুনতে পায়, শব্দ যখন থেমে যায় তখন কি
শব্দের বেঁচে থাকা শেষ? এসব ভাবতে গিয়ে সে দেখেছে, মাথার ভে

ভাবনারা স্কুলের বাচ্চাদের মতো হইহই করে ওঠে, পারলে মারামারিও শুরু করে দেয়। তখন বড় যন্ত্রণা, বড় কষ্ট। তার চেয়ে চেয়ে দেখা, শুধু দেখে যাওয়ায় এক ধরনের মুক্তি আছে, নিজের কাছ থেকে মুক্তি। যে মুক্তির অন্বেষণে সে চলে এসেছে পরিচিত মুখের মিছিল ছেড়ে এই নিরালায়। পুঁথির পাতায় পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষদের কথা লেখা থাকে, যারা বনে চলে যেত। শেষ আশ্রয়। বনে গিয়ে তরা কি করত, তেমন কাহিনী তার পড়া নেই। সবাই নিশ্চয়ই আশ্রম খুলে তপস্যায় বসে যেত না! সেই মানুষগুলো কি করত বনে বনে? সে আছে দিব্যি আরামে। বিলের ধারে কাঠের বাড়ি। বিলের চারপাশে গহিন বন। কাঠের বাড়িটি যাঁর ছিল, তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। যৌবনে মানুষ সাধ করে সম্পত্তি বানায়। ঘরবাড়ি, বাগান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কত কি! বার্ধক্য এলে দেখে, শুধু মায়া বুকে নিয়ে সে একা বসে আছে। স্ত্রী যদি চলে যায় আগে, পুত্ররা যদি দূরদূরান্তে, কন্যা যদি বিদেশে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, তা হলে ভালবাসার দুই-তৃতীয়াংশের ওপর অধিকার হারিয়ে যায়। যে এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, বাড়িঘর বাগান অথবা বাগানবাড়ি জুড়ে, তা চেপে বসে বুকের ওপর। তখন হাঁসফাঁস করে মানুষ। এই কাঠের বাড়ির বৃদ্ধ মালিক তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন হস্তান্তর করার জন্যে। যখন কেউ ছেড়ে দিতে চায় তখন সে দর কষাকষি করে না। কিনে নেওয়া সহজ হয়েছিল সেই কারণে।

এক জীবন থেকে আর এক জীবনে চলে যাওয়া সংসারী মানুষরা স্বাভাবিক চোখে দেখে না। তোমরা যেমন আছ থাকো আমি চললাম বললেই কাঁধে কান ঠেকিয়ে আচ্ছা বলবে, তেমন মানুষ সংসারে থাকে না। তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা মিটিয়ে দিলেও সন্দেহের চোখে দেখে, তুলকালাম করে। অথচ সব মিটিয়ে দিয়ে যদি তাদের চোখের সামনে মরে যাওয়া যায় তাহলে বোধ হয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি খুঁজে পায় তারা। কষ্টটা বড় জোর শ্রাদ্ধ পর্যন্ত, লোকটা ভাল ছিল, কর্তব্যে কোন গাফিলতি করেনি ইত্যাদি বাক্য বলে বলে ক্লান্ত হয়ে বলা বন্ধ করে। তখন দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে ধুলো জমলেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু তাই বলে তরতাজা শরীর নিয়ে মানুষটা একটু একা একা থাকবে বলে চলে যাবে কোথাও, এ কেমন কথা!

অতএব ছলনার আশ্রয়। ছবি আঁকা নাম করে এখানে আসা। সঙ্গে চিটেগুড়ের মতো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জননী। দু দিনেই হাঁপিয়ে উঠল তারা। এই জঙ্গল আর বিলের জলে বিন্দুমাত্র আনন্দ খুঁজে পেল না তারা। দম বন্ধ

হয়ে আসতে লাগল। কাছেপিঠে শহর নেই। মাইল আটেক দূরে যে গঞ্জ সেখানে এখনও লবেঞ্চুস বিক্রি হয়। সে বুঝে গেল ওরা আর ভুলেও এদিকে আসতে চাইবে না ওদের গর্ভধারিণী সব দেখেশুনে বললেন, 'এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। তোমার তো হতে কিছু বাকি নেই তাই এই বাড়ি কিনেছ!' কিন্তু আর বাধা এল না। তবে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে হবে। একজিবিশন তো কলকাতায় অথবা বোম্বেতে করতে হবেই। করলেই লাখ লাখ টাকা। ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় বসে ছবি আঁকো। যখন অন্য কোন মতলবের হদিশ পাওয়া যায় না তখনই মানুষ উদার হতে পারে। ওরা ফিরে গিয়েছিল পাততাড়ি গুটিয়ে।

চলে যাওয়ার পর সে উদ্দাম নেচেছিল। দুই হাত আকাশের দিকে তুলে সেই নৃত্যের পর চৈতন্যদেবকে অনুভব করেছিল সে। এমন নৃত্য তিনি নাচতেন, কারণ বাঁধন ছেড়ার আনন্দ পাওয়া যায়। শরীরের সঙ্গ মনেও বেশ ঝাঁকুনি লাগে।

দিনের আলোয় পেট ভরানোর জন্যে পরিশ্রম করতে হত মানুষকে। আলো নিভতেই কিছু করার নেই, তখন ঘুমিয়ে পড়লে অনেক চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়া যেত। সেই যে আদিম অভ্যেস তা এখনও চলছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চলে যাওয়ার পর সেই জ্যোৎস্নার রাতটা জেগেছিল সে আনন্দে। আর তার ফলে আর এক নতুন জগৎ তার সামনে ভেসে উঠেছিল। অতএব সে অভ্যেসটাকে বদলে নিল। যতক্ষণ পারে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নেয় মুশকিল হল, নৈঃশব্দ্য ঘুমের আয়ু কমিয়ে দেয়।

তার একটা সাইকেল আছে। এটা সে কেনেনি, এ বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের পর এখানেই আবিষ্কার করেছে। বেশ পুরনো সাইকেল কিন্তু এখনও মজবুত এবং চালু। সপ্তাহে একদিন সেটা চালিয়ে বনের পথ ধরে গঞ্জে যায় সে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনে। এখন প্রয়োজনের তালিকা ছোট হয়ে গিয়েছে তার, একটুও অসুবিধে হয় না। গঞ্জের মানুষ কথা চালাচালি করতে ভালবাসে। এ কেমন লোক যে শহরের আকর্ষণ ছেড়ে চলে এসেছে নির্জন বিভুঁই-এ? অপার কৌতূহল তাদের। সে হেসে বলেছে, 'বানপ্রস্থে এসেছি ভাই। শাস্ত্রেই বলেছে পঞ্চাশের পর বনে যেও।' কথাটা কানে গিয়েছিল দারোগাবাবুর। জিপ চালিয়ে হাজির হয়েছিলেন পাখিপাখালিদের সন্ত্রস্ত করে। কে তিনি, কোথায় বাড়ি, কেন এসেছেন জানার পরও তার মুখ পরিষ্কার হয়নি। তবে

ফিরে এসেছিলেন, 'আমি ভাবতেই পারিনি আপনি সেই লোক! বলবেন তো! বাংলাদেশের এত বড় শিল্পী হয়েও এইখানে আপনি, কোন অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমাকে।'

সে বলেছিল, 'বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম। আমি ভারতবর্ষের নাগরিক, পশ্চিমবাংলায় থাকি। আর অসুবিধে, এখানে যত কম মানুষ আসে তত ভাল।'

'ও! শিল্পীরা বোধ হয় একা থাকতে ভালবাসেন। তবে আপনার একজন হেল্পিং হ্যান্ড থাকা দরকার। এই রান্নাবান্না ফাইফরমাশ খাটার জন্যে—।'

'প্রয়োজন হলে বলব।'

'অ। ঠিক আছে। তবে যদি কোন সপ্তাহে গঞ্জে না যান তাহলে বুঝব শরীর খারাপ, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। বুঝলেন না, আপনার কিছু একটা হয়ে গেলে ওপরতলার জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। হয়তো ঠেলে দেবে সুন্দরবনের ভেতরে।'

সেই থেকে সপ্তাহে একদিন যাওয়ার অভ্যেসটা চালু রেখেছে সে। গঞ্জে যায় হাটবারে। সাইকেল বোঝাই করে ফিরে আসে। একবেলা ফুটিয়ে নিয়ে দু বেলায় খায়। খাওয়াটার সময় তার নিজের মতো করে নিয়েছে। সন্ধে নামার আগে আর দিন ফোটার সময়।

প্রায় মাস তিনেক হয়ে গেল, এখনও তুলিতে হাত দেয়নি সে। কাগজটা একদম সাদা হয়ে রয়েছে এখনও। এখানে ধুলো কম। কলকাতায় এভাবে খোলা ফেলে রাখলে সাদার গায়ে ধুলো জমত। জমতে জমতে রঙটা বিটকেলে হয়ে যেত।

আসলে এখন তার আঁকতে একটুও ইচ্ছে করে না। কলকাতায় নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না। বছরে অন্তত তিরিশটা ছবি তৈরি করতে হবে একজিবিশনের জন্যে। তার ওপর ধনী খদ্দেরদের অর্ডার। তিনি বছরের মধ্যে ছবি দিতে পারব না বললেও অপেক্ষা করতে চাইত। মাথায় কিছু আসছে না, তবু এঁকে যেত। আঁকতে আঁকতে কিছু একটা ঠিক বেরিয়ে আসত। বছর কুড়ি তিরিশ আগে কলকাতার শিল্পীদের এই অবস্থা ছিল না।

এখানে এসে এই যে ছবি না আঁকার ইচ্ছে, তাতে বড় আরাম বোধ করে সে। ভেবেছিল, যে দিন ইচ্ছে হবে সেদিন না হয় কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু রাতগুলো তাকে বিপাকে ফেলল। যখন চাঁদ থাকে না, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর

ঝিঁঝি পোকারা বন্ধ হয়ে যায় তখন একটু একঘেয়েমি আসে। কাঠের বারান্দায় জলের ওপর বসে শুধু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে যাওয়া। সেই শব্দ বন্ধ হয় যখন হাওয়ারা আসে না। গাছেরা ভূতের মতো স্থির হয়ে থাকে। চারপাশ নিশ্চল। যেন ক্যানভাসে কালো দোয়াত উপুড় হয়ে আছে।

কিন্তু রাত যখন একটু এগোয়, জোনাকিরা বিলের ওপর উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়, তাদের ছায়া মুছে যায় জলের শরীরে তখন আকাশ থেকে নক্ষত্রেরা এক অদ্ভুত মায়াবী আলো পাঠায় এখানে। যে আলো রাতের কালোকে ফিকে করে দেয় অনেকটা। গাছের প্যা দেখা যায় না কিন্তু আদল বোঝা যায়। সেইসময় হাওয়া বইতে থাকে। তার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি আঁকা হয়, সেই ক্ষণিক একজিবিশনের একমাত্র দর্শক সে। বুক ভরে যায় এবং তখনই মনে হয়, কিছুই আঁকা হল না এ জীবনে।

এক জীবনের আয়ু কত বছর? রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বেঁচেছিলেন একাশি বছর পর্যন্ত স্রষ্টা ছিলেন তিনি। একজন মানুষ যতদিন সৃষ্টি করতে পারেন, ততদিনই তিনি জীবিত। দারুণ প্রতিভাবান কোন লেখক অথবা অভিনেতা পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ যদি সব কাজ বন্ধ করে শুধু কথা বলে যান, তাহলে আশি বছর বয়স হলেও, তিনি পঞ্চাশেই মারা গিয়েছেন। তা, ধরে নেওয়া যেতে পারে সক্ষম স্রষ্টা একাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন এদেশে এই হিসেব ধরলে তার হাতে আর তিরিশ বছরও নেই। তিরিশ বছর মানে তিরিশটা বর্ষা, তিরিশটা শরৎ। পেছন ফিরলে নিজের তিরিশ বছর কম শরীরটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় সে।

তিরিশ বছর পর সে পৃথিবীতে থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন এখন নেই, পিকাসো বা দালি নেই। অথচ এঁরা একসময় দারুণভাবে বেঁচে ছিলেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো অথবা অজন্তার শিল্পীরা কি ভেবেছেন? বিম্বিসার অশোক? সবাই চলে যেতে হবে বলে, কিন্তু যাওয়ার জায়গাটা জানে না। বলার সময় মনে হয়, ইচ্ছে করে চলে গেল। উনি চলে গেলেন। ন্যাকামি! কেউ যায় না, যেতে চায় না, শুধু ফুরিয়ে যায়। উনি চলে গেলেন না বলে বলা উচিত, উনি ফুরিয়ে গেলেন।

ঘুম ভাঙলে সে দেখল আজও রোদ টানটান। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজে এখন বেলা ছোট হয়ে আসার কথা। সূর্য লাটাই গোটায় সাত তাড়াতাড়ি। তবে

এত রোদ কেন? তারপর খেয়াল হল, সে জানলা দিয়ে বিলের জলের দিকে তাকিয়েছে। আকাশের রোদ আর বিলের বিচ্ছুরণ একাকার হয়ে জোরালো চেহারা তৈরি করেছে। হাই তুলতে তুলতে সে কাঠের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জল এখন ঝকমক করছে। রোদের গন্ধে কি বিলের জল সূর্যের স্পর্শ পায়? এই ছবি যদি সে আঁকত তাহলে দর্শককে সে কি করে বোঝাতো? তাদের দুনিয়ায় অরিজিন্যাল ছবির কদর, প্রিন্টের মূল্য শুধু রেফারেন্স হিসেবে। আজ মনে হল এই যে প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ছবি এঁকে চলেছে তার অনুকরণ করা মানে প্রিন্ট তৈরি করা। যে শিল্পী এখনকার বিলের ছবি এঁকে দর্শককে অন্তত রোদের গন্ধ পাইয়ে দিতে পারেন, তিনি মরে গেলেও বেঁচে থাকবেন।

তার মনে পড়ল টোপটার কথা। লম্বা সুতোয় বড়শি আর তাতে টোপ পরিয়ে কাঠের রেলিং-এ এ প্রান্ত বেঁধে ও প্রান্ত জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল ভোর সকালে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে। মাঝে মাঝে বোকা কোন মাছ ধরা দেয়। আজ সুতোয় টান দিতে জলের মধ্যে কেউ খলবিলয়ে উঠল, অর্থাৎ গেঁথেছে। একটু টানতেই বেশ ভারি মনে হল। জলের মধ্যে এতক্ষণ স্থির হয়ে থাকা সেই প্রাণী দূত ছোটার চেষ্টা করল। সুতোয় টান পড়ল তৎক্ষণাৎ। অনেক কসরত করে যে মাছটাকে ওপরে তুলে নিয়ে এল তাকে কখনই দেখেনি সে। অদ্ভুত নীল আভা গায়ে। ওজনে দেড় কেজির বেশি। না রুই অথবা কাতলা। চোখ দুটো বড্ড করুণ। এখনও পেটটা নামছে উঠছে, লেজ নড়ছে প্রতিবাদে। ওর গায়ে নীল মায়া ছড়ানো। এই মাছ কাটা যায় না। খুব যত্ন করে বড়শিটা খোলার চেষ্টা করল সে। একটু রক্ত বের হল। তুলোয় ডেটল নিয়ে লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? ঘরে ঢুকল সে আর তৎক্ষণাৎ মাছটা লাফ দিল। শূন্যে উঠে ছিটকে পড়ল বিলের জলে। শব্দ পেয়ে দৌড়ে এল সে। নীল মাছটাকে জলের ওপর দুবার পাক খেতে দেখা গেল তারপর ডুবে গেল নীচে। মাছটা এভাবে না পালালেও পারত। ওকে জলে ফিরিয়ে দিতেই তো সে চেয়েছিল। তার নজর পড়ল কাঠের বারান্দায়। সেখানে বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত। কি মনে হতে ঘর থেকে একটা সেলোফেন কাগজ নিয়ে এসে রক্তের ফোঁটাগুলো তুলে নিল সে। এখন এই রক্ত কার কেউ বুঝতে পারবে না। কাগজটাকে রেখে দিল টেবিলে কলমদানি চাপালো এক প্রান্তে।

স্টোভে ভাত সঙ্গে তিন চার রকমের সিদ্ধ। দুবেলার জন্য। আর একটু ঘি। চমৎকার খাওয়া হয়ে যায়। ভাতে ফ্যান থাকলে আরও জমজমাট। খাওয়া

চুকিয়ে বাকিটা ভোরের জন্যে রেখে দিয়ে বইটা নিয়ে বসল বারান্দায়। এটা তার গীতা, তার বাইবেল।

গীতবিতানের পাতা ওলটালে মনের মধ্যে ছবি কথা বলে। অনাবিল শান্তি এসে পৃথিবীটাকে দখল করে নেয়। ভারি ভাল লাগে তখন। শব্দে শব্দে লাইনে লাইনে কত না নবীন আভাস— এই আভাসগুলি পড়বে মালার গাঁথা কালকে দিনের তরে/ তোমার অলস দ্বিপ্রহরে। তিনশো বিরাশি পাতায় চোখ আটকে গেল। কি ফুল ঝরিলে বিপুল অন্ধকারে/ গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে।।

প্রথম লাইনটিতে যে বিপুল অন্ধকার তাতে অ ফুরান রহস্যের ছোঁয়া। সেই রহস্যময় অন্ধকারে ঝরে যাওয়া ফুলের কথা ভাবতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। কিন্তু গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে ব্যাপারটা কি? ঘুমের প্রান্তপার সব কিছু এলোমেলো করে দেয়। বুকে থম লাগে। সে চোখ বন্ধ করে ভাবে। অদ্ভুত ঘোর লাগে। তার পর যখন চোখ খোলে, তখন সামনের জলে রোদের প্রতাপ মুছে গেছে। এই গানটির সুর কিরকম ছিল? অনেক চেষ্টায় সে মনে করতে পারল না। সে লাইন দুটো আবৃত্তি করল। কেমন একটা সুর আসছে ভেতরে। এখানে বিশ্বভারতী নেই। ছড়ি হাতে কারও দৌড়ে আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সে সুরে গাইল। গাইবার চেষ্টা করল। আহা, বেশ লাগছে, কথাগুলো যেন সুরে বসে যাচ্ছে। ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে তাকে খুন করলে মার্জনা পাওয়া উচিত। কিন্তু এখন তো সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে না। রবীন্দ্রনাথের লাইন যখন নিজের লাইন হয়ে যায় তখন বুকে যে গান বাজে তাই উগরে দিচ্ছে। কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে, / জানি না কি নামে স্মরণ করিব ওকে। ওকে, ওঁকে নয়। তাহলে সেই না দেখা অনামী সম্মানীয় কেউ নয়, বন্ধুর অন্বেষণ যে এসে ফিরে গেছে বিরহের ধারে ধারে তাকে যদি সে ছবিতে আঁকতে চেষ্টা করত? অনেক অনেক দিনের মতো তার আজও মনে হল, কিছুই তো হল না। ভালো তো গো বাসিলাম ভালবাসা পাইলাম এখনো তো ভালবাসি- - তবুও কী নাই। কিছুই তো হল না!

আসলে গীতবিতান খুলে বসলে যে শান্তি তা কখন বিষাদে পৌঁছে যায়, টের পাওয়া যায় না। নিজের জন্যে একটা তিরতিরে কষ্ট তৈরি হয়ে যায়। সেই কষ্টে যতখানি ব্যথা ঠিক ততখানি আনন্দ। সে চোখ মেলে দেখল বিলের জল কালো হয়ে গেছে। ওপাশের জঙ্গলের আড়াল আকাশ ছুঁয়েছে বলে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না। কী রকম গভীর শোক ওড়নার মত চারপাশে নেতিয়ে আছে।

এই ছবিটা যদি আঁকা যেত? ওই গাছের আড়ালে থাকা, না-দেখতে-পাওয়া সূর্যটাকে, ওই ঝুপ ঝুপ নেমে আসা অন্ধকারকে আর জলের নিঃসঙ্গ স্থিরতাকে দেখে কেউ যদি শোকে বিদ্ধ হত তাহলে সেই ছবি আঁকা সার্থক হত। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা শব্দ বাজল। একতারার। এখানে একতারা বাজায় কে? এই প্রাকৃতিক জলসার আসরে একতারার অনুরণন চমৎকার মিলেমিশে যাচ্ছে।

বিলের মায়া ছেড়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। দুটো বড় ঘর পেরিয়ে এপাশের বারান্দায় আসতেই চক্ষু চড়কগাছ। দুটি প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে। দুজনের পরনেই গেরুয়া আলখাল্লা। একজনের হাতে খঞ্জনি আর একজনের একতারা। তাকে দেখতে পেয়েই একতারাধারী নরম হাসল। তার সাদা গোঁফদাড়ি অনেকখানি হওয়া সত্ত্বেও হাসিটা স্পষ্ট। তারপরেই গান বাজল গলায়, 'বৃন্দাবনে রসরাজ ছিল/ রসের ততাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে/ নদেতে এল।' গলাটি চমৎকার, তবে একটু সরু এই যা। সঙ্গিনীর বয়স বোঝা মুশকিল। গান শুরু হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি চক্ষু বুজেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শরীরে নৃত্যের ছন্দ আনছেন খঞ্জনি বাজিয়ে। ওই তিনটে লাইন ঘুরে ফিরে গাওয়া শেষ হলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের আগমনের কারণ?'

'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রস কি জিনিস বুঝতে পারেননি তাই নবদ্বীপে লীলা করতে এসেছিলেন।'

'কৃষ্ণ তো ভগবান, তিনিও রস বুঝতে পারেননি?'

'বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পিতামাতার কামনায় রজবীজে জন্ম হয়নি। তাই তাঁর স্বভাব ছিল কামনাশূন্য। কাম না থাকলে প্রেম তো আলুনি। সেই প্রেমে সহজসাধন হয় না। সেই কারণেই তাঁকে রজবীজে জন্ম নিতে হল নবদ্বীপে। এবার দেহধর্মে কামনা কানায় কানায়। সেই কামনাকে অতিক্রম করতে নিল সন্ন্যাস। কামনা না জড়ালে সন্ন্যাসের মাহাত্ম বাড়ে কি করে? অন্ধকার থাকলে তবে তো আলো জ্বালার প্রয়োজন।' তারপরেই একতারাধারী গান ধরল,

'ওরে আমি কটিতে কৌপীন করবো।'

করেতে করঙ্গ নেবো।

মনের মানুষ মনে রাখবো।'

বিদ্যুতের ছোঁয়া পেল সে। মনের মানুষ মনে রাখবো। কি সহজ কথা অথচ এই কথাটা বলা কি কঠিন। বিড়বিড় করল সে, মনের মানুষ মনে রাখবো। বাঃ!

বৃদ্ধ হাসলো, 'তা তোমার এই নবদ্বীপে একটু জায়গা দেবে না আমাদের?'

ওই একটা লাইনের চারটে শব্দ যেন চার দেওয়াল হয়ে দাঁড়াল তার সামনে। এই একাকী থাকার আনন্দ বানচাল হয়ে যাবে জেনেও মুখে না বলতে বাধল। তবু সে বলল, 'দেখুন, আমি এখানে একা থাকি। একাই থাকতে চাই।'

'থাকো না যত খুশি একা। ঘুরতে ঘুরতে গঞ্জে এসেছিলাম। সেখানকার মানুষ বলল তোমার কথা। তুমি নাকি একা একা ছবি আঁকো। ভাবলাম এত কাছে এসে একজন সাধককে না দেখে অন্য পথে চলে যাব! তা কি হয়?

'সাধক? আমি সাধক? পাগল!'

'সব পাগলই সাধক নয় কিন্তু সাধককে যে পাগল হতে হয়। পৃথিবীর এত জায়গা থাকতে এমন নির্জনে যে ছবি আঁকে তাকে তো সাধক বলবই। দেখাবে তোমার আঁকা ছবি?' বৃদ্ধর আঙুল একতারার তারে টোকা দিচ্ছিল। সন্ধের নূপুর বাজছে যেন।

সে খুব মজা পেল, 'আসুন। দেখে যান।'

ওরা পায়ে পায়ে ভেতরে এল। শূন্য ক্যানভাসে ঘনছায়া মাখামাখি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'কালোয় যদি মৃত্যু, সাদায় তাহলে মুক্তি। প্রস্তুতি চলছে। ভ্রূণ জন্ম নিলেই তো হাত-পা-মাথা পায় না। তাকে সময় দিতে হয়। তাই তো?'

হঠাৎ সে ঝাঁকুনি খেল। বলল, 'আপনাদের মতলব কি বলুন তো? আজ রাত্রের জন্যে একটা আস্তানা চাই, তাই তো? ঠিক আছে, এই ঘরে থাকুন, ভোর হলেই বেরিয়ে যাবেন। আমি দিন ফুরোবার আগে রাতের খাবার খেয়ে নিই তাই আপনাদের কিছুই খাওয়াতে পারব না আজ। খুব জরুরি কোনও প্রয়োজন ছাড়া আমাকে ডাকবেন না।'

ভেতরের ঘরে চলে এল সে। হঠাৎ মনে হল নির্দয় হওয়া উচিত ছিল গঞ্জে ভাল ঘর পায়নি বলেই এখানে চলে এসেছে। আর গঞ্জের লোকগুলোও অদ্ভুত, তার কথা না বলতে পারলে যেন স্বস্তি পায় না। যাক গে, একটাই তো রাত। ভেতরের দরজা বন্ধ করল। বাইরের ঘরে তেমন কোনও সম্পত্তি নেই যে নিয়ে উধাও হবে। অবশ্য রাত নেমে গেছে, এখন কেউ জঙ্গলে পা রাখতে সাহসী হবে না।

হ্যারিকেনটা জ্বাললো সে। ওই ঘরে একটা বড় মোমবাতি আছে। দরকার হলে ওরাই জ্বেলে নেবে। দেশলাই আছে তো? না থাকলে নিশ্চয়ই চাইবে সে বিলের ওপর কাঠের বারান্দায় চলে এল। আহা, রাত্তির এসে গিয়েছে সে বিলের দিকে তাকাল। সেই আহত মাছটা এখন কি করছে? ওর উপকার

করতে গিয়েছিল সে। ওষুধটা যদি সহ্য করতে পারত তাহলে ওর ক্ষত শুকিয়ে যেত। ওরকম নীল মাউ সে কোনকালে দ্যাখেনি। হঠাৎ মনে হল, পায়ের তলায় জলের নিচে কিছু ঘুরছে। ওপরের জলে কোন আলোড়ন নেই কিন্তু সে যেন প্রাণীটির চলাফেরা শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য! সে এতদিন অনেক নীরব শব্দ শুনতে পেত, খসে পড়া গাছের পাতার সঙ্গে স্থির হাওয়ার সংঘর্ষ তার কানে আসে এখনও। কিন্তু জলের নিচে মাছের ঘোরাফেরায় যে আওয়াজ তা তার কানে পৌঁছলো কি করে? ওটা কি? সেই মাছটা ফিরে এসেছে নাকি? শব্দটা মিলিয়ে গেল। আকাশে এখন অনেক নক্ষত্র। জীবানন্দ দাস নক্ষত্রের জলের স্বাদ পেয়েছিলেন। কিরকম কিলবিলে হয়ে যায় মনটা। মনের মানুষ মনে রাখবো। দুর্দান্ত।

হঠাৎ তার নজরে এল আকাশের এক কোণে একটু কালচে ছোপ লেগেছে লম্বা গাছগুলোর মাথা ডিঙিয়ে সেই কালচে ছোপ একটু একটু করে বড় হচ্ছে। গতকাল যা ছিল পরিষ্কার, আজ তা মেঘে ঢেকে যাবে একটু পরেই। তার মন খারাপ হয়ে গেল। আকাশ মেঘের আড়ালে চলে গেলে রাতের কোন আকর্ষণ থাকে না। সে দিনে ঘুমায় রাতে জাগে, সেই জাগাটা বড্ড যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় এমন হলে।

ওপাশে কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। হঠাৎ কিছু পোড়া গন্ধ নাকে এল। কি পুড়ছে? সে রেলিং-এর এক প্রান্তে চলে এসে ঝুঁকে পেছনে তাকাল। ধোঁয়া বের হচ্ছে যেন বিলের ধার থেকে। তারপরেই খেয়াল হল, হয়তো উনুন জ্বালিয়েছে রাতের রান্নার জন্যে। ওই ঝোলাদুটোর মধ্যে সব সঞ্চয় থাকে বোধহয়। বৃদ্ধর আর কি, সঙ্গে সঙ্গিনী নিয়ে ঘুরছে, খাওয়াটা ঠিক সময়ে পেয়ে যায় কিন্তু বাইরে আগুন যেন সাবধানে জ্বালানো হয়, গাছগাছালি পুড়লে আমি সহ্য করব না।

চেয়ারে এসে বসতেই গান কানে এল। 'দয়াল গুরু হে তোমা বই কেউ নাই/ আমি খেতে শুতে আসতে যেতে/ তোমারই গুণ গাই।' কণ্ঠটি ভাল, মন্দ লাগল না শুনতে। তার পরেই মনে হল বুড়ো ঘরে আরাম করছে আর সঙ্গি নী হাত পুড়িয়ে রান্না করছে। এমন অবস্থায় গান তো বের হবেই। গান চলছিল, 'অন্তিমকালে যেন তোমার স্বরূপ বুঝে যাই।' হঠাৎ নজরে এল তেড়ে আসছে মেঘের পাল। তাতার দস্যুর মতো কালো তলোয়ার ঘুরিয়ে আকাশের দখল নিয়ে নিচ্ছে। অথচ হাওয়া নেই কোথাও। এটা খারাপ লক্ষণ। চারপাশে এখন

নিশ্চিদ্র অন্ধকার। সে অস্থির হয়ে উঠল। সটান ঘর পেরিয়ে দরজা খুলল। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোলে একতারা নিয়ে গান থামাল বৃদ্ধ। সঙ্গিনী ঘরে নেই।

'প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে, এই সময় আপনার ওই গান মোটেই ভাল লাগছে না।'

'কেন? বৃষ্টিকে কি তোমার ভয়?'

'না, বৃষ্টির একটা আলাদা মেজাজ আছে। আলাদা শব্দ।'

'তুমি আগে শব্দের পেছনে ছোট, তারপর গান খোঁজ?'

'শব্দ ছাড়া গান হলে জমে না।'

'কিন্তু শব্দের আগে যে নৈঃশব্দ। তুমি লালনের সেই গানটা শুনেছ সাধক? 'যখন নঃশব্দ শব্দের খাবে।' সুরে গা বৃদ্ধ।

আবার থম লাগল বুকে। ঠিক তখনই একটা সসপ্যানের কানা পাতা দিয়ে ধরে সঙ্গিনী ঘরে ঢুকল। মোমবাতির আলোয় বোঝা গেল তার বয়স বেশী নয়। কিন্তু বড্ড শীর্ণা, মুখ ঘামে চকচকে। সে সসপ্যান নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ভঙ্গিতে ক্লান্তি স্পষ্ট। টাপুর টুপুর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অদৃশ্য গাছের পাতায় পাতায়, বিলের জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ প্রথমে খয়ের মত ফুটছিল, ধীরে ধীরে সেটা একাকার হয়ে গেল।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি বাউল?'

বৃদ্ধ হাসল, জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি কি ফকির?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'না সাধক। আমি শুধু সংসার করিনি। ঘুরে বেড়াই, মানুষ দেখি আর সারাদিনে একবার পঞ্চতত্ত্ব খাই।'

'পঞ্চতত্ত্ব মানে?'

'চাল ডাল আর তিন রকমের আনাজ একসঙ্গে সেদ্ধ।'

'ওকে তো খিচুড়ি বলে।'

'খিচুড়িতে বাসনা থাকে। নুন ঘি হলুদ। খাবে নাকি আমাদের পঞ্চতত্ত্ব?'

'না। আমার আহার হয়ে গেছে। ইনি আপনার কে?'

'পথ চলার আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি সংসার করেননি অথচ আনন্দের জন্য স্ত্রীলোকের দরকার হয় কেন?'

'যে কারণে শিশুর জননীকে দরকার হয়। আচ্ছা তুমি ওই গানটা শুনেছ? ওই যে, ভগলিঙ্গে হলে সংযোগ/ সেই তো সফল সেরা যোগ। মানে জানো?'

'মৈথুনের কথা বলা হয়েছে।'

বৃদ্ধ খুব হাসল। হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ। মৈথুন।(গুরুবাক্য লিঙ্গ হলে শিষ্যের কান যোনি।) দাও হে, উদর পূর্ণ করি।'

সে দেখল ওদের খাওয়া। সাদা সেদ্ধ গলা ভাতের সঙ্গে ডাল আলু লাউ আর বেগুন। প্রত্যেকেই নিজের সত্ত্বা নিয়ে ছিল, আঙ্গুলের চাপে একাকার হল।

খাওয়া শেষ করে বৃদ্ধ বলল, 'ভারি জমেছে বৃষ্টিটা। তুমি গান জানো?'

'আজ্ঞে না।'

'তা কি কখনও হয়। যে সৃষ্টি করে, সে গান গাইতে বাধ্য হয়। কেউ শব্দে গায় কেউ নিঃশব্দে। ওই যে রবিঠাকুরের সেই কথাটা— একা গাইলে গান হয় না, দুজনে মিলে গাইতে হয়। গলার গান আর মনের গান মিলে তো পুরো গান।'

'আপনি রবি ঠাকুরের গান জানেন?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। বলল, 'আজকাল সব কথা একাকার হয়ে যায়। লালন থেকে কুবির সরকার এঁর কথা ওঁর মধ্যে, তার সঙ্গে রবি ঠাকুরও আছেন। এই যে তোমরা বল— বাউল, দরবেশ, আউল, সহজিয়া, ন্যাড়া, সাহেবধনী, এসবই তো রবি ঠাকুর সেজে বসে আছেন।' কথা বলছিল আর একতারাটি টুং টাং শব্দ তুলছিল। হঠাৎ গলা তুলল,('আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/ তাই হেরি তায় সকল খানে।।')

সে অবাক হল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গান তার মনস্থ। কিন্তু এ গানটি বড় একটা কেউ গায় না। গান শেষ হলে সে বলল, 'ভাল লাগল। এবার আপনারা বিশ্রাম করুন। বাইরের দরজাটা বন্ধ রাখবেন। চোরটোর নেই কিন্তু বুনো জন্তু আছে। আর হ্যাঁ কাল সকালে আমি ঘুমাতে যাওয়ার আগেই যেন আপনারা চলে যান।

সে ফিরে এল ভেতরের বারান্দায়। তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। মাঝে মাঝে হিংস্র আগুনের নখে আকাশটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে মেঘের ক্রোধ। ওই ভয়ঙ্কর শব্দ ছাপিয়ে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে না। শব্দ বাজছে চতুর্দিকে। বিলের চারপাশে ভূতের মতো দাঁড়ানো গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাচ্ছে ঝড়ো বাতাস। সঙ্গমের মুহূর্তে যে সর্বনাশের আনন্দ তার সঙ্গে এই সময়ে বড় বেশি মিল। গুরুবাক্য লিঙ্গ যদি শিষ্যের কান যোনি। বাঃ। চমৎকার। সে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আর এক সঙ্গমের রূপ। হঠাৎই তার মনে এল এই দর্শনে ক্লান্তি আসে।

এইসময় না আকাশ না পৃথিবী কেউ তার নিজস্ব খেলা খেলতে পারে না। উদ্দেশ্য প্রকট হলে লাবণ্য কমে যায়।

এক সময় সব শান্ত হল। মেঘেরা চলে গেল বহুদূর কোন যক্ষদেশে। যাওয়ার সময় তারা শান্ত ভেড়ার মত গেল। একটু একটু করে আকাশে নক্ষত্ররা ফিরে এল। যেন এতক্ষণ দাপট দেখছিল তারা উইং-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে। আকাশে মায়াময় আলোর ঘোর লাগল। সেটা ছলকে এল পৃথিবীতে। গাছপালাদের শরীর এখন বড় ক্লান্ত। শুধু বিলের জল নতুনভাবে ভরাট। সে মাছেদের চলাফেরা শুনতে পেল। তাদের মধ্যে সেই আহত মাছটি কি আছে? নাকি কাল সকালে সে পেট উল্টে ভেসে উঠবে! উঠলে নিজেকে খুনি মনে হবে তার।

রাতটা ফুরিয়ে গেলে সে ভেতরে এল। এখন তার অনেক কাজ। প্রাতঃকৃত্য সারা, রান্না চাপানো, খাওয়া শেষ করা এবং দিনভর ঘুমানো। কচি আলো ফুটছে পুব আকাশে। সে পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকাল। এবার ওদের চলে যাওয়া উচিত। যারা চৈতন্যে নিবেদিত, খাওয়ার বদলে যারা সেবা করে, খিচুড়ি যাদের কাছে পঞ্চতত্ত্ব তাদের আর ঘরে থাকা কেন? সে দরজা খুলল।

বৃদ্ধ শুয়ে আছে কাল যেমন দেখেছিল। তার মাথার পাশে বসে ভাঙা পাখায় হাওয়া করছে সঙ্গিনী। সে বলল, 'ওঁকে উঠতে বলুন। বেলা হচ্ছে, এই বেলায় বেরিয়ে পড়ুন।'

সঙ্গিনী মাথা নিচু করল, হাত স্থির হল।

এবং তখনই সে লক্ষ্য করল বৃদ্ধের মুখ স্বাভাবিক নয়। লালচে এবং ঈষৎ স্ফীত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু হয়েছে নাকি ওঁর?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না, তার হাত আবার পাখা দোলাতে লাগল, এবার ধীরে।

সে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে কপালে হাত রাখতেই বুঝল বৃদ্ধের ধুম জ্বর এসেছে। হাতের স্পর্শে বৃদ্ধ তার ঘোলাটে চোখ মেলল, ও সাধক! যাওয়া হল না গো। শরীরটা বইবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি চাও কোনওমতে আকাশের তলায় গিয়ে শুতে পারি।'

সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে বাধালেন?'

'বেধে গেল বিনা মেঘে বরষে বারি'। ম্লান হাসল বৃদ্ধ।

'তা এভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না, ওষুধ খেতে হবে। আমার কাছে জ্বরের ট্যাবলেট আছে, তাই খান এখন। না কমলে গঞ্জের ডাক্তারকে খবর

দিতে হবে।'

রান্না শেষ করে বিলের জলে স্নান সেরে খেলে বসে একবার ওদের কথা মনে এসেছিল কিন্তু পাত্তা দেয়নি। ওর সঙ্গিনী নিশ্চয়ই গঞ্জের রাস্তা চেনে, ওই পথ দুরেই তো এসেছে, জ্বর কমলে তারই খবর দেওয়া উচিত ডাক্তারকে। ডাক্তার মানে হোমিওপ্যাথির গুলি আর জল দেওয়া ডাক্তার। তার এখনও প্রয়োজন পড়েনি। সঙ্গে সব রকমের চলতি রোগের ওষুধ নিয়ে সে এখানে এসেছে খেয়েদেয়ে সে শুয়ে পড়েছিল আজ আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই বলে রোদ উঠেছে খুব।

বিকেল তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙতেই বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। সে দরজা খুলে দেখল বৃদ্ধ সেইভাবে শুয়ে আছে, আর সঙ্গিনী তেমনি একই ভঙ্গিতে বাতাস করে যাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর কমেছে?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কথা বলতেত্ পারেন না?'

'পারি।' খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর।

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ওঁকে কিছু খাইয়েছে?'

'ওষুধটা।'

'খাবার দাবার দিয়েছেন?'

'এখান থেকে উঠতে পারছি না।'

'নিজে কিছু খাননি?'

এবার জবাব এল না। সে বৃদ্ধের কপালে হাত রাখল, পুড়ে যাচ্ছে। এবার বৃদ্ধ চোখ মেললো না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

বৃদ্ধ অস্ফুটে কিছু বলল। জড়ানো গলা।

সে সঙ্গিনীকে বলল, 'এখনই গঞ্জের ডাক্তারকে ডেকে আনা দরকার। ঠিক আছে, আপনি এখানে থাকুন, আমিই যাচ্ছি। চারপাশে লক্ষ রাখবেন, চোর ছ্যাঁচোড় যদিও নেই তবু বলা যায় না।' জামা পরে সে সাইকেল বের করল। প্যাডেল করতে করতে মনে হল যত্ত উটকো ঝামেলা তার কাঁধে এসে নামে। কালকে এল সুস্থ মানুষ আর আজকে নেতিয়ে কাদা। এদের ভালোয় ভালোয় বিদায় না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

গঞ্জের ডাক্তার লোকটি ভাল। সব শুনে কাঠের বাক্স সঙ্গে নিয়ে নিজের সাইকেলে চেপে বসলেন। পুরোটা পথ একটাও কথা বললেন না। বৃদ্ধের নাড়ি দেখলেন মন দিয়ে। তারপর বাক্স খুলে ওষুধ বের করলেন। তিনদিনের ওষুধ। না কমলে আবার আসবেন। মাত্র দশটি টাকা দক্ষিণা। তবে আউল বাউল ফকিরদের কাছ থেকে ওষুধের দামটুকু নেন। সে টাকা বের করছিল কিন্তু ভদ্রলোক নিষেধ করলেন, 'উনি সুস্থ হলে ওঁর কাছ থেকেই নেব। আচ্ছা, চলি।'

সে একটু এগিয়ে দিতে এসেই জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কি বলুন তো?'

'জ্বর। সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা নিমোনিয়া হতে পারে। ম্যালেরিয়া নয়, তাহলে কাঁপুনি থাকত। তবে তার সঙ্গে বার্ধক্যজনিত উপসর্গগুলো আছে। চিন্তা করবেন না তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। আপনি তো শুনেছি একা থাকেন?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। আচ্ছা, নমস্কার।' সে হাতজোড় করতে ডাক্তার চলে গেলেন। এটা না করে তার উপায় ছিল না। এর পরই মানুষ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে।

ঘরে ফিরে সে বলল, 'শুনুন, ডাক্তার বলে গেল চিন্তার কোন কারণ নেই। একজন মানুষ অসুস্থ হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু আর একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বুঝতে পারছেন?'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'আপনি স্নান খাওয়া করুন। স্বাভাবিক হয়ে ওঁর সেবা করুন।'

'একটা দিন নাই বা খেলাম। উনি কাল ভাল হয়ে গেলে রাঁধবো।'

'ওষুধ খাইয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর মুখ গলা হাত পা ভিজে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিন।'

'দিয়েছি।'

'আপনি যান স্নান করে আসুন, আমি ততক্ষণ এখানে বসছি।'

সঙ্গিনী তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে তার বোঁচকা নিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, বিয়ের পর স্ত্রী এভাবেই তার সেবা করত অসুখ হলে। একটু একটু করে কখন কি হয়ে গেল। এখন অসুস্থ হলে ওষুধ খাওয়ায় আর ঘুমাতে বলে। মাথার পাশে অষ্টপ্রহর যদি বসে থাকত তাহলে তারও স্বস্তি হত না এতটুকু।

বৃদ্ধ বলল, 'আঃ।'

সে এগিয়ে গেল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

'কে? সাধক? করিলে তাঁর সাধনা/ সকলই যাইবে জানা/ হবে না আর আনাগোনা/ এ ভব সংসার সংকটে।' জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বলল, বৃদ্ধ, 'সংকট, বড় সংকট।'

'আপনি ঘুমান। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ পড়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।'

'জল। একটু জল।'

সে দেখল বৃদ্ধর মাথার পাশে গ্লাসে জল আছে। তাই তুলে নিয়ে ঠোঁটের সামনে ধরল। সামান্যই জল খেল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'কোটি জন্মের যায় পিপাসা/ বিন্দুমাত্র জলপানে।' তার পরই আচ্ছন্ন হয় গেল আবার আগের মতো।

সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এরকম অসুস্থ অবস্থায় প্রায় ঘোরের মধ্যেও বৃদ্ধ এ কি কথা বলল? কোটি জন্মের পিপাসা এক বিন্দু কোন জলে মিটে যায়?

শব্দ কানে যেতে চমক ভাঙল। সে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল সঙ্গিনীর চুল ভেজা। মুখ চকচকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন খাবো? আপনি ইচ্ছে করলে খেতে পারেন। দেবো আপনাকে? প্রশ্নটা করেই তার খারাপ লাগল। এভাবে বলা ঠিক হয়নি।'

সঙ্গিনী উত্তর দিল না। আবার পাখা নিয়ে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসল।

সে চলে এল নিজের ঘরে। খাবার বেড়ে তৃপ্তি করে খেল। তারপর একটা বাটিতে কিছু ভাত আর সেদ্ধ, একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল। রেখে বলল, 'লড়াই করতে হলে শরীরকে শক্তি জোগাতে হয়। ভাত আপনার জন্যে আর বিস্কুট ওঁকে খাইয়ে দেবেন।'

কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সে ফিরে এল নিজের ঘরে।

আজ অনেকদিন বাদে তার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল। সিগারেটের নেশা তার নেই। কখনও সখনও ইচ্ছে হলে খায়। দুটো নতুন প্যাকেট তোলা ছিল। তার একটা ভাঙল। সিগারেট ধরিয়ে জলের ওপর কাঠের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। এখন বিকেল কিন্তু ছায়া ঘন হয়নি। হঠাৎ সে দেখল, একটা বড় পাখি তীব্রগতিতে জলের দিকে নেবে এসে কিছু তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল। পাখিটা ওপরে উঠে গিয়ে পাক খেল কয়েকবার। আবার নামল শিকারের সন্ধানে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল মৃত মাছের শরীর। মরে উল্টে ভাসছে

একপাশে। এটা নিশ্চয়ই কালকের আহত মাছটা। শরীর কিরকম সিরসির করে উঠল। যাঃ, মাছটা শেষপর্যন্ত মরে গেল! মন খারাপ হয়ে গেল তার।

চিল অথবা বাজপাখি কিংবা ঈগলও হতে পারে এমন ধরনের পাখিটার এবার সঙ্গী জুটেছে। দুজনে একের পর এক মাছটাকে ঠেলছে ছোঁ মেরে মেরে। প্রায় দশ-বারো বারের চেষ্টায় ওরা মাছটাকে জলের কিনারায় নিয়ে যেতে পারল। অত ভারী মাছ ওরা তুলতে পারবে না বলেই কায়দাটা করল। এবার প্রায় জলে নেমেই মাছটাকে ওরা টেনে তুলল ডাঙায়। সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে ঠোকরাতে লাগল শরীরটাকে। মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে ওরা তাকে দেখছিল।

সে ভেতরে ঢুকল। কাল যে কাগজে মাছের রক্ত তুলে রেখেছিল সেটাকে বাইরে বের করে আনল। কালচে দাগ হয়ে গেছে রক্তের ফোঁটাগুলো। জলে ভাসিয়ে দিল সে। মাছটা যদি একটু ধৈর্য ধরতো তাহলে হয়তো বেঁচে যেত ওষুধ পড়লে। নীল রঙের মাছ এই বিলে আর কটা আছে কে জানে!

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামল। আজ আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্রেরা সম্রাটের মতো যে যার জায়গায় চলে এসেছে। একটু বাদেই ধুন্দুমার কাণ্ড হবে সেখানে। গাছের ডালে ডালে দিনের পাখিরা তুমুল চিৎকার শুরু করে দিয়েছে সারা রাতের জন্যে চুপ করে থাকার আগে। এই সময় চমৎকার একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে জঙ্গলের শরীর থেকে, সে ঘ্রাণ নিল।

এখন আকাশ ছবি আঁকা শুরু করবে। তার সঙ্গে যোগ দেবে জোছনা, গাছগাছালি, হঠাৎ উড়ে যাওয়া নাম না জানা রাতের পাখি এবং এই বিলের জল। সেই অনির্বচনীয় সৃষ্টি দেখতে দেখতে নিজের জন্যে বড় কষ্ট হয় তার। কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাই পাই/ কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই। কিছুই তো হল না।/

তখন কত রাত জানা নেই শব্দ কানে আসতেই সে সজাগ হল। এতক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে বোধ হয় তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, ধাতস্থ হয়ে ঘরে ঢুকতে যা একটু দেরি। শব্দ হচ্ছে ওদিক থেকে বন্ধ দরজায়। হ্যারিকেন জ্বালালো সে। দরজা খুলতেই সঙ্গিনী সরে দাঁড়াল, মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে শেষ, প্রাণ সলতেয় রেখেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'উনি কেমন করছেন!' আর্তনাদের স্বর সঙ্গিনীর গলায়।

সে হ্যারিকেন তুলে বৃদ্ধের পাশে যেতেই চমকে উঠল। মুখ বেঁকে গেছে

বৃদ্ধের।

একটা হাত মুঠো করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। চোখ বিস্ফারিত। সে দু'বার প্রশ্ন করেও জবাব পেল না। জবাব দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই।

'কখন থেকে এরকম হয়েছে?'

'একটু আগে থেকে।'

'আমায় ডাকেননি কেন?'

'ডেকেছিলাম।'

তার নিজেরই মনে হল, কি বোকার মতো কথা। সে ডাক্তার অথবা ঈশ্বর নয় যে ময়ে ডাক পেলে কিছু করতে পারত। তবে এটা সামান্য কোন রোগ নয়। হয় হার্ট অ্যাটাক, নয় স্ট্রোক। এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই নীল মাছটার কথা, যার শরীর আজ পাখিগুলো ঠুকরে খেয়েছে। বাকিটা এতক্ষণে শিয়ালের পেটে চলে গেছে। ওই মাছটাকে সে বাঁচাতে পারত। শুকিয়ে গেলে রক্তের রঙ কালো হয়ে যায়।

'আপনি ভয় পাবেন না, আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

কোন শব্দ শুনল না সে সঙ্গিনীর মুখে। সাইকেল বের করে চলল সে জঙ্গলের পথে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার চিন্তা ছাড়া কোন কিছু সে ভাবতে পারছিল না। এমন কি একটা বটগাছ কুঁজো বুড়োর মতো তারার আলো মেলে উবু হয়ে বসে আছে তাও সে দেখতে পেল না।

গঞ্জ নিঝুম। কোথাও মানুষের শব্দ নেই। দরজার কড়া নাড়তে হল কয়েকবার। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। 'ও আপনি! কি ব্যাপার?'

যা যা দেখে এসেছে জানিয়ে দিল সে।

'এই অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো দরকার। ওখানে ওষুধপত্র এবং অক্সিজেন পাবে। আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধে যে কাজ হবে তেমন কথা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু শহর তো অনেক দূর!'

'তা বটে। ঠিক আছে, চলুন।'

পুরোটা পথ দুটো সাইকেল পাশাপাশি এল, কোন কথা বিনিময় হল না।

বৃদ্ধকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ওষুধ দিলেন। পর পর দু'বার। তারপর পাশেই বসে থাকলেন। মাঝে মাঝে নাড়ি দেখছিলেন শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে গেল।

ডাক্তার এবার বেরিয়ে এলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চা খাবেন?'

'আমি তো চা খাই না।'

'ও। কি বুঝলেন?'

'বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গিয়েছে। বাকশক্তিও নেই। তবে এ যাত্রায় মৃত্যু হবে না।'

তার মানে—?'

'হ্যাঁ। জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন।'

'কোন প্রতিকার নেই?'

'আছে। সেটা কলকাতায় নিয়ে গেলে হতে পারে। তবে—।'

'তবে?'

'ওঁর যা বয়স তাতে টানা হ্যাঁচড়া করে কোন লাভ নেই। যদি দ্বিতীয় বার আক্রমণ হয় আজকালের মধ্যে, তাহলে উনি ওঁর বৈকুণ্ঠে চলে যেতে পারেন।'

'যদি না হয়?'

তাহলে বলব ওঁর যেমন কষ্ট হবে আপনাদেরও তেমনি। আচ্ছা, চলি।'

'আপনার দক্ষিণা—।'

'বলেছি তো। বাউলদের কাছে আমি শুধু ওষুধের দাম নিই।'

'কিন্তু উনি তো—।'

'আর একজন বাউল এসে দিয়ে যাবেন তাঁর গান শুনিয়ে।' ডাক্তার তাঁর সাইকেলে উঠে বসলেন। ভোরের নধর আলো মাখতে মাখতে চলে গেলেন।

সে ফিরে এল এই ঘরে। সঙ্গিনী কাঁদছিল।

সে নিজের ঘরে চলে এল। কান্নার আওয়াজ এই ঘরেও পৌঁছেছে। হঠাৎ তার মনে হল সঙ্গিনীর সঙ্গে বৃদ্ধের সম্পর্ক কতটুকু, কতদিনের? ওরা কি স্বামী-স্ত্রী? সে বাউল ফকিরদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু যে কান্না কানে আসছে তা বুকের গভীরে কষ্ট না জমলে কাঁদা যায় না।

এখন সে কী করবে? বৃদ্ধ যদি পঙ্গু হয়ে এই বাড়িতে পড়ে থাকে তাহলে তার কী করণীয়? ওকে তো জোর করে বের করে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার বৃদ্ধকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎা করানোর উদ্যোগ নেওয়াটাও বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হল আজ অথবা আগামীকালের মধ্যে বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার আক্রমণ হোক।

পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। ওর কথা যেটুকু সে শুনেছে তাতে লোকটার মৃত্যু একটু শ্রদ্ধাজনকভাবে হোক, এমনটা

তার মনে হল। আর মৃত্যু হলে সে অনেক দায় থেকে বেঁচে যাবে। অবশ্য, ধরতে গেলে এখনও তার তেমন কোন দায় নেই। এক রাত্রের জন্যে ওরা আশ্রয় চেয়েছিল, সে দিয়েছে। এবার বের করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। যদি লোকটা অসুস্থ না হতো তাহলে বের করে দিত। কলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করালে বৃদ্ধ বেঁচে গেলেও যেতে পারে। চিকিৎসার খরচ যাই হোক তার পক্ষে বহন করা অসম্ভব নয়। লোকটা খুব সুন্দর কথা বলে। শুনলে মনে গেঁথে যায়।

এখন তার প্রাতঃকৃত্য সেরে খাওয়াদাওয়ার সময়। কিন্তু মন পড়ে আছে বাইরের ঘরে। কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে কাটলো। তারপর সে চলে এল বাইরের ঘরে। সঙ্গিনী তেমনই বসে হাওয়া করে যাচ্ছে। সে বলল, 'এখন আর হাওয়া করে কি হবে? ওর শরীরটা একবার ভাল করে ভেজা গামছায় মুছিয়ে দেবেন। দিনে একবার। নইলে ঘা বের হবে। বাকি সময় মনে করে ওষুধ দেওয়া আর খাওয়ানো। জিভ যদি নাড়তে না পারে গলা ভাত খাওয়াতে হবে। বুঝলেন?'

সঙ্গিনী মাথা নাড়লো।

'আপনি কি চান ওঁকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাই?'

'যদি বাঁচে—।' ফিনফিনে আওয়াজ ভেসে এল।

'দেখি, ডাক্তার কি বলে।' সে ঢোঁক গিলল। কি দরকার ছিল প্রশ্নটা করার।

'আমি এখন রান্না চাপাবো। আপনাকে আর আলাদা করে উনুন জ্বালতে হবে না।'

কথাটা শোনা মাত্র সঙ্গিনী উঠে দাঁড়াল।

'কি হল?'

'আমি যদি কাজটা করে দিই।'

'তার মানে আপনি আমার রান্নাও রাঁধবেন?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না। মুখ নিচের দিকে।

'বেশ বেশ। আমার খাটুনি বাঁচবে। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় কী আছে। তার আগে আপনি একটু পরিষ্কার হয়ে নিন। বাসি কাপড়ে আছেন তো!'

সঙ্গিনী আসার আগে সে চা বানিয়ে নিল। সঙ্গিনী চা খায় না যখন তখন তার জন্যে বানাবার দরকার নেই। আরাম করে যখন চা খাচ্ছে তখন সঙ্গিনী এসে দরজার পাশে নতমস্তকে দাঁড়াল। সে তাকে তার রান্নার সরঞ্জামগুলো দেখিয়ে দিল। সে পঞ্চতত্ত্ব খাবে না। সেদ্ধ হলেও তার নুন এবং ঘি চাই।

দেখিয়ে দিয়ে সে বিছানায় যাওয়ার বদলে বেরিয়ে পড়ল। এখানে আসার আগে সে জীবনে কখনও রান্না করেনি। আজ মুক্তি পেয়ে খুব ভাল লাগছিল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা গান বাজল বুকে। অথচ তার সুরটাকে কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। পারলেও ঠিকঠাক গাইতে পারত না। গান গাওয়ার সময় কিভাবে যেন সুর সরে যায়। দুঃখ আমার ঘরের জিনিস। খাঁটি রতন তুই তো চিনিস/ তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহংকার। /

শেষপর্যন্ত সে নিজের সুরে গানটা গাইল। গাইবার পরেও মন থেকে তার খুঁতখুঁতুনি গেল না। 'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধারে। বাহবা! কি লাইন! আরও কয়েক জন্ম জন্ম নেবার পর বাঙালি এমন লাইন লিখতে পারলেও পারে!

খেতে বসে চমৎকৃত। যা বলেছিল তাই রান্না হয়েছে কিন্তু তেমননি হয়নি। এতদিন যা খেয়েছে তা থেকে অনেক গুণ ভাল। হঠাৎ মনে হল তার স্ত্রীও এমন ভাল রান্না করতে পারত না। পাশের ঘরে পাথর হয়ে শুয়ে থাকা বৃদ্ধ সত্যি ভাগ্যবান। সে হেসে ফেলল। এটা কোন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর সেরা রাঁধুনিরা সবাই পুরুষ। তাহলে তো ছেলেদের সঙ্গে থাকতে হয়!

খাওয়া শেষ করে সে পাশের ঘরে এল, 'ওঁকে খাইয়েছেন?'

'না। খেলো না।'

'একটা দিন যাক। ওষুধ কাজ করুক। ঠিক খাবে।'

সঙ্গিনী চুপ করে রইল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি খেয়েছেন?'

কান উত্তর নেই।

'খেয়ে নিন। আমি একটু গঞ্জে যাচ্ছি।'

সঙ্গিনী কেঁপে উঠল। তার মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়ল।

'আপনার কোনও ভয় নেই। কিছু হবে না।' সে প্রবোধ দিল।

সঙ্গিনী তখনও চুপচাপ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী? বাউলদের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না।'

সঙ্গিনী এরও জবাব দিল না।

'কতদিন আপনারা একসঙ্গে আছেন?'

'দু বছর।'

'মাত্র! বেশী দিন তো নয়। আপনাদের বয়সের ব্যবধান তো অনেক?'

'মনের ব্যবধান ছিল না।'

শোনা মাত্র চমকে উঠল সে। এ কি উত্তর! তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ঈর্ষা করতে শুরু করল সে। এমন কথা যে মেয়ে বলতে পারে তার জগৎ আলাদা।

সাইকেল চালিয়ে সে গঞ্জে চলে এল। দামি ফল এখানে পাওয়া যায় না। গ্রামে যা ফলে তাই আসে। আম কাঁঠাল লিচু রুগীর জন্যে নিয়ে যাওয়া যায় না। সে ডাক্তারের কাছে গেল। সারা রাত ওই পরিশ্রমের পরও ডাক্তার চেম্বার খুলে বসেছে। বেশ ভিড় ইতিমধ্যে। তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার উঠে এলেন, কেমন আছেন উনি?'

'একই রকম?'

'দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়নি?'

'এখনও নয়।'

'তাহলে কি জন্যে এলেন?'

'কলকাতায় নিয়ে গেলে সেরে যাবে?'

'সেখানকার চিকিৎসা ওঁকে এর চেয়ে ভাল করতে এটুকু বলতে পারি। তাছাড়া এসব কেস সেরে উঠতে প্রচুর সময় লাগে। সেইসঙ্গে ভাল সেবা দরকার। অর্থেরও প্রয়োজন।'

'যদি শেষপর্যন্ত কলকাতায় নিয়ে যেতে হয় তা হলে আপনার সাহায্য পাব?'

'নিশ্চয়ই। তবে সেটাও তো দিন পনের কুড়ি আগে নয়। এখন ওঁকে নড়াচড়া করা চলবে না।'

গঞ্জের বড় ব্যাপারী জগন্নাথ রায়ের দোকানে যেতেই সে বুঝতে পারল বাউল যে অসুস্থ এ খবর সবাই জেনে গিয়েছে। তার ওখানে গিয়ে অসুস্থ হয়েছে বলে বেশ মজা পাচ্ছে এরা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা তো অনেক খবর রাখেন, এই বাউলের ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজনের খবর দিতে পারেন?'

জগন্নাথ বললেন, 'না বাবু। ফি বছর বাউল ঠাকুর একবার গাঁয়ে আসেন এবছর আসার সময় সঙ্গিনীকে নিয়ে এলেন। আমি তো তিরিশ বছর ধরে দেখছি ওঁকে, কখনও মেয়েছেলে সঙ্গে দেখিনি। তার ওপর একেবারে মেয়ের

বয়সী মেয়েছেলে।'

বাড়ি ফিরে দেখল বৃদ্ধ তেমনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, সঙ্গিনী পাশে বসে আছে পাথতরের মতো। সে বলল, 'কুড়ি দিন আগে ওঁকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না। ওঁর বাড়ির লোকজনদের এবার খবর দিতে হয়। তারা কোথায় থাকে বলুন।'

'আমি জানি না।'

'বাঃ। আপনাদের সম্পর্কটা কি?'

সঙ্গিনী চেয়ে রইল, মুখ ফেরালো না, জবাবও দিল না।

'শুনলাম এক বছর আগেও আপনাকে ওঁর সঙ্গে দেখা যায়নি।'

'উনি আমার আশ্রয়দাতা। সম্পর্ক একটা কিছু, যেমন ভাবলে ভাল লাগে, তেমন।'

কথা বাড়ালো না সে। স্নানটান সেরে খেতে বসে মনটা ভাল লাগল। ইতিমধ্যে কিছু ভাজাভুজি হয়েছে। স্বাদটা বদলে গেল। খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই সন্ধে নামল। কিন্তু আজ আর শরীর তার বইছে না। গতকাল বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত তো একটানা জেগে রয়েছে। অনেকদিন পরে সে আজ রাত্রে বিছানায় গেল। এক ঘুমে রাত কাবার।

দিন দশেক কেটে গেছে। এর মধ্যে বৃদ্ধকে নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হয়েছে। তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে যেতেও থেমে গেছে। তিনবার ডাক্তারকে ডেকে আনতে হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন দ্বিতীয় আক্রমণ হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আর কোন লাভ নেই।

বৃদ্ধ এখন শুয়ে থাকেন। তাঁর শরীরে একভাবে শুয়ে থাকার জন্যে ঘা বেরিয়েছে। সঙ্গিনী তাঁকে যতই পরিচর্যা করুক সেটা আটকাতে পারেনি। ডাক্তার এক ধরনের পাউডার দিয়েছেন কিন্তু তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না। এখড় বৃদ্ধকে একলা রেখে কাজকর্ম করতে সঙ্গিনী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেমনভাবে শিশুকে দোলনায় রেখে মা কাজ করে। ঘর পরিস্কার, রান্নাবান্না সব কাজ সঙ্গিনী এখন নিজের হাতে করে। শুধু সেদ্ধ অথবা ভাজা নয়, তরকারি এবং ঝোলও রান্না হচ্ছে এ বাড়িতে। বৃদ্ধের জন্যে স্যুপ জাতীয় কিছু, যা চামচে খাওয়াতে হয়।

আজ বেলা এগারটায় সে বড়শিতে টোপ পরিয়ে সুতো জলে ফেলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুতোর অন্য প্রান্তে আলোড়ন। সন্তর্পণে ওপরে তুলে নিয়ে এল সে মাছটাকে। পাঁচশো গ্রামের একটা স্বাভাবিক কাতলা। সে ভেবেছিল আর একটা নীল মাছ উঠে আসবে বুঝি। বড়শি ছাড়াতে বেগ পেতে হল। শব্দ পেয়ে সঙ্গিনী এসেছিল দরজায়, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি মাছ খান?'

'খাই। আপনি খান না?'

'কখনও খাইনি। আগে যার সঙ্গে ছিলাম সে-ও খেতো না।'

'আগে যার সঙ্গে ছিলেন, তিনিও কি বাউল ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো এটাকে ধরে কোন লাভ হল না।'

'তা কেন? আপনি কেটেকুটে দিন আমি রান্না করে দেব।'

তাই হল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সে সিগারেট ধরালো। আকাশ পরিষ্কার। হঠাৎ তার খেয়াল হল, আগে যেসব শব্দ সে শুনতে পেত আজকাল সেগুলো যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। তার কান-মন অন্য ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে সেইসব অনুভূতির কথা খেয়ালই নেই। হঠাৎ নিজেকে অন্যরকম মনে হল তার। সে আকাশের দিকে তাকাল সাদা মেঘেদের অলস উড়ে যাওয়ার কোন ছবি নেই।

ঝুপঝুপ শব্দ হল বিলের জলে কে ওখানে? কৌতূহলী হয়ে সে ঘরের জানলায় চলে এল। তখনই সঙ্গিনী জল থেকে উঠে এল ডাঙায়। পরনে একটা লম্বা গামছা যা শরীটাকে আব্রু দিতে পারছে না। বেশ ভরাট শরীর। নুয়ে পড়ে যখন শরীর মুছছে তখন অদ্ভুত আলোড়ন উঠল বুকে। যখন বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছিল তখন ছিল অতিশয় শীর্ণ, এই কয়েক সপ্তাহেই কি করে এমন ভরন্ত হয়ে উঠল। কেউ যে তাকে আড়াল থেকে এখানে লক্ষ করতে পারে সে ব্যাপারে কিছুমাত্র সচেতন না থাকায় সঙ্গিনী নিজের অঙ্গকে এমন এক একটি ভঙ্গিমায় নিয়ে যাচ্ছিল যে তার মনে হল প্রকৃতি এমন ছবি কখনও আঁকতে পারেনি।

সে ক্যানভাসটাকে টেনে আনল জানলার পাশে। দীর্ঘকাল পরে প্রথম আঁচড় কাটলো। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন তাকাল তখন বিলের ধার শূন্য। মেয়েটি পোশাক পরে ফিরে এসেছে পাশের ঘরে। এখন ও খাবে। তারপর

ঘুমাবে। আজকাল সঙ্গিনী দুপুরে ঘুমায়।

সারাদিন ধরে যন্ত্রণা। ছবিটা মনে এসেও আসছে না। বিকেলে সে যখন বারান্দায় তখন সঙ্গিনী চায়ের কাপ নিয়ে এল। চা দিয়ে চলে গেল না।

'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ।'

'গন্ধটা বেড়ে যাচ্ছে। ওঁর শরীরের ঘাগুলো কমছে না। পোকা হলেও হতে পারে।'

'ওষুধ লাগাচ্ছেন না?'

'কাজ হচ্ছে না তেমন। বিশল্যকরণী পাতার রস লাগিয়েছি আজ।'

'দেখুন।'

'গন্ধ বেশী বাড়লে আপনি তো এ ঘরে থাকতে পারবেন না।'

'আপনি আছেন কি করে ওখানে?'

'আমার যে না থেকে উপায় নেই। ওঁকে যদ্দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়—।'

'যেদিন মরে যাবেন?'

'সেদিন পথে নামবো। আমি খঞ্জনি বাজাতে জানি। আবার কোন গানের মানুষের সঙ্গিনী হয়ে যাব। এটাই নিয়ম।'

'আপনি আগে যার সঙ্গে ছিলেন তিনি কি মারা গিয়েছেন?'

'না। সে আমাকে বিক্রি করতে চেয়েছিল। ইনি তখন আশ্রয় দিলেন।' তারপর সে হাসল, 'আপনার মন এতদিন ছবি আঁকতে চেয়েছে?'

'ও হ্যাঁ, ঠিক আসছে না।'

'অত বড় পেট এঁকেছেন, পৃথিবীটা খেয়ে নিতে পারে।'

সে চমকে তাকায়। ক্যানভাসে যে আঁচড় কেটেছে সে তাতে পেট আঁকার কোন চিন্তা ছিল না। দ্রুত ঘরে ফিরে এল। ছায়া নেমেছে ঘরেও। কিন্তু এবার মনে হল, তাই তো, একটা পেটের আদল এসে গেছে। কোন নারীর পেট। গর্ভবতী জননীর।

'মাতৃগর্ভের কথা আপনার মনে আছে?'

'অ্যাঁ। না, না তো।'

'উনি কার যেন একটা গান গাইতেন, মন রে সেই দেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ/ উদ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে সে দেশে বাস কইরেছ।' সঙ্গিনী চলে গেল পাশের

ঘরে। সে আলো জ্বাললো। ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালো তৈরি হয়ে।

যখন সঙ্গিনীর ডাক কানে এল তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, 'খাবার খাবেন না?'

'এখন থাক, আপনি খেয়ে নিন।'

সঙ্গিনী জবাব না দিয়ে ফিরে গেল। তারপরেই খঞ্জনির আওয়াজ কানে এল। সেই সঙ্গে সঙ্গিনীর গলায় বাজছে, 'তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি যীশু, তুমি কৃষ্ণ।'

সেই খঞ্জনির সঙ্গে কণ্ঠের মিল তাকে আরও উদ্দীপ্ত করল।

যখন ভোর হল তখন কাঠামো তৈরি, এবার মাটি রঙ দেবার পালা। সে উত্তেজিত হয়ে ডাকল, 'শুনুন, এদিকে শুনুন।'

সঙ্গিনী আসতে সময় নিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেমন লাগছে? কি মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু চিনতে পারছি না।'

'ঠিকই। একজন নারী দরকার। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, আপনাকে সামনে দেখে আঁকি।'

'আমাকে? কিন্তু এখন তো পারব না।'

'সে কি! এটুকু উপকার করতে পারবেন না?'

'আমি করলে সবটুকু করার কথা ভাবি, এটুকুতে মন ওঠে না। সেটা নিতে পারবেন?'

'আপনি দিলে, নেব না কেন?'

'তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। মাঝ রাতে ওঁর প্রাণবায়ু বৈকুণ্ঠে চলে গেছে। এখন ওঁর শরীরের সৎকারের প্রয়োজন। সেটা না হওয়া পর্যন্ত ওঁর পাশে থাকা আমার কর্তব্য।'

সে চমকে উঠল। বৃদ্ধ মারা গিয়েছে! দৌড়ে পাশের ঘরে গেল সে। তেমনি শুয়ে আছে বৃদ্ধ। হঠাৎই মনে হল এখন নিঃশব্দ শব্দরে খাবে।

'আপনি আমাকে ডাকেননি কেন?'

'আপনি সাধনায় ছিলেন। আর এসেই বা কি করতে পারতেন!'

ডাক্তার, গঞ্জের মানুষ, থানার দারোগা, সবাইকে জানিয়ে শেষ কাজ শেষ করতে দিন গড়িয়ে গেল। তারপর প্রশ্নটা উনল, সঙ্গিনী কোথায় যাবে? দশ

ক্রোশ দূরে একটি গোপালের মন্দির আছে, সেখানে আশ্রয় পেতে পারে সে। তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। ডাক্তারও এই কথায় সায় দিলেন। সামনের সপ্তাহে সেই মন্দির চত্বরে মেলা বসবে। অনেক বাউল আসবেন। তখন জলের মাছ জলে মিশে যেতে পারবে।

কথাটা তাকে বলা হল। সে তখন পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে বসেছিল। প্রস্তাব শুনে সে মাথা নাড়ল। সোজা চলে এল ঘরের দরজায়, 'এখন আমার আর বাধা নেই। আপনি আমার ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, আঁকতে পারেন।'

সে দূরে দাঁড়ানো মানুষজনের দিকে তাকাল। ওরা সবাই অবাক হয়ে শুনছে তাদের কথা। হঠাৎ ডাক্তার এগিয়ে এলেন, 'সাত দিন তো। এতদিন যখন এখানে নিরাপদে ছিল বাকি সাত দিনও থাকবে। তাছাড়া বাউলের স্মৃতি চারপাশে, এখানে থাকলে মন শান্ত হবে। চলুন আপনারা, রাত নামতে দেরি নেই।'

সবাই চলে গেল। যাওয়ার আগে কারও কারও চোখে যে চকচকে দৃষ্টি ফুটলো, তা তার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

সে ফিরে এল ক্যানভাসের সামনে। পেছনে সঙ্গিনী।

সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি খঞ্জনি বাজানো ছাড়া আর কিছু জানি না। আমাকে কি করতে হবে বলে দিন।'

'আজ আর আঁকার ইচ্ছে হচ্ছে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

'তাহলে খাবার দিই?'

'দিন।'

খাবার খেয়ে সে দেখল সঙ্গিনী নিজের জন্যে কিছু নেয়নি। সে হেসে বলল, 'আপনার কি অশৌচ চলছে?'

'না তো! ও, খাইনি বলে মনে হল? আসলে এত দুর্গন্ধ ছিল শরীরটায়, মনে হচ্ছে সেটা আমার শরীরে ঢুকে গেছে। অত নির্মল মনের মানুষের শরীরে কেমন করে অমন দুর্গন্ধ হয়!' সঙ্গিনী ছবিটার সামনে চলে গেল, 'একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'আপনার ছবির যে মেয়ে তার মধ্যে এত কাম কেন?'

'কেন, মেয়েদের কাম নেই?'

'না কোন মেয়ের মনের মূলে কাম থাকে না। পুরুষই তাদের মধ্যে কামনা

জন্মিয়ে দেয়। আপনার এই মেয়ে যদি নিষ্পাপ সঙ্গীহীনা হয় তাহলে এর মধ্যে কামনা থাকবে না। এর গর্ভ স্ফীত, কিন্তু সেখানে সন্তান নেই। এই জন্যেই ও পৃথিবীর সব আনন্দকে শরীরে ধরেছে। তাই না?'

সে কিছুই বলতে পারল না। সঙ্গিনী হাসল, 'যতদিন মানুষটা বেঁচে ছিলেন ততদিন আমাকে আপনার প্রয়োজন ছিল, তাই না?'

'তা কেন?'

'তা হলে আজ নিতে পারছেন না কেন?'

'সে উঠে দাঁড়াল। কাছে এগিয়ে বলল, 'কারণ আমি বাউল নই।'

'কিন্তু আপনি সাধক!'

'সাধক হবার সাহস আমার বুকে নেই। আমি নক্ষত্রের জল দেখতে পাই কিন্তু সাধনার সঙ্গিনীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে পারি না। চারপাশের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে যেতে পারি না।'

'তাহলে আমি চলে যাব?'

'আমার কোন উত্তর নেই।'

ভোর হল। সে নমস্কার করল। তারপর খঞ্জনি বাজিয়ে গৌরাঙ্গের গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

অসাড় হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ আহত পশুর মতো সে দৃষ্টিটাকে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টকুরো করে। ঘর গোছালো। স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজায় তালা দিয়ে।

স্ত্রী অবাক। ছেলেমেয়েরাও। ছবি আঁকতে গিয়েছিল যে ফিরে এল শূন্য হাতে। টেবিলে গোছা গোছা চিঠি। একজিবিশনের তারিখ এগিয়ে আসছে। ছবি চাই, অনেক ছবি। যেগুলো টাঙিয়ে দিলেই বিক্রি হবে অনেক টাকায়। পালাবার কোনও পথ নেই। এখানে এই দামি ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে কোন সবুজ দেখা যায় না। তবে আকাশ দেখা যায়। কলকাতার নোংরা হয়ে থাকা আকাশ।

আশ্চর্য! ছবি বের হচ্ছে তার হাত থেকে। একটার পর একটা। একশ সন্তানের জননীর মুখে এক ফোঁটা কামনার চিহ্ন নেই। গান্ধারীরা আগুনের মতো পবিত্র হয়ে উঠছে তার হাতে। আর যা কিছু অন্ধকার তা জমা হচ্ছে পৃথিবীর ধৃতরাষ্ট্রদের চোখে।

স্বামীর আত্মা

সকালবেলায় সদ্য চায়ের কাপ শেষ করেছে সৌরভ, বেল বাজল। আজ রবিবার, ক্রমাগত বেল বাজবেই। গত রবিবারে দরজা খোলা নিয়ে তৃণার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। হকারের দল, ঝি, দুধওয়ালা থেকে শুরু করে সৌরভের বন্ধুবান্ধব, আসার আর শেষ নেই। আজ সৌরভই দরজা খুলল। খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'একি? আপনারা?'

শাশুড়িঠাকরুন গম্ভীর মুখে বললেন, 'খুশি হওনি মনে হচ্ছে?'

'সে কি! আসুন আসুন। হঠাৎ না বলে কয়ে এলেন কেন।' সরে দাঁড়াল সৌরভ।

শ্বশুরমশাই দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনু কোথায়?'

'ভেতরে। মানে, রান্নাঘরে।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরমশাই শাশুড়িঠাকরুনের দিকে তাকালেন। যেন খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন। শাশুড়িঠাকুরুন দ্রুত ছুটলেন ভেতরে। তারপরই তাঁর গলা পাওয়া গেল, 'ওগো, এদিকে এসো। তিনু লুচি বেলচে।'

'অ, লুচি বেলচে।' বলে শ্বশুরমশাই ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সৌরভ কিছুই বুঝতে পারছিল না। শ্বশুরমশাই বাইরের ঘরের সোফায় বসলেন। অগত্যা তাকেও বসতে হল। টেবিলে রাখা খবরের কাগজটি তুলে শ্বশুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রোজ আনন্দবাজার পড়?'

'হ্যাঁ! ছেলেবেলা থেকেই ঐ কাগজটা...।'

'তুমি কখন বাড়ি ফের? অফিস তো পাঁচটায় ছুটি হয়ে যায়?'

'কোনও ঠিক নেই। আটটা ন'টা হবে।'

'আমি যখন চাকরি করতাম তখন সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে ছ'টায় বাড়িতে ফিরে আসতাম। অতক্ষণ বাইরে কী কর?"

'এই মানে বন্ধু-বান্ধব, ক্লাব—।'

'ভেগ কথাবার্তা। কোন ক্লাবের মেম্বার তুমি?'

'কেন বলুন তো?' থই পাচ্ছিল না সৌরভ।

‘তুমি শেষবার আমাদের বাড়িতে কবে গিয়েছ মনে আছে?’

‘হ্যাঁ মানে, এত ঝামেলায় থাকি।’

‘তিনু ভাইফোঁটায় গেল, তুমি গেলে না।’

‘ও ওর ভাইয়ের কাছে গেল, আমি আমার বোনের কাছে গিয়েছিলাম।’

‘জামাইষষ্ঠীতে যাওনি।’

‘দেখুন, বিয়ে হয়ে গেছে বছর আটেক। এখনও ওসব...।’

‘যখন তুমি বিয়ে করেছিলে তখন সাধারণ ক্লার্ক ছিলে, এখন অফিসার।’

‘আপনাদের আশীর্বাদ ছাড়া এটা হতো না।’

এই সময় শাশুড়িঠাকরুন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দু’প্লেট লুচি আর বেগুন ভাজা নিয়ে। সামনে রেখে বললেন, ‘ব্যাপারটা কি জানো, আগে মেয়েদের বিয়ে হত এগারো বারো বছর বয়সে। শাশুড়ির কাছে রান্না শিখত তারা। তাই তাদের বরদের মনে হত মায়ের হাতের রান্না খাচ্ছি। এখন তো বাইশ তেইশের নীচে কেউ বিয়ে করে না। যা কিছু শিখে আসে তা নিজের মায়ের কাছে শেখে। সে রান্না যদি বরদের পছন্দ না হয়, হতেই পারে পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু মানিয়ে নিতে দোষ কি! তোমার ধর লাল লাল লুচি পছন্দ, তরকারিতে মিষ্টি একদম সহ্য করতে পার না। তিনুর আবার মিষ্টি দেওয়ার ধাতটা আমার কাছেই পেয়েছে। হুট করে তো টেষ্ট পাল্টাতে পারে না।’

সৌরভ হতভম্ব গলায় বলল, ‘এসব কথা উঠছে কেন?’

শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরমশাই-এর দিকে তাকালেন। তিনি মাথা নেড়ে কিছু ইশারা করতে গিয়েই সামলে নিলেন। বললেন, ‘খাওয়া যাক। ঠাণ্ডা করে লাভ নেই।’

এইসময় আবার বেল বাজল। সৌরভ গেল দরজা খুলতে। ভবমামা দাঁড়িয়ে আছেন। কলকাতা পুলিশের জাঁদরেল অফিসার ছিলেন। এখনও তাঁর খুব প্রতাপ। ওদের বিয়েটা ভবমামাই দিয়েছেন সম্বন্ধ করে।

‘বাড়ির খবর কী।’ হুঙ্কার উঠল।

‘ভাল’। মিনমিন করে বলল সৌরভ। গত পাঁচ বছরে ভবমামা এখানে আসেন নি।

‘তাহলে বাড়িতে ঢুকতে পারি?’ জিজ্ঞাসা করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ভবমামা ভেতরে ঢুকলেন। ঢোকামাত্র তাঁর নজরে পড়ল শ্বশুরমশাই দিয়ে বেগুন ভাজা মুড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলা থেকে শব্দ বের হল,

'যাক। মিত্তিরমশাই তাহলে জামাই-এর বাড়িতে এসে লুচি খাচ্ছেন। আমি তো ব্রেকফাস্ট না করেই ছুটে এলাম।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'আপনি কি লুচি খাবেন?

'নো। শসা, টোস্ট, ঘি এবং জেলি ছাড়া আর দু-মুঠো মুড়ি।' ভবমামা সোফায় বসলেন। বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ভাগ্নে হয়ে তুমি, তুমি— ।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' সৌরভ কাতর গলায় বলল।

'লুচি খাও! তুমি জান না লুচি একটা মানুষকে খুন করতে পারে?'

'সপ্তাহে একদিন। আমাকে মা প্রতি রবিবার সকালে লুচি ভেজে দিতেন।'

'দিদির কোনও ডিসিপ্লিন সেন্স ছিল না। তোমার বাবা ব্লাড সুগার, ক্লোরোস্টাল, ইউরিক অ্যাসিড কাম হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ওইসব খাবার খেয়ে খেয়ে। আমি তো দিদিকে বলেছি জামাইবাবুকে তুমিই খুন ক ছ। তাই আত্মগ্লানিতে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করল।' ভবমামা সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

শ্বশুরমশাই-এর বেগুনভাজা পোরা হাঁ-মুখ বন্ধ হল না, 'সৌরভের মা, আত্মহত্যা করেছেন একথা বিয়ের আগে বলেননি কেন?'

'বললে বিয়ে দিতেন না?' ভবমামা সটান জিজ্ঞাসা করলেন।

'আলবাত দিতাম না।'

'ব্যাপারটা ভাবার বিষয়। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর দিদির মনে বৈরাগ্য এল। তিনি লুচি পরোটা মাছ মাংস তো ছাড়লেনই, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার বিকেল সাড়ে তিনটের সময় চারটি ভাত আর একটু তরকারি খেতেন তারপর সারা বিকেল-সন্ধে-রাত অম্বলের জ্বালায় জ্বলতেন। কাউকে কিছু বলেননি। যখন ধরা পড়ল তখন সিরোসিস অব লিভার। বেশি মদ্যপান করলে যে রোগ হয়। তা আপনি একে আত্মহত্যা বলবেন না মিত্তির মশাই? জামাইবাবু যদি আমার মতো শসা টোস্ট মুড়ি খেতেন তাহলে দিদিকে বিধবা হতে হত না, আর তাহলে সিরোসিস অব লিভারের প্রশ্ন উঠত না।'

এইসময় শ্বাশুড়িঠাকরুন একটা শসা চার পিস করে কেটে দুটো সেঁক পাঁউরুটির সঙ্গে নিয়ে এলেন। সঙ্গে এক বাটি শুকনো মুড়ি। জিজ্ঞাসা করলেন 'চা খাবেন তো?'

'কোথাকার চা?' ভবমামা জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরটা সৌরভকেই দিতে হল, 'কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে।'

'মাই গড। কোন বাগানের চা? দার্জিলিং, ডুয়ার্স না আসাম?'

'হ্যাপি ভ্যালি।'

'গুড। চিনি এবং দুধ ছাড়া।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে না হতেই আবার বেল বাজল। সৌরভ দরজা ্লে দেখল রোগাসোগা একজন দাঁড়িয়ে আছেন।

সৌরভ জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন?'

'আপনি মিস্টার সৌরভ দত্ত?'

'হ্যাঁ।'

'আমি লোক্যাল থানার ওসি।'

'ও।'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'রান্নাঘরে, লুচি ভাজছে।'

'লুচি'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গ্যাসে, না কেরাসিনে?'

'গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে। কাল দেবে বলেছে। কেরাসিনেই ভাজছেন।'

'মিস্টার ভবরঞ্জন বসু আপনার মামা?'

'হ্যাঁ। উনি ভেতরে আছেন।'

'ও, তাই নাকি?' ওসি ভেতরে এলেন। এসে শ্বশুরমশাইকে বললেন, আমি এসে গিয়েছি মিস্টার বোস।'

ভবমামা বললেন, 'জীবনে প্রমোশন হবে না।'

'আমি ঠিক...ওসি থমমত হয়ে গেলেন।

'কেরাসিনের ভয়ঙ্করত্ব জানা সত্ত্বেও আপনি কোনও স্টেপ নিলেন না। ়ল্টো এখানে এসে মিস্টার বোস করছেন। আমাদের আমলে রিটায়ার্ড ়সনিয়ার অফিসারদেরও আমরা স্যার বলতাম।' ভবমামা গম্ভীরমুখে শসা ়চবোতে লাগলেন।

ওসি ব্যস্ত হয়ে উঠতেই শাশুড়িঠাকরুন তাঁকে জানালেন স্টোভ নিভিয়ে ়দওয়া হয়েছে, আপাতত চিন্তার কোনও কারণ নেই। শ্বশুরমশাই ওসিকে

বসতে অনুরোধ করলেন। ওসি চেয়ারে বসে ভবমামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, এবার কী করতে হবে?'

ভবমামা শাশুড়িঠাকরুনকে বললেন, 'মিসেস মিত্তির। আপনি শুরু করুন।'

শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরমশাই-এর দিকে তাকালেন, তিনি মাথা নাড়লেন শাশুড়ি ঠাকরুন বললেন, 'কী বলব! এসব তো আমাদের আমলে কখনও ছিল না।'

'কীসব?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

ভবমামা বলে উঠলেন, 'হচ্ছে না। এভাবে হবে না। বউমা কোথায়? বউমা?'

তৃণা মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে।

'এঃ, সাতসকালে, ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে গেছে। এত টেনসন হচ্ছে কেন তোমার?'

সৌরভ বলল, 'আজ্ঞে রান্নাঘরে খুব গরম তো!'

'গরম যদি মনে হয়ে থাকে তাহলে ফ্যান লাগাওনি কেন?'

'গ্যাস স্টোভ নিভে যাবে যে।'

'রাবিশ। হ্যাঁ বউমা, ইদানীং তোমার কী হয়?'

তৃণা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর সৌরভের দিকে তাকাল, 'তুমি কিছু মনে করবে নাতো? বিশ্বাস কর, আমি একটুও বিশ্বাস করি না, তবু ভয় হয়।'

ভবমামা বললেন, 'ভয় হয়? ওসি নোট করুন। কেন ভয় হয়?'

'খবরের কাগজ পড়ে?'

'কী পড় তুমি!'

'গত তিনমাসে একশো বাইশটা বউ হয় খুন হয়েছে নয় আত্মহত্যা করেছে।'

ওসি চমকে উঠল, 'মাই গড। স্ট্যাটিস্টিকসটা পেলেন কী করে?'

'খবরের কাগজ থেকে। আমি লিখে রেখেছি।' তৃণা দ্রুত একটা খাতা নিয়ে এল। ভবমামা সেটা নিয়ে চোখ বোলালেন, 'মগরার নমিতা মণ্ডল গুসকরার অঞ্জলি দাস, লিলুয়ার কৃষ্ণা দত্ত...ও এগুলো খুনের লিস্ট। আত্মহত্যার লিস্টটা দেখছি বেশ বড়। আত্মহত্যার আবার রকমের আছে, কেরাসিনের

াগুনে, গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে, জলে ডুবে, ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে। শেষের দুটোর সংখ্যা দেখছি খুবই কম।

ওসি খাতাটা চেয়ে নিয়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব খবর কাগজে পড়ে আপনার নিজের জন্যে ভয় করে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি মনে হয় আপনার অবস্থা এইসব মহিলার মতো হতে পারে?'

তৃণা জবাব দিল না। শাশুড়িঠাকরুন ওর পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, জবাব দে, তিনু। তোর চিঠি পড়ে আমাদের প্রেসার বেড়ে গেছে। সবাইকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি।'

হঠাৎ ভবমামা বলে উঠলেন, 'ওই ছোকরা তোমাকে খুন করতে পারে বলে সন্দেহ করছ?'

'আজ্ঞে না। তবে।'

'তবে কী?'

'ওইসব স্বামীরাও তো ভাল ছিল।' কাঁপা গলায় জবাব দিল তৃণা।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'সব জামাই প্রথম প্রথম সোনার টুকরো থাকে।'

ওসি বললেন, 'এক মিনিট। বিয়ের সময় যা যা পণ জামাই চেয়েছিল দিয়ে দিয়েছেন?'

ভবমামা মাথা নাড়লেন, 'নোঃ। সৌরভ এক পয়সা পণ নেয়নি।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কথাটা সত্যি।'

'আপনার স্বামীর জীবনে অন্য কোন মহিলা এসেছে?'

'কী করে বলব?'

'বলব মানে? স্ত্রীদের ঘ্রাণশক্তি ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।' ওসি বললেন।

'আমি বুঝতে পারি না।'

'তাহলে আসেনি। থার্ড পয়েন্ট, আট বছরে আপনাদের কোনও ইস্যু হয়নি?'

'না।'

'এটা একটা সিরিয়াস পয়েন্ট। কিন্তু ম্যাডাম, কী থেকে মনে হল আপনার স্বামী আপনাকে খুন করতে পারেন?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার ঠিক তা মনে হয়নি, আবার...। আসলে রেগে গেলে ওর চোখ

খুনির মতো হয়ে যায়। তখন চিনতে পারি না ওকে।'

'তাই! রাগে কেন?'

'রান্না ভাল না হলে রেগে যায়, এক কথা বারবার বললে রেগে যায়...?'

'তখনই খুনি-খুনি দেখতে হয়ে যায়?'

'ওর চোখ দুটো।'

ভবমামা শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'মাতুল বংশের ধারা। আমারও নাকি ওরকম হয়।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'আপনি অবিবাহিত, আপনার চোখ নিয়ে কে ভাবছে?'

ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন?'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'কেউ না। একটা ঠিকে ঝি আছে। সে দেখছি আজ আসেনি।'

ভবমামা বললেন, 'তাহলে তো বউমাকে সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। ক্রিমিন্যাল।'

এতক্ষণ সৌরভ অসহায় হয়ে শুনে যাচ্ছিল। এবার না বলে পারল না, 'আপনারা কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি ওকে খুন করতে যাব কেন? তৃণা, তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'ও তোমাকে অবিশ্বাস করে না। কিন্তু চারপাশে যা ঘটছে সেটা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে তোমার বাবা মা কাকা জ্যেঠা থাকলে তো ও ভয় পেত না।'

ভবমামা বললেন, 'এটা কী রকম কথা হল? বিয়ের সময় ছেলে বউকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে শুনে খুশিতে ডগমগ হয়েছিলেন, কী হননি?'

'তখন এত খুন আত্মহত্যা হত না।' শাশুড়িঠাকরুন বললেন।

ওসি বললেন, 'দাঁড়ান। আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে দিন। তৃণা দেবী, আপনার কি মাঝে মাঝে আত্মহত্য করতে ইচ্ছে করে?'

তৃণা মাটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'সর্বনাশ। কেন করে?' ওসি চিৎকার করে উঠলেন।

'ও যখন আমাকে ভুল বুঝে রেগে যায়, তখন।'

'আপনি ডিভোর্স চান?'

'ও মা কেন? ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না। পারব না বলে খুন হতে

অথবা আত্মহত্যা করতে একদম চাই না।' তৃণা জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

ওসি ভবমামার দিকে তাকালেন, 'স্যার, আপনি তো আইন জানেন। আগামের ব্যবস্থা এখানে আছে। আগাম জামিন যেমন নেওয়া যায় তেমনি আশঙ্কার কথা থানায় জানানো যায় আগাম। সেটা কেউ করলে পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'সেটা আমি লিখিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি।'

ওসি বললেন, 'আপনি নন, ওঁকে জানাতে হবে। সেটা পাওয়ামাত্র আমি সৌরভবাবুকে জানিয়ে দেব যে তৃণা দেবীর আত্মহত্যা অথবা খুনের দায়িত্ব তাঁর ওপরই পড়বে। অন্য কেউ করলেও তিনি রক্ষা পাবেন না।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'চমৎকার। আমার মেয়েটা যদি খুন হয়ে যায় তাহলে তাকে কোথায় পাব আমি? খুন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন।'

এইসময় আবার বেল বাজল। সৌরভ উঠল না। তৃণাই গেল দরজা খুলতে। একটা বারো তেরো বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, 'কালোর মা তোমাদের বাড়িতে কাজ করে?'

'হ্যাঁ। কেন রে?'

'আমাকে বলতে পাঠাল আজ আসতে পারবে না। কাল আসবে।'

'কী হয়েছে ওর?'

'কাল রাতে কালোর বাপ মারা গিয়েছে। বডি আনতে হাসপাতালে গেছে সবাই।'

'সেকি, কী করে হল?'

'কী করে আবার? মাল খেয়ে গাড়ির তলায় পড়েছে। সবাই বলছে কালোর মা বেঁচে গেছে। খুব প্যাঁদাত তো। কান্নাকাটি করছে না। আমায় বলল খবরটা দিতে।'

এ ঘরের সবাই শুনছিল সংলাপগুলো। ওসি বললেন, 'ও ওই লোকটার বউ বুঝি এখানে কাজ করে! হ্যাঁ কাল মারা গিয়েছে। গিয়ে ফ্যামিলিটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যাক গে, সৌরভবাবু, আপনাকে আমার শুধু একটা কথা বলার আছে। মেয়েদের মন খুব টেন্ডার হয়, সাবধানে হান্ডেল করবেন। আচ্ছা চলি স্যার।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সৌরভ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'না। কেন? ও, আরে বইতে তো পড়েছি। কুসুম কোমল। হে হে হে।' ওসি চলে গেলেন।

ফিরে এসে সৌরভ বলল, 'তৃণা আমার মনে হয়, তোমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।'

'একদম নয়। বিয়ের পর কেউ বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকে নাকি।' তৃণা প্রতিবাদ করল।

'এই যে আজ যা করলে—।'

'আমি কিছুই করিনি। দেখেছ মা, খামোকা আমাকে দোষ দিচ্ছে। একটু পরেই ওর চোখ লাল হয়ে যাবে, ঠিক খুনির মতো।' তৃণা মায়ের কাছে চলে গেল।

ভবমামা বললেন, 'না সৌরভ, চোখ লাল করার অভ্যেস ছাড়ো। আমার মনে হয় এখন তোমার উচিত ছোটদি, তোমার মেজমামি, বড় মামিদের ডেকে এনে পালা করে বাড়িতে রাখা। আমিও মাঝে মাঝে থাকতে পারি। আপনারাও আসুন। কী বলেন?

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'জামাই-এর বাড়িতে তো বেশিদিন থাকা শোভন নয়, মেয়েজামাই আমাদের ওখানে পাকাপাকি থাকতে পারে।'

তৃণা বলল, 'এখন না মা। কটা দিন দেখি, তারপর বলব।'

দুপুরের স্নান খাওয়া শেষ করে ওঁরা বিদায় নিলেন। সৌরভের মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। তৃণাকে সে এত ভালবাসে তবু ও তাকে এতটা সন্দেহ করে। কেউ সন্দেহ করলে তার মন জোর করে পরিষ্কার করা যায় না। কালোর বাবার সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নেই। তবু লোকটা মদফদ খেয়ে জীবনটা তার মতো উপভোগ করে গেছে। নিজেকে প্রচণ্ড অপমানিত বলে মনে হচ্ছিল তার।

এইসময় তৃণা কাছে এল, 'এই, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

সৌরভ জবাব দিল না।

'আসলে জানো তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু মেলে না।'

'এতদিন বলনি তো?'

'বললে তুমি শুনতে? আমার যা করতে ইচ্ছে করে তা তোমার ভয়ে করতে পারতাম না।'

'তাই নাকি? যেমন?'

'যেমন ধরো, আমার কোনও ছেলেবন্ধু নেই। বিয়ের আগেও ছিল না, এখন তো কথাই ওঠে না। কিন্তু বইতে পড়ি দ্রৌপদীর সখা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমাকে ওই ইচ্ছের কথা বললে তুমি শুনতে?'

'বেশ তো, এখনও যাও না, শুধু কৃষ্ণ কেন আরও চার পাণ্ডবকে ডেকে আনো।'

'ধ্যাত। ওটা বিশ্রী ব্যাপার।' তৃণা চলে গেল, যেন লজ্জা পেয়েছে।

রাত্রেও তেমন কথা হল না। কথা বলতে ইচ্ছেই করছিল না সৌরভের। কিন্তু সে খুব চেষ্টা করে ক্রোধ সংবরণ করছিল।

পরদিন সকালে কালোর মা এল, 'কাল কামাই করতে হল, কিছু মনে করো না বউদি। লোকটা হাজার হোক মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল। বডি বের করে না পুড়িয়ে থাকি কী করে!'

'তোমার একটুও কষ্ট হয় নি?' তৃণার গলা।

'নাঃ। বেঁচে থাকতে যা কষ্ট দিয়েছে তাতে সব হয়ে গেছে।

'এক ফোঁটা কাঁদোনি।?'

'না। কাঁদব কেন? বেঁচে গেছি আমি। এ না মরলে আমাকে ঠিক খুন করত।' কাজে লেগে গেল কালোর মা।

পায়ে পায়ে ঘরে এল তৃণা। বিছানায় বসে পাথর হয়ে কথাগুলো শুনছিল সৌরভ। তৃণা এসে ওর গায়ে ঠেলা দিল, 'এই কী ভাবছ? যাঃ, এরকম করে বসে থেকো না। বিধবা হবার কথা ভাবলে আমার এখনই কী কান্না পায়! এই জানো?'

'তখন কেঁদে কি লাভ হবে।' অদ্ভুত গলায় বলল সৌরভ।

'শুনেছি বিধবা বউ কাঁদলে স্বামীর আত্মা শান্তি পায়। বাঙালি মেয়ের উচিত স্বামীকে শান্তি দেওয়া, তাই না? ওঠো, ওঠো বলছি।' তৃণা হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল।

রেগে যেতে যেতেও নিজেকে সামলে নিল সৌরভ। চাপা গলায় বলল, 'তুমি আমাকে অপমান করেছ।'

তৃণা চেঁচাল, 'মোটেই না। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমি আত্মহত্যা করলে বা খুন হলে পুলিশ তোমাকেই ধরত। সারাজীবন ধরে জেলে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে তা থেকে বেঁচে গেলে, একটু কৃতজ্ঞ হও, প্লিজ।

গড়েছি প্রতিমা বিসর্জনেরই জন্য

তখন বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসত। চারপাশে গাছগাছালি, সবুজ ঘাসের মাঠ আর চায়ের বাগান। মাথার ওপরে যে আকাশ তাকে মেঘ ছাড়া ময়লা করার মতো আর কেউ ছিল না। পর পর গোটা বারো বাড়ি, বাড়ি ভর্তি ফুলফলের গাছ সারা দিনরাত অপূর্ব শান্তিতে মজে থাকত। শব্দ হত আসাম রোডে। তখন রাস্তাটা ছিল অল্প চওড়া, দু'ধারে সার দেওয়া শাল দেওদার গাছেরা ঝুঁকে ছায়া বিছিয়ে রাখত যাতে পিচ গরমে না গলে যায়, মাঝে মাঝে গাড়ি ছুটে গেলে শব্দ বাজত। চল্লিশ বছর আগে আমরা পালা করে জেগে শুনেছিলাম ওই রাস্তায় তিরিশটা গাড়ি যাতায়াত করেছে চব্বিশ ঘণ্টায়। তিরিশটা গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হত কতটুকু!

বর্ষাতেই বাতাবিলেবু গাছে কুঁড়ি ধরত। জন্মাষ্টমীর আগের বিকেলে দু'জন সঙ্গী নিয়ে হাজির হতেন গুরুপদ ঠাকুর। তাঁর এসে যাওয়া আর বাতাসে বাতাবির গন্ধ মানেই পূজো শুরু হয়ে যাওয়া। খোকনদের বাসরের ঘরে বসে গুরুপদ ঠাকুর জানতে চাইতেন এবার মায়ের মূর্তি কী রকম হবে? বয়স্করা অভিমত দিতেন। জন্মাষ্টমীর সকালে কাজ শুরু করতেন তিনি। আমার সেই বাল্যকালে ওই মানুষটি ছিলেন ঈশ্বরের মতো। একটু একটু করে তাঁর আঙুলের স্পর্শে কাঠ খড় আর মাটির তাল কী অপূর্ব দেবীমূর্তিতে পরিণত হয়ে যেত আর মনে মনে ভাবতাম কবে আমি ওই বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারব। কতবার যে ওঁকে বলেছি আমাকে শিষ্য করে নেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন। একদিন বলেছিলেন, 'আমি যাই করি এই সাতজনের বেশি তৈরি করতে পারব না। তোমাকে বাবা আরও অনেক বেশি মূর্তিতে প্রাণ দিতে হবে'। আজ পঞ্চাশ পেরিয়ে মনে হয়, চাইলেই যদি সব পাওয়া সম্পূর্ণ হত। তখন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই খোকনের বাড়িতে ছুটে যেতাম। বাঁশের ফ্রেমে খড় বাঁধা হচ্ছে। বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। দিন ফুরোলে কাজ করতেন না গুরুপদ ঠাকুর। আমাদেরও ছুটি মিলত। তারপর মাটি পড়বে, শেষে রং। ইতিমধ্যে আমাদের কোয়াটার্সের সামনের মাঠের ঠিক মাঝখানে বিরাট চাঁপাগাছের নীচে প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হয়ে গিয়েছে। তিন দিক আর ছাদে টিনের আড়াল, তার ওপর ত্রিপল। ডুয়ার্সে বৃষ্টি আসে আচমকা, গত পূজো ভেসে গিয়েছিল

জলে জলে। গুরুপদ ঠাকুরের খাবার আসত এক একদিন এক এক বাড়ি থেকে। শেষের দিকে ওঁর কথা শোনার খুব ইচ্ছে হত। আলিপুরদুয়ার না হাসিমারা কোথায় যেন তাঁর বাড়ি। ও সব ছেড়েছুড়ে দেড় মাস আগে বেরিয়ে পড়তেন ঠাকুর গড়তে। যত বছর যাচ্ছিল তত ওর শরীর শীর্ণ হচ্ছিল। খালি গায়ে কাজ করার সময় ওর বুকের পাঁজর গুনতাম আমি। বিড়ি খেলেই কাশি হত, তখন সেই পাঁজরের বীভৎস কাঁপুনি দেখা খুব কষ্টের ছিল। গুরুপদ ঠাকুর কিন্তু নির্বিকার ছিলেন। সেই বয়সে বুঝে গিয়েছিলাম, শিল্পীরা নিজের সম্পর্কে বড় উদাসীন হয়।

সেই শৈশবে আমরা চার বন্ধু চা-বাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া তিরতিরে নদী আংরাভাসাতে লাল চিংড়ি ধরতাম, গুলতি দিয়ে শেডট্রিতে বসে থাকা ঘুঘু মারতাম। আমাদের বয়সী আর কেউ ছিল না বলে মদেশিয়া শ্রমিকদের ছেলেদের নিয়ে বাতাবিলেবু দিয়ে ফুটবল খেলতাম। একমাত্র আমাদের বাড়িতেই গাড়ির ব্যাটারি দিয়ে চালানো রেডিও বাজত। খবর আর নাটক ছাড়া সেই রেডিও খোলা হত না বলে আমাদের অভিমান ছিল। আমরা চারজন গুরুপদ ঠাকুরের চারপাশে ঘুরঘুর করতাম। কার্তিক বা গণেশকে আমরা ঠিক আমল দিতাম না, অসুরকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলার জন্যে গুরুপদ ঠাকুরকে অনুরোধ করতাম। তিনি হাসতেন, 'নারে! যারা হাসতে হাসতে খুন করতে পারে তারাই সত্যিকারের ভয়ঙ্কর। দেখলি না, ওরা দেশটাকেকী রকম হাসিমুখে দু'টুকরো করে ফেলল।' কথাটা মনে গেঁথে গেল। মহালয়ার ভোরে রেডিও বাজল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর অন্ধকারে আমাদের বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যেত মাঠে। তখন হ্যাজাক জ্বলছে মণ্ডপে। মা অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মাথায় চুল তখনও পরানো হয়নি। কী করুণ সেই মূর্তি। বাপী আমার হাত ধরে বলেছিল, 'গুরুজন মারা গেলে ছেলেরা মাথা ন্যাড়া করে, মেয়েরা করে না কেন?' উত্তরটা জানা ছিল না। করলে আমাদের পরিচিত মহিলাদের কি মহালয়ার সকালের মায়ের মতো দেখাত? খোকন একটু বেশি বুঝত। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসা গুরুপদ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা মহালয়ায় পিতৃতর্পণ করতে হয়, মাতৃতর্পণ হয় না কেন?' কথাটা শুনে গুরুপদ ঠাকুর থমকে গিয়েছিলেন। তারপর দেবীর অসম্পূর্ণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন সশব্দে। আমরা কেউ সেই কান্নার অর্থ বুঝতে পারিনি।

মাঠে শামিয়ানা টাঙানো হত পঞ্চমীর সকালে। আর তখনই গোলামচাচা

আসত। চা-বাগান থেকে একটু দূরে গঞ্জে তাঁর দর্জির দোকান। মাসখানেক আগে এসে তিনি মাপ নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবার কিনে দেওয়া থান কাপড়ে শার্ট প্যান্ট বানিয়ে নিয়ে আসতেন। সে সব পোশাক সে দিনই পরে ফেলতে চাইতাম আমি। মায়ের আপত্তিতে তা সম্ভব হত না। দুপুরে বাড়িসুদ্ধ লোক কাগজে পায়ের মাপ আঁকত। সেটা তদারকি করতাম আমি। বিকেলে বাবা সেই সব কাগজ নিয়ে যেতেন বানারহাটে, জুতো কিনতে। ফিরতেন মা পিসিমার শাড়ি আর বয়স্কদের ধুতির সঙ্গে জুতোর বাক্স নিয়ে। এক পলক সে দিকে তাকিয়ে রাত্রের খাওয়া সেরে আমি ছুটতাম মণ্ডপে। ওই একটি রাত্তির বাড়ির বাইরে কাটাবার অনুমতি পাওয়া যেত। আমরা চার বন্ধু মায়ের একটু দূরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসতাম। ওই রকম একটি রাত্রে এসে শহর থেকে আসা এক কিশোরী আমারও চোখ এঁকে দিয়েছিল। সে গল্প আমি লিখেছি আগে। পূজোর দিন যদি আশ্বিনের শেষে পড়ত তা হলে বাতাসে শীতের কামড় শুরু হয়ে যেত। ডুয়ার্সের চা-বাগানে ভূটানের ঠাণ্ডা তখন নেমে পড়ছে একটু একটু করে। আমরা চার বন্ধু চাদরের তলায় গুটিসুটি মেয়ে তাকিয়ে আছি সামনে। সে দিন আরও কয়েকটা হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেওয়া হত মণ্ডপের সামনে। তার আলোয় জায়গাটা দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু ওই চৌহদ্দি পার হলেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে আসাম রোড ধরে ছুটে যাওয়া ট্রাকের আলো ছাড়া পৃথিবীটার কোনও অস্তিত্ব নেই। বড়দের মধ্যে যাঁরা একটু বেশি পরিমাণে আস্তিক তাঁরা চেয়ার নিয়ে বসতেন মাঙ্কি কাপ পরে।

ভরত ঢাকি তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সর্তক হয়ে বসে থাকত একপাশে। গুরুপদ ঠাকুর প্রথমে মা দুর্গাকে প্রণাম করতেন। তারপর বিড়বিড় করে মিনিটখানেক কিছু বলতেন। তারপর ওই রোগা শরীর থেকে আর্তনাদের মত 'মা' শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে আসত। ওঁর দু'জন সঙ্গী তখন লম্বা টুলটা এগিয়ে দিতেন। গুরুপদ ঠাকুর তাতে উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে রঙের জায়গা অন্য হাতে তুলি নিয়ে ঠাকুরের অন্ধ-চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। বড়দের কেউ বলতেন, 'এখনও তিরিশ সেকেন্ড বাকি আছে।'

ঠিক বারোটা বাজামাত্রা তুলি স্পর্শ করত মায়ের চোখ আর তখনই ভরতের কাঠি পড়ত ঢাকের গায়ে। ঢাকঢোল কাঁসর ঘন্টা উত্তাল হয়ে উঠত। মনে হত অন্ধকারে সব আড়াল খান খান হয়ে পড়ে যাচ্ছে। আর সেই বিপুল

শব্দের মধ্যে মায়ের চোখ একটু একটু করে মানুষীর চোখ হয়ে যেত। আমাদের সেই বালক বয়সে সেই চোখ বুকের গভীরে সেই যে আঁকা হয়ে গিয়েছে চোখ বন্ধ করলেই আজও তাকে দেখতে পাই।

মা মানুষ হলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল তাকে সম্পূর্ণ করতে। মুখে হাতে তেল চকচকে পদার্থ মাখিয়ে সৌন্দর্য আরও বাড়ানো হলো। পরানো হল চুল। তারপর একে একে ছেলেমেয়েদের শরীর ছুঁয়ে অসুরের কাছে পৌঁছাতেন গুরুপদ ঠাকুর। রাত যখন শেষ হয়ে আসছে তখন সম্পূর্ণ দেবীপ্রতিমার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে তিনি কিছুক্ষণ কাঁদতেন। কেউ তাঁকে বাধা দিত না। কেউ প্রশ্ন করত না। শুধু ভরত একা অদ্ভুত মায়াবি ছন্দে ঢাক বাজিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত বড়দের কেউ এসে ডাকত, 'গুরুপদ, ওঠ।'

গুরুপদ ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করতেন, যদি বাঁচিয়ে রাখো, সামনের বার মা, সামনের বার। এ কথার অর্থ বোঝার বয়স তখন ছিল না। মনও নয়। আমরা তখন দেখেছিলাম আকাশটা কী রকম নীল হয়ে যাচ্ছে। আমরা চারজন পাগলের মতো দৌড়তাম শিশির ভেজা মাঠের ওপর। তখনও ভোর হতে দেরি, সূর্য উঠবে আরও পরে। কিন্তু রাত জাগার পর আমাদের যেন ভোর হয়ে যেত। মাঠের অন্য প্রান্তে গিয়ে দেখতাম মণ্ডপে মায়ের সামনে সারারাত জ্বলা হ্যাজাকগুলো একে একে নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশু বলল, 'পূজা শুরু হয়ে গেল রে।'

গোটা কুড়ি বাঙালি হিন্দু পরিবার আর মদেশিয়া মুণ্ডা কয়েকশ শ্রমিক নিয়ে তখন চায়ের বাগান চলত। এইসব শ্রমিকদের বেশিরভাগই এসেছিল রাঁচি, হাজারিবাগ থেকে। বাধ্য হয়ে ক্রিশ্চান হয়েছিল একসময়। কিন্তু মা মেরি এবং মা দুর্গার মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য তাঁরা খুঁজত না। ফলে পূজোর চারদিন তাদের ঢল নামত মাঠে। এমনকি যে কয়েকজন মুসলমান কর্মী ছিলেন তাঁরাও নিজে থেকে যোগ দিতেন পূজোয়। মণ্ডপের বাইরে যখন ধউসি নৃত্য হত তখন পূজোটা আর তথাকথিত হিন্দুদের মনে হত না। এই ব্যাপারটা কিন্তু মাইলখানেক দূরের গঞ্জের পুজোয় দেখা যেত না। সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ছিল বেশ বেশি। ঠাকুর দেখার নাম করে আমরা একবার শুধু সেই প্রতিমার মুখ দেখে আসতাম।

সপ্তমীর সকালে গুরুপদ ঠাকুর চলে যেতেন। আমরা লক্ষ করতাম ভোরে মণ্ডপ ছেড়ে চলে আসার পর তিনি আর ওমুখো হতেন না। টাকা পয়সা থেকে শুরু করে চালডালের পুঁটলি নিয়ে রওনা হবার আগে বড়রা তাঁকে

বলে যেতেন প্রতিমা কেমন লাগছে। সে সব মন্তব্য এখনও কানে লেগে আছে, 'ওহে গুরুপদ, এবার যেন মায়ের মুখ সিনেমা আর্টিস্টের মত করে ফেলেছ।' 'না গুরুপদ, মাকে একটু লম্বাচওড়া কর।'

'অসুরটাকে বড় লাগছে।' গুরুপদ ঠাকুর জবাব দিতেন না। রওনা হবার আগে আমাদের চারজনের মাথায় হাত রাখতেন। বাপী জিজ্ঞাসা করত, 'সামনে বছর আসবেন তো?'

'মা যদি আনেন তো আসব।' হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'চোখ আঁকার পর আপনি কাঁদেন কেন?' 'জানিনা রে। ভেতর থেকে কান্না আসে। ছেলে কি কখনও মায়ের চোখ ফোটাতে পারে? বৃথা চেষ্টা।' গুরুপদ ঠাকুর মণ্ডপের উল্টোদিক দিয়ে যখন বাস ধরতে যেতেন তখন আমার খুব কষ্ট হত। এতদিন ধরে যে লোকটা তিলতিল করে প্রতিমা গড়ল আজ তার কোনও প্রয়োজন নেই। মনে আছে একবার ওরকম যাওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিমা গড়েছি নিরঞ্জনের জন্যে।' এই একটি কথায় যে সত্য স্পষ্ট তা সারাজীবন ধরে বুঝতে চেষ্টা করেছি। এখন যে অস্পষ্টতা আছে তা বুঝতে পারি যখন কারও কোনও কাজে ব্যথা পাই। নিজের সৃষ্টি—সেটা যাই হোক না কেন—সম্পর্কে উদাসীন হতে না পারলে দুঃখ পাওয়া অনিবার্য। নিরঞ্জন অবশ্যম্ভাবী এটা যদি মেনে নেওয়া যায় তা হলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। ওই একটি মানুষ, যাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। মরসুমি পাখির মত প্রতি বছর কিছুদিনের জন্যে এসে শুধু প্রতিমাই গড়েননি, আমাদের বালকমনকে সামান্য নাড়াও দিয়ে গিয়েছেন। এই কিছুদিন আগে আমি গিয়েছিলাম চা-বাগানে। সেখানে আমার একদা পরিচিতদের মধ্যে খুব কমই এখন কর্মরত। বন্ধুবান্ধবরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। দীপু কোথায় জানি না। বিশু বা তপনের সঙ্গে দেখা হল না। খোকন ট্যাক্সির ব্যবসা করে। চা-বাগানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। গঞ্জের একপাশে বাড়ি করে আছে। গঞ্জ বলে যাকে চিনতাম তারও চেহারা পাল্টেছে। ছোটখাটো শহর হয়ে গিয়েছে এখন। চৌমাথায় ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দেখা হলে খোকন হাসল, 'কেমন আছ?' দীর্ঘকালের অদর্শন তুই থেকে সম্পর্ক তুমি-তে তুলেছে। আমি কলকাতায় লেখালেখি করি সে ট্যাক্সি চালায়। চেহারা এবং পোশাকে সেই ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু তুই-তে নেমে আসতে দেরি হয়নি আমাদের। এ নেই ও নেই-এর খবরগুলো খোকন আমাকে দিল। তারপর বলল, 'বাগানের কোয়ার্টার্সের দিকে যেতে ইচ্ছে করে না একটুও। বড়রা তো সবাই চলে গেল, রবিদা থেকেও নেই।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'পূজো হয়?'

'বাপ্‌স! এখন তো হেভি খরচা করে হয়।' 'আমাদের পূজোর কথা তোর মনে আছে?' ধুলোওড়া শুকনো মাটিতে হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি ঝরলে যে চেহারা হয় খোকনের মুখ সেইরকম হয়ে গেল। বলল, 'মাঝেমাঝেই গুরুপদ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে।'

'উনি বেঁচে আছেন?'

'কব্বে মারা গিয়েছেন। আমি একবার ট্যাক্সি নিয়ে ওদিকে গিয়েছিলাম। খবর নিলাম। ওঁর ছেলে মুদির দোকান করেছে। বাপের নাম শুনলেই গালিগালাজ করে।'

'সেকি! কেন?'

'ওর মতে বাপ সংসার দ্যাখেনি বলে ওদের দুর্দশা।'

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কোনটা সত্যি? আমাদের কাছে যে নায়ক সে নিজের সন্তানের কাছে ভিলেন হয়ে আছে? একই মানুষের এই দ্বৈত ভূমিকার কথা এখন আর অস্বীকার করি কী করে?

বিকেল হলেই গাড়ির ভিড় লেগে যেত। বিভিন্ন চা-বাগানের নাম লেখা ট্রাকগুলো এসে থামত মাঠের একপাশে। সেইসব বাগানের কর্মীরা সপরিবার নেমে আসতেন ট্রাক থেকে ঠাকুর দেখবেন বলে। আমরা লরি দেখে গুনতাম বানারহাট, কারবালা, তেলিপাড়া. ডিমডিমা, লক্ষ্মীছাড়া—। বড়দের সঙ্গে এদের অনেকের পরিচয় ছিল। প্রসাদ বিতরণ চলত। আর একটু বড় হয়ে আমরা মেয়েদের সাজগোজ দেখতাম। এই বাগানের মেয়েদের চেয়ে অন্যরকম। গত বছর যে বালিকা হয়ে এসেছিল এ বছর সে কিশোরী। প্রসাদ হাতে তুলে দেওয়ার সময় বিশু একটি মেয়েকে বলেছিল, 'তুমি তো বড় হয়ে গেছ।'

মেয়েটি ঠোঁট মুচড়ে বলেছিল, 'নিজে যেন বুড় হয়ে গেছে!'

এই নিয়ে আমরা বিশুকে কম খ্যাপাইনি। অন্তত আট-দশটা বাগানের লরি পুজোর তিনদিন ঠাকুর দেখতে আসত এবং বছরের অন্য সময় তাদের দেখা আমরা পেতাম না। তা সত্ত্বেও কীরকম যেন যোগাযোগ হয়ে থাকত। বাগানের কাজে যে নবীন বাবুটি শহর থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি এভাবেই প্রেমে পড়েন রিয়াবাড়ি বাগানের লরিতে আসা এক সুন্দরীর। ওই এক বিকেলের দেখা ভদ্রলোককে এমন চঞ্চল করে তুলেছিল যে তিনি সুযোগ পেলেই রিয়াবাড়িতে ছুটতেন। কিন্তু পাক্কা এক বছর সেই সুন্দরীর দেখা পাননি কারণ সে তখন কলেজে পড়তে শহরে চলে গিয়েছিল। পরের বছর যখন

সেই সুন্দরী রিয়াবাড়ির ট্রাক থেকে নেমে এল তখন তিনি এগিয়ে গেলেন। খোকনের কাছে জানতে পারলাম তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখন কলেজে পড়ে। তাঁরা বেশ সুখে আছেন। ছেলেরাই মেয়ে সাজত। ঐতিহাসিক বিষয় নিবার্চন করা হত প্রত্যেক বার। সম্ভবত পোশাক এবং সংলাপই এর কারণ। মুকুট পরে মেয়ে সাজতেও অসুবিধে হত না ছেলেদের। থিয়েটার আরম্ভ হত রাত ন'টার পর। হ্যাজাকের আলো ফেলে অভিনয় হত। তখন কেউ নাটক বলত না। থিয়েটার, প্লে, পালা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হত। কেন নাটক বলত না তা জানি না। অথচ বইয়ের ক্ষেত্রে নাটক-নভেল বলতে কারও অসুবিধে হত না। বাগানের প্রবীণ কর্মী জ্যোৎস্নাবাবুর প্রতি বছর মূল চরিত্রে অভিনয় করতেন। তাঁর গলা ছিল বাজখাঁই। নিস্তব্ধ রাত্রে যখন তিনি চিৎকার করতেন, 'ওরে কে আছিস, আমার হারানো সন্তানকে ফিরিয়ে এনে দে—', তখন অনেকেরই চোখে জল আসত। পরের দিন আলোচনা হত জ্যোৎস্নাবাবু যদি চা-বাগানের কাজে নিজেকে নষ্ট না করে কলকাতায় যেতেন তা হলে অ্যাক্টর হিসেবে খুব নাম করতেন।

বাগানের এক কোণে থাকতেন টাইপবাবু। নিজের নামের পাশে ব্র্যাকেটে 'ক্যাল' লিখতেন। কারও সঙ্গে মিশতেন না। বিকেলে বাড়ি ফেরার পর সন্ধে নামলে কলের গান চালাতেন: আমি বনফুল গো, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম। মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। রাত ন'টা পর্যন্ত নিয়মিত বাজত। শুনতে শুনতে গানগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। দিনের বেলায় তিনি মণ্ডপে আসতেন না। আসতেন রাত বারোটা নাগাদ। তখন মণ্ডপ ফাঁকা। আমাদেরও থাকার অনুমতি ছিল না। কিন্তু খোকনের শোওয়ার ঘর থেকে মণ্ডপটা দেখা যেত বলে ও জেগে থাকত অনেক রাত পর্যন্ত। ওর কাছেই শুনেছি টাইপবাবু সেই শূন্য মণ্ডপে এসে ঠাকুরের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াতেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আর্তনাদের মত বলতেন, 'মা, মাগো, বিদ্যা দাও, ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, মা।'

মণ্ডপে যারা পাহারায় থাকত তাদের একজন বলত, 'মাকে একটা গান শোনাবেন না?' টাইপবাবু মাথা নেড়ে গান ধরতেন, 'মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠরে ফুটে মন।' 'একি? এতো শ্যামাসঙ্গীত।'

'যিনি শ্যামা তিনিই পার্বতী।' গুন গুন করে গাইতে গাইতে টাইপবাবু চলে যেতেন অন্ধকারে ডুব দিয়ে নিজের কোয়ার্টার্সে। একসময় আমার সঙ্গে তাঁর ভাব জমেছিল। আমি তাঁর কাছে শুনেছিলাম ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাই, তারাপদ চক্রবর্তীর গান। বিভিন্ন রাগরাগিনীর গল্প। দেবিকারানি থেকে কাননবালা,

দুর্গাদাস থেকে সায়গল—আমার সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছিলেন তিনি। দীপালী, সচিত্র ভারত কাগজ চোখে দেখলাম। দেখলাম আনন্দবাজারের পূজাবার্ষিকী। স্পষ্টতই, এই মানুষটির ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিলাম, অন্য সময়ে না গিয়ে কেন তিনি মাঝরাতে পুজোমণ্ডপে যান?

টাইপবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'মা যখন একা থাকেন তখন তাঁকে দেখতে বড় আপন লাগে। কাউকে যদি আপন মনে না হয় তা হলে কি তাকে ভালবাসা যায়?'

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলাম। সারাদিন, সন্ধেবেলায় ঝলমলে যে ভিড়, অনেক আলো, অনেক ব্যস্ততায় দুর্গা শুধু দ্রষ্টব্য বস্তুমাত্র। সেইসময় তাঁকে আপন বলে মনে হচ্ছে না আমারও। সেটা হয়নি বলেই আরও কিছু বছর পর থেকে পুজোয় এলে বেড়াতে যাই পাহাড়ে অথবা বাড়িতে বসে বই পড়ি অথবা তাস খেলি। মণ্ডপে যাওয়ার টান বোধ করি না।

এ অনুভূতি পরের। নবমী এলেই মন খারাপ হয়ে যেত। পূজো শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই সন্ধেবেলায় যে আলো এবং মানুষের আনাগোনা তা যেন করতে হয় বলেই করা। দশমীর সকালে সাজগোজ খোলার পালা। একটু বেলা বাড়লে সধবারা এলেন সিঁদুর পরাতে। দেবীর মুখ লালে লাল। আমাদের মা মাসি কাকিমারা এ ওঁর সিঁথিতে সিঁদুর পরাচ্ছেন। তদ্দিনে সতীদাহের কাহিনী পড়ে ফেলেছি। স্বামীর চিতায় উঠিয়ে দেওয়ার আগে সদ্যবিধবার সিঁথিতে নাকি ওইভাবেই সিঁদুর পরানো হত।

বিকেল নামলে আমাদের প্রতিমাকে ট্রাকে তোলা হত সযেত্নে। ঢাক বাজছে, জয়ধ্বনি উঠছে। আমরা চললাম আংরাভাসার তীরে। শ্মশানের পাশে মাঠজুড়ে মেলা বসে গিয়েছে। হ্যাজাক জ্বলছে। বিভিন্ন বাগানের ঠাকুর আসছে। তাদের রাখা হচ্ছে পাশাপাশি। ভিড়, চিৎকার, ভেঁপুর আওয়াজ। এবার আরতি। কে কত কায়দা করে আরতি করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। বিচারকরা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পলাশবাড়ির মনা মিত্রর সঙ্গে বান্ধাপানির সুরেশ রায়ের প্রতিযোগিতাই বেশি। আমরা একবার ঠাকুর আর একবার ওই ঠাকুরের সামনে ছুটে যাচ্ছি। বিশুর সেই কিশোরীও এসেছে তাদের বাগানের ঠাকুরের সঙ্গে। তাকে দেখে খোকন বলেছিল, 'শুভ বিজয়া'। মেয়েটি হেসে ফেলল, 'এ মা! এখনও ঠাকুর জলে পড়েনি, বিজয়া হবে কী করে!'

ঢাকে বোল ফুটছে, ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন। প্রতিযোগিতা

শেষ হল। ধুনুচি নৃত্যে এবার পলাশবাড়ি বিজয়ী। এখন আমরা যে যার ঠাকুরের সামনে। রবিদা চিৎকার করলেন, 'দুর্গা মাঈকি জয়।' আমরা গলা মেলালাম। ধর ধর মাকে ধর। বাঁ দিক নয়, হ্যাঁ ঠিক আছে আর একটু ওপরে। পিছল আছে, সাবধানে পা ফেলবে সবাই। দেবী এখন কাঁধে-কাঁধে। মুখ উঁচু করে তাঁকে দেখলাম। কী করুণ মুখ। যেন তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে এখনই।

বাঙালির ঘরের মেয়েরা কত কম সুখ পায়। আংরাভাসায় যেখানে কোমর জল সেখানে মুখ থুবড়ে পড়লেন মা দুর্গা তাঁর সংসার নিয়ে। লাফিয়ে উঠে তাঁর কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে জলের নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রতি বছর এই সময় আমি কাঁদতাম। আমার বিস্ময় লাগত সদ্য মাতৃবিয়োগের পর বড়রা এত আনন্দিত হয়ে কোলাকুলি করছে কী করে! এ ওকে শুভ বিজয়া জানাচ্ছে কেন? এখন তো শোকের সময়। টাইপবাবু বলেছিলেন, শোক যখন একার তখন তা ভয়ঙ্কর। শোক যখন সবার তখন তার কোনও ভয় থাকে না। ভাসানের পর যে আনন্দ তা দায়মুক্তির। আগামী বছর যে আসবে তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ভূমিকামাত্র। তখন এ সব কথার কী মানে বুঝেছিলাম তা জানি না।

আজ পঞ্চাশ পেরিয়ে এ সবই খেলা বলে মনে হয়। আমাদের শৈশব বাল্যকালে বাতাবিলেবু নিয়ে ফুটবল খেলার মতই পুজো-পুজো খেলা। এখন আমি এবং আমার মত লক্ষ লক্ষ বাঙালি পুজোমণ্ডপে যাই না। সারা বছর ঠাকুরপুজোর কথা মনেও আসে না। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে আমি হিন্দু কি না, উত্তর দেব, আমি বাঙালি। হিন্দু হতে হলে যদি কিছু করণীয় থাকে তার কিছুই করি না আমি।

কিন্তু সেইসব শৈশবস্মৃতি সুদৃশ্য রাংতা মোড়া যেন। মাঝেমাঝে সেই রাংতাগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে খারাপ লাগে। বুকের বাতাস ভারী হয়। তখন আবিষ্কার করি, কোনও ধর্মের বাঁধন নয়, আমাদের আনন্দ প্রকাশের উপকরণ এত সামান্য ছিল যে পুজোটাকেই আঁকড়ে ধরতে হত সেইসময়। সেই দিন আর নেই।

কিন্তু সত্যটা থেকে গেছে। সারাজীবন ধরে আমরা যে প্রতিমাই গড়ে চলি না কেন তার সম্পূর্ণতা বিসর্জনের মধ্যেই।